চন্দন যাত্রা বলে। ২১ দিন মেলা থাকে। মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

মার্কণ্ড।—এটী অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু এটীরও তীর বাঁধা, এটীও খুব প্রাচীন পুকুর। এখানে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমিতে কালীয় দমন যাত্রা হয়।

শ্বেতগঙ্গা—এটী সর্বাপেক্ষা গভীর। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানেও যাত্রিকগণ স্নান করিয়া থাকেন।

চক্রতীর্থ—অথবা সমুদ্র। সমুদ্র দেখিলে যে নবজীবন লাভ হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই, তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবন্ত ও মহান।

একদিনে এই পঞ্চতীর্থে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হয়। ইহারা পরস্পর এত দূরে অবস্থিত যে, প্রাতঃকাল হইতে স্নান আরম্ভ করিলে সকল তীর্থ শেষ করিয়া আসিতে ১২টা বাজে।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরীর জীবন্ত দেবতা লোকনাথ। লোকনাথকে ভয় করে না, এমন লোক পুরীতে বিরল। লোকনাথের মন্দির ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। একদিন প্রাতে দর্শনার্থ গমন করিলাম। অন্ধকারময় গৃহে লিঙ্গরাজ বিরাজিত। এখানে শৈব ধর্ম্মের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন দেখিলাম। দুই চারি জন ভক্তের সহিত দেখা হইল। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব ধূমধাম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মাঘ, কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসেও খুব ধূমধাম হয়।

তোটাগোপীনাথ—একটী প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ এইরূপ, এই খানে চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান হয়। এ সম্বন্ধে একটী কবিতা পাওয়া যায়; সেটী এই—

"কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদে হারাইনু গোপীনাথের ঘরে॥"

এখানে চৈতন্যদেব অনেক সময় থাকিতেন। এইরূপ কথিত আছে, এক দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন না।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন স্বর্গদুয়ার দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতির মঠের নিকটবর্ত্তী একটা প্রশস্ত স্থানে, সমুদ্রের খুব নিকটে, বালুকারাশির মাঝে এক খণ্ড প্রস্তর প্রোথিত রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গদুয়ার বলে। দলে দলে যাত্রিগণ ইহা দেখিয়া পয়সা দিয়া থাকে।

পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু ছোট ছোট মন্দির আছে—তাহাতে বহু দেবতার সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিমলার মন্দিরই প্রধান। এই বিমলা যাজপুর বিরজা-ধাম হইতে আনীতা হইয়াছেন। শাক্তধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্মিলনের জন্য এই রূপ বিধান করা হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। শুনিলাম, এই বিমলা-মন্দিরে, মহাষ্টমির দিন জগন্নাথ যখন নিদ্রিত হন, তখন মহাবলী হয়। পুরীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষের একমাত্র চিহ্ন—জাতিভেদের অন্তর্দ্ধান। শ্রীমন্দিরের প্রসাদ আব্রাহ্মণ চণ্ডাল একত্রে সানন্দে ভোজন করিয়া থাকে। এই প্রথা প্রচলিত থাকায় হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বিমলাকে এখানে আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। শাক্তধর্ম্মানুসারে প্রসাদ মন্ত্রপূত হয়, এই ধারণায় এখন আর ধর্ম্ম লোপের

ভয়েবকাবণ নাই। বিমলাব মন্দিবেব প্রাঙ্গণে বোহিণী-কুণ্ড আছে—এই কুণ্ডে ব্রহ্মাব প্রথম সাক্ষী "ভুষণ্ডিকাক" পড়িয়া স্বর্গলোক লাভ কবিয়াছিল, প্রবাদ আছে।

জগন্নাথদেবেব উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শ্রুত হইয়াছি। বাহুল্যভয়ে সে সকল বিবৃত কবিলাম না। বহুবাব জগন্নাথ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। প্রথমত ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন, ১৫০ বৎসব অবণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, ৩ বাব চিল্কা-হ্রদে প্রোথিত হইয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন মন্দিব নির্ম্মিত হয়, কোন মতে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীঅনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১২৫,০০০০ লক্ষ স্বর্ণ মাব (এক কোটী টাকা) আড়াই লক্ষ মাব মূল্যেব মণি মুক্তা এই কার্য্যেব জন্য নির্দ্ধাবণ কবিয়াছিলেন। চূড়া সমেত ইহা ১৯৮ ফিট উচ্চ।

জগন্নাথ দেবেব বথযাত্রাব সময়ে তিনটী বথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জগন্নাথ, বলবাম ও সুভদ্রা। সেই তিনটী বথে আবোহণ কবিয়া গুণ্ডিচা গৃহে গমন কবেন। এক সপ্তাহ অন্তে তথা হইতে মন্দিবে প্রত্যাবর্ত্তন কবেন। জগন্নাথের বথের নাম "নন্দীঘোষ" ইহা প্রায় ৩২ হস্ত উচ্চ, বলবামেব বথ "তালধ্বজ" ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, সুভদ্রাব বথেব নাম "পদ্মধ্বজ" ইহা প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ।

মহাত্মা হণ্টাব সাহেব বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামানন্দ উৎকলে আগমন করেন। ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবেব আবির্ভাব। ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাস; ১৪৩৩ তে বিদ্যাপতি, ১৪৪৮তে কবীর, ১৪৮৯তে নানক, ১৫০৯ হইতে চৈতন্যদেব, ১৫৭২তে গোবিন্দ দাস এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলসী-দাসেব পুবীব লীলা বলিয়া অনুমান হয়। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু বৎসব উড়িষ্যায় থাকেন; ১৫০৯ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চৈতন্যেব উৎকল প্রচাব, প্রতাপ রুদ্র দেব এই সময়ে বাজা ছিলেন। ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দ বিষ্ণুপুবাণেব সময়। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে বামানুজ বৈষ্ণব ধর্ম্মেব প্রচাব কবেন। এইরূপ প্রবাদ, ইঁহাবা সকলেই পুবী আগমন কবিয়াছিলেন। চৈতন্য, কবীর, নানক ও শঙ্কবাচার্য্য যে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা, এই সকলেব নামেই মন্দিব প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুবীতে আগমন কবিলেই বুঝা যায় যে, ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র, অথবা শ্রীক্ষেত্র। গবর্ণমেণ্টেব প্রতাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীব প্রতাপ। যতই পুবীর বিষয় অনুসন্ধান কবা যায়, ততই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভাবতেব তত্ত্বরাশি-পূর্ণ এমন দ্বিতীয় স্থান ভাবতে দুর্লভ।

আব এক দিন বৈকালে সেই মেয়ে-কয়েকটীব অনুসন্ধানে বাহিব হইলাম। কটক হইতে জনৈক ব্যক্তি সঞ্জীবনীর সদাশয় সম্পাদক মহাশয়েব নিকট একখানি বেনামা পত্রে লিখিয়াছিল যে, এই কয়েকটী অসহায়া মেয়েদিগেব জন্য "আমবা" কিছুই চেষ্টা করি নাই। সঞ্জীবনীব সম্পাদক মহাশয় দয়া কবিয়া সে পত্র ছাপান নাই। ঐ ব্যক্তি সব-জান্তা উপাধি পাওয়ার যোগ্য, কেননা, পুবীতে না যাইয়াও লিখিতে সাহস পাইল, "আমরা কিছুই চেষ্টা করি নাই।" যাক্। অনুসন্ধানে সেই কয়েকটী মেয়েকে পাওয়া গেল। তাহারা তখন এত দূর বিগড়াইয়া

গিয়াছে যে, তাহাদের কথায় ও প্রতিবাদে আমরা অবাক হইলাম। এদিকে দেখিলাম, অনেক ষণ্ডামার্ক সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে। তাহাদের স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার পর বুঝিলাম, আমাদের দ্বারা আর কিছুই হইবে না। তখন অগত্যা কলিকাতায় পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর আর আমরা কোন খবর পাই নাই। তাহারা পরিবারে গৃহীত হইয়াছে কি না জানি না। পরিবারে গৃহীত হইয়া না থাকিলে দুঃখের সীমা নাই। এইরূপ করিয়া কত নারী যে বিপথে পা ফেলিতেছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

পুরীর প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর **তীর্থ স্বামী** এক জন প্রাচীন বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি। শঙ্করের মঠে ইনি তখন থাকিতেন। ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য। শুনিলাম শীঘ্র মঠ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। মঠধারী সন্ন্যাসীর মঠ পরিত্যাগ—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী আবার সন্ন্যাসী হইবার জন্য চলিয়াছেন—যাহা কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ছিঁড়িতেছেন, এই জড়বাদের দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। আমরা তাহার অলৌকিক জীবনের কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম। তার পর আমরা তাঁহার আদিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

শঙ্করেরমঠ—বালুকা-গুহার মধ্যে নির্ম্মিত। সমুদ্রের উপকূলে অনন্ত বালুরাশি—তাহার মধ্যে একটা গর্ত্তের ন্যায় স্থানে এই মন্দির। মন্দিরের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদি আছে, আর অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি আছে। মন্দিরের কিঞ্চিৎ আয় আছে, তদ্দ্বারা শিষ্যবর্গের কোন রকম ভরণপোষণ হয়। শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থস্বামী শ্রীমন্দিরের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তীর্থস্বামী সরল সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন; তিনি অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি। তাঁহার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়, তিনি একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত, অদ্বৈতবাদী। তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিলাম। তিনি আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ মর্ম্মের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

১। এক অদ্বিতীয় দেবতা ভিন্ন দুই জগতে নাই। যত দিন মানুষ মোহের অধীন, ততদিনই দ্বিত্ব বোধ। মোহ ছিন্ন হইলে—অদ্বৈতভাব প্রাণে উপস্থিত হয়।

২। উপাসনা বা পূজা তত দিন, যত দিন মানুষ মোহের অধীন অথবা যত দিন মানুষের দ্বিত্ব বোধ আছে। দ্বিত্ব বোধ ঘুচিলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। ইন্দ্রিয়মূলক আমিত্ব বোধ মানুষের সর্ব্বনাশের মূল।

৩। "আমিই সেই"—অদ্বৈতবাদীর এ মত নয়, "আমি নাই, কেবল "তিনি আছেন"—এই মত। আপনার নাশই প্রকৃত ধর্ম্ম।

৪। মোহ ও মায়ার অতীত হওয়ার পক্ষে কর্ম্ম কাণ্ড সহায়। শেষে কর্ম্ম কাণ্ডের প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথার পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি পুরীর শ্রীমন্দিরের জগন্নাথদেবকে মানেন?

তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন—'না—আমি না।"

আমরা।—তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে যান কেন?

তিনি।—লোকদিগকে দেখাইবার জন্য। আমি না যাইলে অনেকের অবিশ্বাস হইবে।

আমরা।—ধর্ম্মে কপটতা ভাল কি?

তিনি।—ভাল নয়, কিন্তু এরূপ না করিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে আর থাকে না।

আমরা।—এই রূপে কি থাকিবে?

তিনি।—থাকিবে, একটা ত ধরা চাই। আশা করি, এইরূপ করিয়া সকলে এক দিন ঈশ্বরের নিকট পৌছিতে পারিবে।

আমরা।—এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন কি?

তিনি।—দেখি নাই বলিয়া দুঃখিত, সেই জন্য মানুষের সংসর্গ আর ভাল লাগেনা, যাইতে পারিলে বাঁচি।

এই রূপ নানা কথায় বুঝা গেল, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন না, লোক দেখানের জন্য তাহাও করেন। তিনি সরলভাবে দুর্ব্বলতা স্বীকার করিলেন; ইহাও বলিলেন, জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া তিনি পূজাদি করেন না। এই মহাত্মার সংস্পর্শে যতক্ষণ ছিলাম, যেন স্বর্গে ছিলাম। যেমন ধর্ম্মজ্ঞান, তেমনি অমায়িকতা, যেমন বিশ্বাস, তেমনি ভক্তি। অবশেষে তিনি ক্লান্ত হইতেছেন দেখিয়া প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

আমাদের ক্ষীণ ভাষায় আর পুরীর বর্ণনা সম্ভবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরী সম্বন্ধে ভাবা যায় অনেক, লেখা যায় অল্প। অতি অল্পই লিখিলাম। দেখিবার, জানিবার, শুনিবার, পড়িবার—পুরীতে অনেক জিনিস আছে; কিন্তু সে সকল আমাদের লেখনীর বর্ণনা করিবার শক্তি নাই।

আর একটি কথা। চৈতন্যদেবের শেষ জীবন পুরীর অঙ্গে বিলীন হয়। একথাটী ভাবিলে পুরীর প্রতি আপনা আপনি একটা অজানা গভীর অনুরাগ জন্মে। কেহ কেহ বলেন, গোপীনাথের ঘরে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়; কেহ বলেন, জগন্নাথের ঘরে; কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রে আত্ম বিসর্জ্জন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সমুদ্র পতন নামক একটী পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে জানা যায়, তিনি সমুদ্র পতনের পরও উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ভক্তগণ পরি-বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু তবুও তাঁহার অর্দ্ধধানের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; বড়ই আশ্চর্য্য।

আমরা সম্প্রতি শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা প্রভৃতি চৈতন্য-ভক্তি-প্রধান স্থান দেখিয়া আসিয়াছি। এই সকল স্থানেই চৈতন্যদেবের লীলার ভূমি, এই সকল স্থানেই তাঁহার মূর্ত্তি ধূমধামের সহিত পূজিত হইতেছে। এই সকল স্থানের কোথাও আমরা তাঁহার তিরোধানের প্রকৃত কথা জানিতে পারি নাই। নিত্যানন্দের জীব-নের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবাহাদি করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বলেন। নিত্যানন্দ সেই আদেশে দেশে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ করেন। খড়-দহের গোস্বামী বংশ নিত্যানন্দের বংশ। এইরূপ প্রবাদ, নিত্যানন্দ চৈতন্যের ধর্ম্মকে এইরূপ বিকৃতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্র-হীনতা প্রশ্রয় পায়। নিত্যানন্দের কথা বলিয়া এইরূপ একটী শ্লোক প্রচলিত আছে;—

"মৎস্যের ঝোল, কামিনীর কোল, মুখে হরি বল।"

গোরাচাঁদের ধর্ম্মের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু গৌরচন্দ্রের নিকট এই রূপ একটী তরজা লিখিয়া পাঠান—

"আউলকে কহিও হাটে নাহি বিকায় চাউল,
আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল।
আউলকে কহিও কাজে নাকি কাউল।
এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল।"

এইরূপ কথিত আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বিমর্ষ হন, এবং বলেন "যে ব্যক্তি আহ্বান করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন, তিনিই বিসর্জ্জন দিতেছেন।" ইহার পর প্রায়ই যেখানে সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। শেষে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হন। কিরূপে কোথায় কি হইল, কেহই জানে না। চৈতন্যের শেষ জীবনের ছায়া উৎকলকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। পুরী চৈতন্যের অতি মিষ্ট স্থান। এই কারণে পুরী বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় জিনিষ। কিন্তু দুঃখের বিষয়—পুরীতে চৈতন্যের তেমন কোন কীর্ত্তি নাই। পাণ্ডারা জগন্নাথের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য বলেন, "তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত মিলিত হইয়াছেন।" ইহাতে জগন্নাথের মহিমাই অপ্রতিহত রহিয়া গিয়াছে। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের ভক্তিপূর্ণ জীবন যে ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, পাপীর পক্ষে সে ভূমি যে অতি আদরের জিনিষ, সন্দেহ কি? পুরী—জ্ঞানীর তীর্থ; কেননা, শঙ্করাচার্য্যের ভূমি। পুরী বিশ্বাসীর তীর্থ, কেননা কবীরের বিচরণ স্থান। পুরী ভক্তের তীর্থ—কেননা চৈতন্যের শেষ লীলাভূমি। পুরী, এ জগতে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সমন্বয় ক্ষেত্র। কেবল সমন্বয় ক্ষেত্র নয়, হিন্দু ইতিহাসের এরূপ উজ্জ্বল ক্ষেত্র পৃথিবীতে বিরল।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা।

চৈতন্য লাইব্রেরি সভার অধিবেশনে শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত, মূল্য ✓০। সর্ব্বদেশেই এমন এক এক জন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবনের কথা শুনিবার জন্য জগৎ উর্দ্ধকর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের এই বঙ্গভূমিতে বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর সেই রূপ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার এই বক্তৃতা শ্রবণ কালে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ৩০০।৪০০ শত ব্যক্তি চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়াছিল। এরূপ চিন্তা, গবেষণা ও বিজ্ঞতা পূর্ণ বক্তৃতা এদেশে অতি অল্পই হইয়াছে। চন্দ্র নাথ বাবু সভাপতির মন্তব্যের পর ধন্যবাদ দিবার জন্য উঠিয়া ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, "আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলাম বলিয়াই কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি নাই।" সভাপতি মহাশয় অনুরোধ করিলেও কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বক্তৃতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। একজন বক্তৃতাপ্রিয় সাহেববেশ-ধারী যুবক

উঠিয়া দুই চারিটী অসংলগ্ন বাহাদুরীর কথা বলিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই বক্তার কথাগুলি ফুটনোটে তুলিয়া আপন বক্তৃতার সাহেবি আনার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই একটী বক্তৃতার জন্য এদেশে অমর হইবেন। সে দিন এই বক্তৃতা শ্রবণের পর দ্বিজেন্দ্র বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া,প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করিতে, আমাদের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই আজ এই প্রবন্ধটীকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি—এ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট তাঁহার পদধূলি চাই; আর স্বদেশীয় লোকের নিকট এই চাই, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত বলিয়া ঘৃণা না করিয়া এই পুস্তক খানি একবার পড়েন। বাঙ্গলার সামাজিক বর্ত্তমান ঘোরতর বিপ্লবের দিনে এই পুস্তক প্রভূত কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা সকলকে এই অনুরোধ করিতেছি। এই কাজের জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবুর নামে ঘরে ঘরে পূজা হওয়া প্রয়োজন। বিলাত হইলে তাহাই হইত। হা বঙ্গভূমি, তুমি আজও প্রকৃত গুণী ব্যক্তির আদর করিতে শিখিলে না!

২। গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, এম, এ, প্রণীত, মূল্য ১॥০। যে দুই প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তির মাহাত্ম্যে ইতালী আজ স্বাধীন, গ্যারিবল্ডী তাহার অন্যতর। ম্যাট্‌সিনি গুরু, গ্যারিবল্ডী শিষ্য। ম্যাট্‌সিনি দেবতা, গ্যারিবল্ডী বীর। অথবা ম্যাট্‌সিনির হৃদয়-নিহিত প্রেম-জ্যোতি গ্যারিবল্ডিতে প্রতিফলিত হইয়া আজ ইতালীর বর্ত্তমান অতুল শোভা আনয়নে সমর্থ হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনির সময়ে ইতালির যে দশা ছিল, ভারতের ঠিক সেই দশা উপস্থিত। কিন্তু দেশ আজ স্বার্থের কুহক-জালে আচ্ছন্ন; কোথায় ম্যাট্‌সিনি, কোথায় বা গ্যারিবল্ডি! এমন স্বার্থ-বিবর্জ্জিত প্রেমাবতারের অভ্যুত্থান ভিন্ন ভারতের আর আশা কোথায়?

যোগেন্দ্র বাবু ভারত-ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া একমহাযজ্ঞের মহা আয়োজন করিতেছেন। ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্ডির অমূল্য জীবন কাহিনী বাঙ্গলা ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া এই মহাত্মা, এই মৃত দেশের যে কাজ করিলেন, আজ না হইলেও, শতাব্দী পরে তাহার সুফল ফলিবে। মহতের কথা শ্রবণ করিলেও মহত্ত্ব জন্মে। কে জানে, গ্যারিবল্ডির বা ম্যাট্‌সিনির জীবনী এদেশে কত মৃত লোকের জীবন দিতে সমর্থ হইবে!

বলিতে চাই অনেক কথা, কিন্তু বলিবার স্থান নাই। যোগেন্দ্র বাবু প্রেমিক—তাই তিনি এই সকল প্রেমিক জীবন লইয়া মাতোয়ারা। যোগেন্দ্র বাবু বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবেরা সে জন্য তাঁহাকে কত তিরস্কার করিতেছেন; কিন্তু এদেশ নিদ্রিত। এমন অমূল্য জিনিসেরও আদর নাই। বলিতে চাই অনেক কথা, কিন্তু বলিলেই বা ফল কি?

যোগেন্দ্র বাবুর ভাষার আর কত প্রশংসা করিব! বীরকাহিনী লিখিবার জন্য যে ভাষার প্রয়োজন, এদেশে তাহা কেবল যোগেন্দ্র বাবুর লেখনীতেই সম্ভবে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন উচ্ছ্বাস ও

তেজোপূর্ণ, তেমনই মধুর, তেমনই সরল। পড়িতে পড়িতে কখন শরীর অগ্নিময় হয়, কখনও আবেগে চক্ষের জল পড়ে। এরূপ পুস্তকের আদর না হইলে বুঝিব, এদেশ জাতীয় সমাসমিতির এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে যতই মাতুক, এদেশের উন্নতি বহু শতাব্দীর পশ্চাতে লুক্কায়িত।

অনেকের ধারণা আছে বাঙ্গলা জীবন-চরিত মাত্রেই ইংরাজির অনুবাদ। এই পুস্তক খানি যে তাহা নহে, দেখাইবার জন্য একটী স্থান তুলিয়া দিলাম ঃ—

"ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে যে গ্যারিবল্ডীর উদ্দীপনা-বাক্য বিফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে ঐ সকল জাতির অধিকাংশই তুরস্কের অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণীকৃত করিয়া স্বাধীন রাজ্যসকলে পরিণত হইয়াছে। ভাবিলে বোধ হয় যেন উনবিংশ শতাব্দী জগৎ হইতে অধীনতা উঠাইয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমেরিকা যে বিপ্লবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই তরঙ্গমালা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে করাসি রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে সেই তরঙ্গমালা কিছুকাল ধরিয়া সেই দেশকে আলোড়িত করিয়া ক্রমশঃ প্রাচ্যদেশাভিমুখিনী হইতেছে। তরঙ্গমালা 'লোক সাধারণ ও ঈশ্বর' এই অক্ষরাঙ্কিত পতাকা সম্মুখে লইয়া অপ্রতিহতবেগে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রভাবে ইতালি উঠিয়াছে; গ্রীস্ সঞ্জীবিত হইয়াছে; সার্ভিয়া, রাউমিনিয়া প্রভৃতি প্রদেশসকলও স্বাধীন হইয়াছে! ইহার সম্মুখে ইউপীয় মুকুটীগণ ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছেন। সেই বিরাট পতাকা লইয়া এই বৈপ্লবিক তরঙ্গমালা কখন কোন্ দেশে উপস্থিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এই তরঙ্গমালা আমেরিকা ও ইউরোপের শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার করিয়াছে! ইহার প্রভাবে আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই লোকতান্ত্রিক শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে। অল্প দিন হইল প্রকাণ্ড ব্রাজিল্ সাম্রাজ্য সাধারণ তন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এই তরঙ্গমালার গতি স্থির নাই, ইহা কখন প্রাচ্যে, কখন প্রতীচ্যে, কখন উদীচ্যে এবং কখন বা দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে। ইহার প্রভাবে অচেতন জগৎ যেন সচেতন হইতেছে! এক প্রকাণ্ড তাড়িত যন্ত্র যেন নিদ্রিত জাতি সকলের স্নায়ু মণ্ডলীতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিয়া দিতেছে। যাহার নয়ন আছে, সে নয়ন ভরিয়া এই বিশ্বব্যাপী সঞ্জীবন ব্যাপার দেখিয়া জীবন সার্থক করুক! ভাবুক! আর ঘুমাইয়া কেন? এক বার নয়ন মেলিয়া বিশ্বপতির এই অপূর্ব্ব সঞ্জীবন ক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া ইহজীবনের সাধ মিটাও! যাহার অদৃষ্টে সম্ভোগ ঘটেনা, তাহার দর্শনেও বাসনা চরিতার্থ করিয়া লওয়া উচিত। উঠ! আর কুম্ভকর্ণের ন্যায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকিও না! উঠিয়া একবার নয়ন মেলিয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ!"

গ্যারিবল্ডির মৃত্যু সংবাদে ইতালীর গভীর শোক গ্রন্থকার অতি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষে অবিরল ধারায় জল পড়ে। ধন্য যোগেন্দ্র বাবুর লেখনী!

মৃত্যু-সুহৃৎ।

(১)
আমি দেখিয়াছি তারে, ফুল মালা গলে,
বসন্তের নব হাসি
উল্লাসে উঠেছে ভাসি,
মল্লিকা মালতী জাতি থোপা থোপা দোলে,
অঙ্গের সুরভী তার
তুলনা মিলেনা আর,*
নন্দনে মন্দার মরি, প্রাণ মন ভোলে।
আমি দেখিয়াছি তার ফুল মালা গলে।

(২)
আমি দেখিয়াছি তারে মলয় বাতাস,
তেমনি মধুর ছটা
তেমনি অনন্দ ঘটা
পরাণে তেমনি করে মাখায় উল্লাস,
অতি আস্তে অতি ধীরে,
হাসে, তোষে, চলে, ফিরে,
অনন্তে ছুটিতে ঢালে অমৃত উচ্ছাস,
আমি দেখিয়াছি সেতো মলয় বাতাস।

(৩)
আমি দেখিয়াছি তারে শরতের শশী,
শারদ চাঁদের মত
তারও জ্যোছনা কত,
হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে খসি!
ফুটায়ে বনের ফুল
উছলি নদীর কুল
জীবন মেঘের পাশে সেও থাকে বসি,
আমি দেখিয়াছি তারে শরতের শশী।

(৪)
আমি দেখিয়াছি তারে পুরবী রাগিণী,
সে যখন জাগে যন্ত্রে,
কি জানি কি মোহ মন্ত্রে
নিচল নিথর চিত ঘুমায় অমনি,
সে যেন মধুর ঊষা,
সে যেন দেবের ভূষা,
সে যেন সুখের সাধ, সোহাগের খনি!
আমি দেখিয়াছি সেতো পুরবী রাগিণী।

(৬)
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতা ময়,
মমতা মাখান প্রাণ
মুখে মমতার গান,
বড় আদরের কথা কাণে কাণে কয়;
কাছে গেলে মিঠা হাসে
আদরে ডেকে' নে' পাশে,
কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতা ময়।

(৭)
আমি দেখিয়াছি তারে মহা যোগে রত,
সে এক জ্বলন্ত যোগী
সুখ ভোগে নহে ভোগী,
পোড়ায়েছে নেত্রানলে পাপ রিপু যত,
আশা তার পর-মার্থ
কোথা কিছু নাহি স্বার্থ,
বিশ্ব প্রাণ ধ্যানে যেন আছে অবিরত
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মত।

(৮)
নিষ্কাম সন্ন্যাসী সে যে এ মব ধরায়,
তারে তো চেনে না কেহ
করে না আদর স্নেহ,
"আপদ বালাই" বলে ফিরে নাহি চায়,
শত ঘৃণা শত রাগে,
তার হিংসা নাহি জাগে,
সব অত্যাচার সে তো হাসিয়া উড়ায়,
অথচ সে মহাবীর
ভাঙে ভূধরের শির,
দুদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড নাশ তার ক্ষমতায়—
দুহাতে সে ভালবাসা জগতে বিলায়!

(৯)
আমি তারে চিনি শুনি, ভালবাসি তা'য়
শুনিলে তাহারি নাম,
উথলে হৃদয় ধাম,
পরাণ শিহরি ওঠে সুধা পড়ে গা'য়;
এক দিন দূরে—দূরে,
অনন্তে, অমর পুরে
নিয়ে যাবে সে আমারে, কয়েছে আমায়।
সে আমার কাছে কাছে,
দিন রাত সদা আছে,
পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে চলে যায়,
তার নাম মৃত্যু, আমি ভালবাসি তা'য়।

শ্রীপ্রিয়-প্রসন্ন মজুমদার।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস মানব-জাতির শিক্ষা ও উন্নতির তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস স্বরূপ। এই ইতিহাস কতিপয় যুগে বিভক্ত। প্রত্যেক যুগ আবার এত দীর্ঘকালব্যাপী যে, অনেক আধুনিক জাতির সমগ্র ইতিহাস তত দীর্ঘকাল-ব্যাপী নহে।

অনেক পণ্ডিতদিগের মতে জগতের অন্য কোন কোন জাতি হিন্দুদিগের তুল্য বা ততোধিক প্রাচীন। খ্রীষ্টের ৩।৪ সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার মিসরদেশীয় লোকের সভ্যতার চিরস্থায়ী নিদর্শন রহিয়াছে। আসিযার প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বিবেচনা করেন যে, সুমিরো-আকেডীয় জাতির সভ্যতা ততোধিক পুরাতন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর হইতে চীনদেশীয় লোকের ইতিহাস রহিয়াছে। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা, ভারতেতিহাস খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ বৎসরের অধিক পুরাতন। বলিযা এ পর্য্যন্ত মত ব্যক্ত করেন নাই। ভবিষ্যতে সমধিক গবেষণা হইলে এতাধিক পুরাতন বলিয়া প্রমাণিত হওযা অসম্ভব নহে।

কিন্তু হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস ও অন্যান্য জাতির প্রাচীন ইতিহাসে মহৎ অন্তর। পুরাকালীন মিসরবাসিদের যে hieroglyphic লেখা রহিয়াছে, তাহা হইতে রাজার ও পিরামিড নির্ম্মাণ-কারীদের নাম এবং রাজবংশ ও যুদ্ধ বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের Cuneiform প্রস্তর লিখন হইতেও ততোধিক কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এমন কি, চীনের পুরাতন লিখন হইতেও মনুষ্য জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাস কোনও প্রকারে জানা যায় না।

ভারতবর্ষের পুরাতন গ্রন্থ সকল সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। কোন কোন বিষয়ে তাহা অসম্পূর্ণ বটে। রাজবংশ, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ তাহাতে অতি বিরল। কিন্তু সভ্যতার উন্নতি, মনুষ্যের মানসিক শক্তির বিকাশ, এই সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ধারাবাহিক স্পষ্ট বিবরণ ভারতের পুরাতন গ্রন্থে যে প্রকার পাওয়া যায়, অন্যান্য পুরাতন জাতির ইতিহাসে তদ্রূপ বিবরণের অন্বেষণ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রত্যেক যুগের সাহিত্য তৎকালিক হিন্দু জাতির অবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি স্বরূপ। বোধ হয় যেন ফটোগ্রাফ যন্ত্রেও বাহ্য বস্তুর ততোধিক পরিষ্কার প্রতিকৃতি রক্ষা পায় না। এইরূপে যুগ যুগের যে বিবরণ রহিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন হিন্দু জাতির ত্রিসহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস অবগত হওযা যায়। সেই বিবরণ এরূপ সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার যে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অতুল আনন্দ মাত্র,—পরিশ্রম আবশ্যক করে না!

অন্যান্য দেশে ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তর খোদিত হইয়াছে ও বৃক্ষত্বকে নানা বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্মসঙ্গীত ও গাথা, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সকল হিন্দু জাতির সভ্যতা ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

হিন্দুদিগের পুরাতনতম মানসিক ভাব কোন প্রকারে খোদিত হয় নাই। সুতরাং লিখন-পদ্ধতি বশতঃ মানসিক ভাব যে রূপ সংযত হইয়া প্রকাশিত হয়, এই সকল গাথায় তাহার চিহ্ন নাই। তাহাতে পুরাতন হিন্দুজাতির মহৎ হৃদয়ের অবিকৃত, অসংযত, স্বাভাবিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তরে খোদিত হইয়া গাথা রক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু বংশ পরম্পরায় অবিকৃত ভাবে যুগ হইতে যুগান্তরে লোকের স্মৃতি শক্তিতে তাহা আবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এরূপ অসাধারণ স্মৃতি শক্তি জগতের অন্যান্য দেশে অমানুষিক দৈব শক্তি বলিয়া বোধ হয়।

যাঁহারা ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভার্থ বেদ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সেই অনন্ত গৌরবান্বিত ধর্ম্মসঙ্গীত পরম্পরায় ইতিহাস সংগ্রহ করিবার যে রূপ উপকরণ রহিয়াছে, সেরূপ প্রস্তর খোদিত ও বৃক্ষত্বকে লিখিত বিবরণে কদাপি পাওয়া যায় না। পরন্তু যে সকল পণ্ডিতেরা হিন্দুদের ভিন্ন২ যুগের ভিন্ন২ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এই অনন্ত গ্রন্থ পরম্পরায় দ্বিসহস্র বৎসর-ব্যাপী হিন্দু সভ্যতার আচার, রীতি নীতি, চিন্তাশক্তি, ও আধ্যাত্মিক ভাব সম্পূর্ণ এবং বিশদরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ কোন ধারাবাহিক বিশ্বাস-যোগ্য ইতিবৃত্ত নাই যে, তাহা পাঠ করিয়া আধুনিক পাঠক সম্প্রদায় কৌতুহল নিবৃত্তি ও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। এই বিশ্বাস যে একান্তই ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার জন্যই উপরোক্ত কয়েকটী কথা বলিলাম।

প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক বিবরণ রহিয়াছে। উক্ত বিবরণ এরূপ বিশদ ও এরূপ আনন্দজনক যে, তাহা পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর কৌতুহল বৃদ্ধি হইতে থাকে। কি উপায়ে একটী প্রতিভান্বিত আর্য্যজাতি ঘটনাচক্রে জগতের অপরাপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনুকূল প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে স্বীয় সভ্যতা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে পারি। যুগের পর যুগে তাঁহারা কি কিরূপ মানসিক শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কি প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশ লাভ করিয়াছিলেন, কি রূপে সমগ্র ভারতে অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রাজনীতি বিস্তার ও সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, পাঠ করিয়া ক্রমশঃ কৌতুহল বৃদ্ধি হইতে থাকে। হিন্দু সভ্যতার এই বিস্ময়কর গল্প বিষ্ণু শর্ম্মার গল্প হইতেও কৌতুহল-জনক, রাজমহিষী শাহারজাদীর হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসসমূহ হইতেও হৃদয়গ্রাহী।

কিন্তু এই আনন্দজনক হিন্দু ইতিহাসে বিষাদের কথাও আছে। আমাদিগের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিব,—আমাদিগের প্রাচীন অভাব গুলিও স্মরণ করিয়া এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিব। যাঁহারা দোষ গুণ উভয় দেখিতে অক্ষম, তাঁহারা যেন ঐতিহাসিক লেখনী কখনও হস্তে গ্রহণ না করেন।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতের পুরাতন ইতিহাস কতিপয় যুগে বিভক্ত, এবং ইহার প্রতি যুগই বহুকালব্যাপী। এই সকল ঐতিহাসিক যুগ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই উপক্রমণিকা

ভাগে প্রদত্ত হইতেছে। ইহা হইতে পাঠকেরা ভারত-ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগ সমূহের কতকটা আভাস পাইবেন, এবং যথা স্থানে বর্ণিত বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রথম যুগ।

প্রথম যুগে আর্য্য হিন্দুগণ সিন্ধু নদী তীরে বাস করিতেন; অমূল্য ঋগ্বেদ সংহিতায় আমরা এই যুগের বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই অমূল্য গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যেরা সিন্ধু এবং তাহার পঞ্চ শাখার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় বাস স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু শতদ্রুর প্রাচ্য দেশ এই সময়ে তাঁহাদের এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল। তেজ ও জাতীয়দর্পে পরিপূর্ণ, জাতীয় জীবনে উৎফুল্ল, যুদ্ধাদিতে অনুরক্ত এবং শারীরিক পরিশ্রমে আগ্রহান্বিত হইয়া জয়শালী হিন্দু আর্য্যজাতি পঞ্চনদ তীরে বাস করিতে লাগিলেন। গোধন, গোচর এবং অন্যান্য সম্পত্তি লাভে তাঁহাদের মহা আনন্দ। অনার্য্য "দস্যু" জাতিগণ বিরুদ্ধাচরণ করিল, কিন্তু হিন্দুরা অজেয় বাহু বলে দস্যুদের সমস্ত দেশ জয় করিয়া তাহাতে নূতন অধিকার সংস্থাপন করিলেন। আদিম নিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিত্য নূতন রাজ্য অধিকার করিতে করিতে এই যুগ নিঃশেষিত হইল। আর্য্যেরা এই সকল জয় লাভের কথা সগর্ব্বে ঋক্‌বেদ মন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং দেবতাদের নিকট অধিকতর ধন ও নূতনতর অধিকারের জন্য প্রার্থনা এবং দস্যুদের বিনাশের জন্য যাচ্ঞা করিয়াছেন। প্রকৃতিতে যাহা কিছু উজ্জ্বল, চিত্ত-মোহনকারী ও গৌরবযুক্ত, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুগণ তাঁহাদের পূজা প্রদান এবং তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে, সমস্ত আর্য্য সম্প্রদায় তখন একজাতি ভুক্ত ছিলেন। আর্য্যদের মধ্যে কোন জাতি-বিচার ছিলনা বটে, কিন্তু আর্য্য, অনার্য্য জাতি বিচার ছিল। যাজন, কৃষি, যুদ্ধাদি জীবিকা-ভেদজনক বর্ণবিচার তখন সমাজে প্রবেশ করে নাই। বহু-ক্ষেত্রের তেজস্বী অধিপতি একদিকে স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ ও গোচারণ করিতেন; আবার বাহুবলে স্বগ্রাম রক্ষা করিয়া দস্যুদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে সাগ্রহে বহির্গত হইতেন; গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহারাই তেজস্বী মন্ত্র প্রণয়ন পূর্ব্বক ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেন। তখন না ছিল দেবমূর্ত্তি; না ছিল দেবমন্দির। গৃহস্থ মাত্রেই স্বগৃহে অগ্নিস্থাপন করিয়া তাহাতে দুগ্ধ, পিষ্টক, সোমরস উৎসর্গ করিয়া দ্যুতিমান দেবতার নিকট ধন, জন, দেহবল এবং সমৃদ্ধি প্রার্থনা করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিরাই রাজা ছিলেন। ঋত্বিক রাখিয়া তাঁহারা যজ্ঞ ও বেদপাঠ করাইতেন বটে, কিন্তু তখন বংশানুক্রমে রাজা বা পুরোহিতের প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

আর্য্যেরা কোন্ সময়ে এইরূপ পঞ্চনদ অধিকার করিয়া ছিলেন? শ্রীযুক্ত কোলব্রক ইউরোপীয় সমাজে প্রথমে বেদের একটী বিবরণ প্রচার করেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ মণ্ডলাদি আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ন্যূনাধিক ৫০০ কি ৬০০ বৎসরে

হিন্দু আর্য্যগণ সিন্ধু ও পঞ্চনদ সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া তাহাতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক যুগ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এই মত এক্ষণে প্রায় সর্ব্ব পণ্ডিত-সম্মত। ভট্ট মোক্ষমূলর তদীয় নূতনতম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদ প্রণীত হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, সিন্ধু হইতে গণ্ডকী পর্য্যন্ত ভূভাগ পরাজয়, অধিকার ও কর্ষণায়ত্ত করিবা হিন্দুত্ব সংস্থাপন করিতে সহস্র বৎসর (পূঃ খ্রীঃ ১৫০০—৫০০) প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। অধ্যাপক হুইট্নী খ্রীষ্টের ২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ঋক্‌বেদ মন্ত্র প্রণয়নের সময় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর মার্টিন হগ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২০০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঋক্‌বেদ প্রণয়ন সময় অবধারণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বেদবিদ্ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ অব্দ মধ্যে ঋক্ প্রণীত হইয়া থাকিবে, এইটী বহু পণ্ডিত-সম্মত মত। এই কালকে আমরা বৈদিক-যুগ বলিয়া ব্যাখ্যাত করিব।

দ্বিতীয় যুগ।

হিন্দু আর্য্যেরা একবার শতদ্রুতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মর্ষি (গাঙ্গ্য) প্রদেশ প্রবেশ করিতে বিলম্ব করেন নাই। ঋক্‌বেদে গঙ্গা যমুনার নাম উল্লেখ নাই বলিলেও হয়। তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, যদিও কোন কোন তেজস্বী ব্যক্তি পঞ্চনদ পরিত্যাগ করিয়া দূরতর গাঙ্গ্য প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিয়া থাকিবেন, তথাপি বৈদিক যুগে গঙ্গা যমুনার কথা সাধারণতঃ পঞ্চনদস্থ আর্য্যদের বিশেষরূপে বিদিত ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে আধুনিক ত্রিহুত পর্য্যন্ত সমগ্র গাঙ্গ্য প্রদেশ হিন্দু অধিকৃত হইয়াছিল। অবিলম্বে ঐ গাঙ্গ্য প্রদেশে অনেক মহাবল পরাক্রান্ত জাতির প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সেই সেই জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দর্শন সাহিত্যাদির চর্চা হইয়া হিন্দু সভ্যতা ও আচার ব্যবহারে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

গাঙ্গ্য প্রদেশে যে সকল জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিখ্যাততম জাতি সমূহের কীর্ত্তি কলাপ হিন্দুদের মহা কাব্যাদিতে বিবৃত রহিয়াছে। আধুনিক দিল্লীর চতুঃপার্শ্বে কুরুজাতির রাজ্য সংস্থাপিত হয়। তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে আধুনিক কানোজের চতুঃপার্শ্বে পঞ্চাল জাতির রাজ্য ছিল। গঙ্গা ও গণ্ডকীর অন্তর্গত স্থানে আধুনিক অযোধ্যা প্রদেশে কোশল রাজ্য সন্নিবেশিত ছিল। গণ্ডকীর পূর্ব্ব পারে আধুনিক মিথিলা বা ত্রিহুত প্রদেশে বিদেহ রাজ্য, এবং আধুনিক বারাণসীর নিকটে কাশী রাজ্য সংস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় যুগে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহারাই তৎকালীন জাতি মধ্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কুরু পাঞ্চালেরা যমুনা গঙ্গা অন্তর্গত প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপিত করিয়া জাতীয় তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় দেন। তাঁহাদেরই যুদ্ধ বিবরণ হিন্দুদিগের প্রথম মহাকাব্য অর্থাৎ মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ত্তমান আকার যে প্রকার, তাহাতে

পরবর্ত্তী যুগ সমূহের অনেক রচনা যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি গাঙ্গ্য প্রদেশের প্রথম যোদ্ধৃজাতিরা কিরূপ সাহসী, সত্যপরায়ণ, তেজস্বী ও প্রতাপান্বিত এবং স্বাধিকার রক্ষার বিষয়ে কিরূপ জাগরূক ছিলেন, মহাভারত পাঠে তাহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এই সুরম্য গাঙ্গ্য প্রদেশে কয়েক শতাব্দী বাস করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে একদিকে যেমন বিদ্যাচর্চ্চা ও সামাজিক নীতি পরিবর্দ্ধিত হইল, অন্যদিকে তাঁহাদিগের সাহস, তেজস্বিতা প্রভৃতি বীরগুণ সকল হ্রাস পাইল। যতই নিম্নতর প্রদেশ সমূহে বসবাস করিতে লাগিলেন, ততই যোদ্ধৃ জাতির লক্ষণ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। বিদেহ ও কাশী রাজসভা পণ্ডিতে ও বিদ্বানে পরিপূর্ণ; কিন্তু তৎকালীন গ্রন্থে পূর্ব্ববৎ বীরত্বের লক্ষণ পাওয়া যায় না। কোশলরাজ্যের লোকেরা সুমার্জ্জিত জাতি বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়; রামায়ণে সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার যথেষ্ট দেখা যায়; পৌরহিত্যের প্রাধান্য হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ লক্ষিত হয়, এবং ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধারও নিদর্শন দৃষ্ট হয়, কিন্তু মহাভারতে যে সাহস, বীর্য্য, তেজস্বিতা, এবং স্বাধিকার রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা লক্ষিত হয়, রামায়ণে তাহা ততদূর দৃষ্ট হয় না।

হিন্দুদের ক্রমশঃ সাহস হ্রাস ও তেজোহীনতা নিবন্ধন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল। ধর্ম্ম প্রণালীর কতকটা পরিবর্ত্তন হইল। যে সকল তেজস্বী ও সরল ঋক্ উচ্চারণ করিয়া পঞ্চনদের বিজয়ী বীরেরা দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, তাহা নিস্তেজ কর্ম্মকাণ্ড-প্রিয় গাঙ্গ্য প্রদেশের হিন্দুদের মনঃপূত হইল না। এক্ষণে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ পদ্ধতি পূর্ব্বকার অতি সহজ মন্ত্র পাঠ ও সরল যজ্ঞ নিয়মকে যেন আবৃত করিয়া ফেলিল। পুরোহিতের সংখ্যা ও প্রতাপ বৃদ্ধি হইল, এবং অবশেষে বংশানুক্রমে পৌরহিত্যের নিয়ম হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি হইল।

পঞ্চনদে থাকিয়া যোদ্ধৃ পুরুষেরা কৃষি ও গোচারণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু গাঙ্গ্য প্রদেশে যোদ্ধা ও নরপতিদিগের সৈন্য, আড়ম্বর এবং ভোগ বিলাস প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারাও সাধারণ লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বংশানুক্রমিক ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িলেন। ঋক্ বেদে যাহাদিগকে বৈশ্য বা বিশ্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দু জাতি গঠিত, পঞ্চনদে থাকিতে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের যে সাহস বীর্য্য ছিল, এক্ষণে তাহারা সে বীর্য্য ও সামাজিক স্বাধীনতা হারাইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিল। অধীনতা ও অধঃপাতে যাওয়া, একই কথা। ইহার পর হিন্দুরাজ্য সমূহে রাজা ও যোদ্ধাদিগের বীর্য্য লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের ও জন সাধারণের বীর্য্য, ক্ষমতা বা রাজনৈতিক প্রভাব আর লক্ষিত হয় না। অবশেষে যে সকল অনার্য্যেরা বিজিত হইয়া আর্যাদের আচার নীতি অনুকরণ করিল, তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। কিন্তু কোনও প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান বা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে তাহাদের অধিকার জন্মিল না।

দ্বিতীয় যুগে এই প্রকারে জন্মগত

জাতি প্রণালীর সৃষ্টি হইল। লোক সাধারণের দুর্ব্বলতা ও নির্জ্জীবতাই এই জাতি সৃষ্টির কারণ, এবং এই জাতি সৃষ্টি হইতে সেই দুর্ব্বলতা ও নির্জ্জীবতা আরো দৃঢ়তর হইয়াছে।

দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন, এবং লোক সাধারণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তিবর্গপদানত হইল। এই যুগের অবসান কালে ক্ষত্রিয়দিগের মনের ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। তখন, দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের কষ্টবহ অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে, এবং বিদ্যা, বেদ-পরায়ণতা ও ধর্ম্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে সকল অর্থ শূন্য কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বর সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়দের অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সত্য ও ধর্ম্ম নির্ণয়ের নূতন পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইল। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিল।

যে যুগে আর্য্যেরা গাঙ্গ্য প্রদেশ অধিকার করেন, তখনই বেদ চতুষ্টয় সংগৃহীত ও মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হয়। যে প্রণালীতে যজ্ঞাদি করিতে হইবে, তাহার সবিস্তার বিবরণ সম্বলিত "ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থাবলী প্রণীত হয়। এই সকল সারশূন্য এবং সুবিস্তৃত গ্রন্থ হইতে উক্ত যুগের পুরোহিতের প্রাধান্য লাভ চেষ্টা ও জন সাধারণের পৌরুষ-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংসার হইতে অরণ্যে গমন ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। এই যুগে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণ সমূহের শেষাংশের নাম "আরণ্যক"। তাহাতে বানপ্রস্থ ধর্ম্মের বিবরণ রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের তেজস্বী চিন্তাশক্তির ফল উপনিষদ নামে পরিচিত, তাহা এই সময়কার সর্ব্ব শেষ গ্রন্থের মধ্যে গণ্য। এই সকল বেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক-উপনিষদ্ মিলিত হইয়া হিন্দুদের শ্রুতি শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হোরেস উইলসন্ বলিয়াছেন যে, ৫০০ বৎসরের অধিক কালে দ্বিতীয় যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন পরিপক্ক হইয়া থাকিবে। এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। এই যুগে শতদ্রু হইতে ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ গাঙ্গ্য প্রদেশে আর্য্য রাজ্য বিস্তৃত হয়, আর্য্য সভ্যতা ও আচার ব্যবহার প্রচারিত হয়। অনেক পরাক্রমশালী রাজবংশের উদয়, হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তর আড়ম্বর বৃদ্ধি, বংশানু-ক্রমিক জাতীয় নিয়ম হইয়া সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য সংস্থাপন ও দৃঢ়ীকরণ দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রতিবাদ, এবং বিবিধ মত ও চিন্তা-সম্বলিত ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদি গ্রন্থ সমূহের সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১৪০০ হইতে ১০০০ অব্দ পর্য্যন্ত এই যুগের ব্যাপ্তিকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় যুগকাল নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তৎ সম্বন্ধে এই উপক্রমণিকা ভাগে দুই একটী কথা বলিলে বাহুল্য হইবে না। এই যুগের সর্ব্ব প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা কুরু পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে। এই যুগের সর্ব্ব প্রধান সাহিত্য বিষয়ক ঘটনা বেদ-সংগ্রহ। লোক পরম্পরাগত জনশ্রুতি এবং মহাভারতেরও

উক্তি যে, বেদ সংগ্রহকারক দ্বৈপায়ন ব্যাস কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধের সমকালীন লোক।

জনশ্রুতি আছে, যখন বেদ সংগ্রহ করা হয়, তখন দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন অবস্থিতি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বেণ্টলী এবং আর্কডিকন প্রাট নামক দুই জন ইউরোপীয় জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১১৮১ অব্দে এই প্রকার অয়ন নির্ণয় হইয়া থাকিবে।

এক পুরুষে এবং এক ব্যক্তি কর্ত্তৃকই যে বেদ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা না হইতে পারে। অনেক বেদবিদ্ পণ্ডিতের সহায়তায় এবং সম্ভবতঃ একাধিক পুরুষে ঐ সংগ্রহ কার্য্য সমাপ্ত হইয়া থাকিবে। অতএব যদি ১১৮১ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে বেদ সংগ্রহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া অয়ন নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী বেদ সংগ্রহ সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরাও দ্বিতীয় যুগের কাল এই সময় নিরূপণ করিয়াছি।

এখন কুরু পাঞ্চালদিগের যুদ্ধের কথা বলা হইতেছে। ভারতবর্ষের নানা রাজ বংশের ইতিহাস পুরাণে এই প্রাচীন যুদ্ধের কথার উল্লেখ আছে, এবং এই সকল পুরাণের কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্যও বটে। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং মগধ বংশের ইতিহাস হইতে অবগত হই যে, বুদ্ধ এবং কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধের মধ্যে ৩৫ জন রাজা রাজপদ পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজার রাজত্ব সময় ২০ বৎসর হিসাব করিলে, এই গণনায় খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যুদ্ধের সময় নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানি যে আলেকজাণ্ডর ভারতবর্ষে আসিবার অনুমান ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩৭০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে নন্দ রাজা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যে, নন্দের ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। এই হিসাবে পরীক্ষিৎ ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অনুমান ১৪০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে কুরু-পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, আমরা জানি যে খ্রীষ্টের পর প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা কনিষ্ক কাশ্মিরে রাজত্ব করিতেন, এবং তদীয় উত্তরাধিকারী অভিমন্যু সম্ভবতঃ উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাশ্মীর ইতিহাস-লেখক বলেন, কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধ ও অভিমন্যুর রাজত্ব এতদুভয় মধ্যে ৫২ নৃপতি ১২৬৬ অব্দ রাজত্ব করেন। এই গণনানুসারে ও খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাভারতীয় যুদ্ধের কাল নির্ণয় হয়।

যে সকল সন তারিখ প্রদত্ত হইল, পাঠকদিগকে তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলিনা। তবে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণ হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে অনুমান ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কুরু পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা ত দ্বিতীয় যুগের কাল এই সময় নিরূপণ করিয়াছি। ১৪০০ হইতে ১০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় যুগ।

প্রথম যুগকে আমরা বৈদিক যুগ বলিয়াছি। দ্বিতীয় যুগকে আমরা মহাকাব্যের যুগ বলিতে পারি। কারণ মহাভারত ও রামায়ণ লিখিত কুরু-পাঞ্চাল

ও কোশল-বিদেহ জাতিগণ এই সময়ে গাঙ্গ্যপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

তৃতীয় যুগ।

তৃতীয় যুগ হিন্দু ইতিহাসের মহাপ্রতিভ-ন্বিত ও গৌরবপূর্ণ সময়। এই সময়ে আর্য্যেরা গাঙ্গ্যপ্রদেশ বা মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তৎ তৎ দেশে স্বাধিকার বিস্তার করিলেন, এবং হিন্দু আচার নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া আসমুদ্র ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় যুগে মগধ দেশে হিন্দু সভ্যতা সম্যক্ রূপে প্রচলিত হয় নাই,—তৃতীয় যুগে এই মগধ দেশই নূতন সভ্যতার বলিষ্ঠ হইয়া যে কোশল বিদেহ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য জয় করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে অপ্রতিহত ও অদ্বিতীয় গৌরব সংস্থাপন করিল। সকল গর্ব্বিতজাতি কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধে মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যে সকল প্রাচীনতর জাতি সিন্ধুতীরে আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎ তৎ বংশীয়েরাও এক্ষণে দুর্দ্দমনীয় মগধ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিলেন। মেকাওার সাহের সমসাময়িক চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত মগধ শাসনাধীন করিলেন; এবং তদীয় পৌত্র মহাবীর অশোক রাজা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ একছত্র করিলেন। অশোকের সময়ে তৃতীয় যুগের শেষ এবং চতুর্থ বা বৌদ্ধ যুগের আরম্ভ।

দক্ষিণ প্রদেশসমূহে যে সকল রাজত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অধিকতর যশস্বী হইয়াছিল। তন্মধ্যে অন্ধ্রবংশ দাক্ষিণাত্যে প্রতাপান্বিত হইয়া নানা প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন এবং তৎপরে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন। তদধিক দক্ষিণ প্রদেশে আর্য্যেরা প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির সংঘর্ষে আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটী রাজত্বের সৃষ্টিপাত করিলেন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে তৃতীয় শতাব্দীতে চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্যের প্রাদুর্ভাব হয়।

পশ্চিমে আরব সমুদ্র উপকূলে সৌরাষ্ট্র নামে একটী আর্য্য রাজ্য সংস্থাপিত হইল। পরন্তু সমুদ্রের অপর তীরস্থ লঙ্কা আবিষ্কৃত হইলে তাহা হিন্দু বণিকদিগের বাণিজ্যের একটী প্রধান বন্দর হইল, অবশেষে রাজাধিরাজ অশোকের পুত্র লঙ্কায় আগমন করিয়া লঙ্কাবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করাইলেন।

একদিকে রাজ্যবিস্তার, অন্যদিকে অসংখ্য শাস্ত্র সঙ্কলন, এই যুগের কার্য্য ও সাহসিকতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ শব্দাড়ম্বর পূর্ণ ও সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মকাণ্ড প্রণালী সংক্ষিপ্ত হইয়া "সূত্র" সকল রচিত হইল। এই রূপে উত্তরে দক্ষিণে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সূত্রপ্রণয়ন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত নিরুক্ত, ছন্দঃ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিত। এই সময়ে যাস্ক নিরুক্ত প্রণয়ন এবং পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিলেন। যে প্রণালীতে যজ্ঞীয় বেদী পরিমাপ ও প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণ হইতে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রতত্ত্ব শাস্ত্রের (geometry) আবিষ্কার হইল।

উপনিষৎ নামক গ্রন্থে যে সমূহ গভীর আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার ও চরম ফল আমরা এই তৃতীয় যুগে দেখিতে পাই। খ্রীষ্টাব্দের ৭০০ কি ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কপিল আবির্ভূত হইয়া সাংখ্যদর্শন প্রচার করি-

লেন। পরে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ এই সাংখ্যদর্শনের কঠোর ন্যায় যুক্তির সহিত তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বব্যাপী দয়া এবং মনুষ্য জাতির জন্য প্রীতি যোগ করিয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, অদ্যাপি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকে সেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আত্মার তৃপ্তি লাভ করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম দীনদরিদ্রের মধ্যে অতি মন্দগতিতে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের প্রবর্ত্তিত জাতিভেদ প্রণালীর বিরোধী। খ্রীষ্টের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, এবং সেই সময় হইতে ঐ ধর্ম্ম শীঘ্রই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে চতুর্থযুগ বা বৌদ্ধ যুগের আরম্ভ।

পাঠকবর্গ দেখিতে পাইলেন, তৃতীয় যুগের কাল নির্ণয় করা কষ্টকর নহে। মহারাজা অশোক খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৬০ অব্দে সম্রাট্ হয়েন এবং ২৪২ অব্দে ধর্ম্মগ্রন্থ নিরূপণ করিবার জন্য প্রকাণ্ড বৌদ্ধসভা আহ্বান করেন। ইতিপূর্ব্বে গৌতমের মৃত্যুবর্ষে ৪৭৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহার শত বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৭৭ অব্দে এইরূপ দুই সভা আহূত হয়। কিন্তু অশোক ২৪২ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে যে ধর্ম্মসভা আহ্বান করিলেন, তদ্দ্বারা নিরূপিত ধর্ম্ম গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষে, এবং ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া প্রচারিত হইল। সুতরাং ২৪২পূঃ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় যুগের শেষ ও চতুর্থ যুগের আরম্ভ বলিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দশম শতাব্দীতে দ্বিতীয় যুগের শেষ। সুতরাং দশম শতাব্দী হইতে ২৪২ অব্দ পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল। এই কালে কপিলাদি দার্শনিকগণ হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন; অতএব আমরা এই কালকে দার্শনিক যুগ বলিতে পারি।

চতুর্থ যুগ

মহারাজ অশোক সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপতি ছিলেন ও গুর্জ্জর হইতে উৎকল পর্য্যন্ত আসমুদ্র ভারতবর্ষের গিরিকন্দরে, প্রস্তর স্তম্ভে ও পর্ব্বতশৈলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশবাণী প্রচার করিলেন। তিনি জীবহিংসা নিবারণ করিলেন, সুবিস্তৃত রাজ্য মধ্যে মনুষ্য পালিত পশুর জন্য ঔষধ ও পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন; পিতা মাতা ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিরূপণ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন, এবং দেশ হইতে দেশান্তরে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত দীন ধনী, সকলের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রচারকদিগকে প্রেরণ করিলেন। অশোক রাজার প্রস্তর-খোদিত অনুশাসন হইতে আমরা অবগত হই যে, তিনি সিরিয়া, মিশর, মাসিডন, সাইরিণী ও ইপাইরস দেশের গ্রীক রাজাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সেই সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকগণ সিরিয়া ও পালেষ্টিন দেশে যে ধর্ম্মনীতি প্রচার করেন, সেই ধর্ম্মনীতি হইতেই তাহার দুই শত বৎসর পরে যিশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মনীতির উৎপত্তি।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৩২০ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের সময় যে মৌর্য্যবংশের উদয় হয়, অশোকের পর সে বংশ অনেক দিন তিষ্ঠিতে পারে

নাই। ইহার পরে সুঙ্গ ও কন্ব নামে অল্লায়ু দুই বংশের উদয় হয়। তাহার পরই অন্ধ্র-জাতির অভ্যুদয়। অন্ধ্রবংশীয়েরা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া মগধ হস্তগত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রভুত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক ৪৫০ বর্ষ রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৬ অব্দ হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৪৩০ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব কাল। তাঁহারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বী ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এই বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানি উভয় সমভাবে চলিতেছিল। ধর্ম্ম-নির্য্যাতন করা অবিদিত ছিল বলিলে হয়। অন্ধ্র-বংশের পর গুপ্তবংশের উদয় হয়; তাঁহারা অনেকেই হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু বৌদ্ধদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধমঠ সংস্থাপনের জন্য তাঁহারা ভূম্যাদি দান করিয়া গিয়াছেন।

ইতি মধ্যে বিদেশীয় জাতিরা ক্রমাগত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তুরাণীয় আক্রমণকারীদের তাড়না পাইয়া বাক্‌ত্রিয়ার গ্রীকেরা খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ আক্রমণ, তথায় রাজ্য স্থাপন, ও গ্রীক সভ্যতা প্রচার করিয়া ছিলেন। তৎপরে ইউ-চি বংশীয় তুরাণি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরে পদার্পণ করেন। কাশ্মীরাধিপতি কনিষ্ক ইউ চি বংশীয় নৃপতি ছিলেন; তিনি গুজরাট ও আগ্রা হইতে কাবুল ও কাশগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং কাশ্মীরে উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদের এক বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। ইহার পর কাম্বোজ এবং কাবুলের অন্যান্য জাতি বহুসংখ্যায় ভারতবর্ষ প্রবেশ করে; এবং তাহাদের পদানুসরণ পূর্ব্বক অসংখ্য হূন জাতীয়েরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিমভারতবর্ষে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। সম্রাট অশোকের পর ক্রমাগত ছয় কি সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিদেশীয়গণ প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু ভারতাক্রমণকারীরা সকলেই ভারতে অধিকার লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় লোকের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল।

সম্রাট অশোকের দিন হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধদের চৈত্য, স্তূপ ও বিহার ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধ চৈত্যাদি আর দৃষ্ট হয় না। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে লাগিল, এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দু মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অতএব আমরা অশোকের সময় হইতে খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত চতুর্থ অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগ বলিব।

অশোকের আহূত সভা যে ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন, বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে তাহাই সর্ব্বপ্রধান মহামূল্যবান। ত্রিপিটক নামক এই গ্রন্থ পালি অক্ষরে লিখিত, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আদি ইতিহাসের উৎকৃষ্টতম উপকরণ।

বৌদ্ধ যুগের হিন্দু ধর্ম্ম প্রণালী ও চিন্তা-শক্তি মনুসংহিতায় আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্ম সূত্র সংগ্রহ করিয়া মনুসংহিতা লিখিত। কিন্তু ধর্ম্মসূত্র সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋষিদের কৃত। মনুর সংহিতায় এই বিভেদের কোনই পরিচয় নাই।

তিনি সমগ্র আর্য্যজাতির জন্য সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। যখন মনুসংহিতা প্রণয়ন হয়, তখনও পৈতৃক ব্যবসায় অনুসারে হিন্দুরা নানা জাতিতে বিভক্ত হয়েন নাই। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন সমগ্র হিন্দুজাতি বৈশ্য নামে পরিচিত ছিলেন। মনু যে কয়েকটা শঙ্কর বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতি। কামার, কুমার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় প্রভৃতি লোকদিগকে মনু বর্ণশঙ্কর বলেন নাই,—ইহারা বৈশ্য। আধুনিক ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলকেই বর্ণশঙ্কর বা শূদ্র বলিতে বড়ই ব্যস্ত!

পঞ্চম যুগ।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সময়কে হিন্দু ইতিহাসের পঞ্চম যুগ বা পৌরাণিক যুগ বলা যায়। খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ হইতে ১২০০ অব্দ অর্থাৎ মুসলমান কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার পর্য্যন্ত এই যুগের ব্যাপ্তিকাল।

এই সময়ে অনেক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই বিদেশীয়েরা ভারত আক্রমণ করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে এই দুঃখের প্রতিশোধ করিবার উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইল। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অদ্বিতীয় সম্রাট্ উজ্জয়িনীর নরপতি মহাত্মা বিক্রমাদিত্য কোরুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে শকাদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং হিন্দুর স্বাধীনতা স্থাপন করিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে হিন্দুর প্রতিভা ও বিদ্যার চর্চ্চা নবজীবন পাইল ও নূতন আকারে হিন্দুধর্ম্ম অবির্ভূত হইল।

বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫০ বৎসর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ হইতে ৭৫০ অব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের মহাগৌরবান্বিত যুগ। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আদৃত গ্রন্থ কাব্য সমুদায় এই সময়ে লিখিত হয়। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ হইয়া অনুপম কাব্য নাটক রচনা করেন। অভিধান প্রণেতা অমরসিংহ নব রত্নের এক রত্ন ছিলেন। ভারবি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন, অথবা কালিদাসের অনতিপরে আবির্ভূত হয়েন। বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় শীলাদিত্য ৬১০ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, এবং রত্নাবলী নাটক তাঁহার আমাত্যবর্গের মধ্যে কাহারও রচিত হইবে ও তাঁহার নামে পরিচিত। দ্বিতীয় শীলাদিত্যের সময় দশকুমার চরিত রচয়িতা দণ্ডী জীবিত ছিলেন। কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্ট তাঁহার সভাসদ মধ্যে গণ্য ছিলেন। বাসবদত্তা-রচয়িতা সুবন্ধু বাণভট্টের সমসাময়িক লোক। এই রাজার রাজত্ব সময়েই শতক-প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি ভট্টিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

তাহার পর যশোবর্ম্মন্ খ্রীষ্টীয় ৭০০ হইতে ৭৩০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন, সুবিখ্যাত ভবভূতি এই রাজার সময়ে তাঁহার অতুল্য নাটক সমূহ প্রণয়ন করেন। মহাভারত ও রামায়ণ দ্বিতীয় যুগ হইতে অল্পে অল্পে রচিত হইয়া আসিতেছিল, এই যুগেই তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল। আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতেছি, এই যুগেই তাহাও প্রণীত হয়।

সার্দ্ধদ্বিশত কালমধ্যে হিন্দু বিজ্ঞানের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলিরও উদয় হয়। আর্য্যভট্ট খ্রীষ্টীয় ৪৭৬ অব্দে জন্ম

গ্রহণ করিয়া তদীয় জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পশ্চাৎ বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে গণ্য হয়েন। খ্রীষ্টীয় ৫৯৮ অব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম; তিনি উপন্যাসক বাণভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। বিদ্যার গৌরবে ও বুদ্ধির প্রতিভায় এই সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর সবিশেষ উজ্জ্বল। তাহার পর দ্বিশত বর্ষ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ৭৫০ হইতে ৯৫০ অব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব! কোন প্রতাপান্বিত সম্রাট্ কি কোন প্রতিভাশালী কবি, কি কোনও তেজস্বী বিজ্ঞানবেত্তা এই দ্বিশত বর্ষের মধ্যে আবির্ভূত হয়েন নাই।

কিন্তু এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কি প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, আমরা অন্যান্য উপায়ে তাহার আভাস পাইতেছি। এই যুগে পুরাতন প্রতাপশালী রাজবংশীয়েরা বিলুপ্ত হইল এবং প্রাচীন জাতি সমূহ অধোগতি প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে যেরূপ রোম রাজ্যের অধঃপাত হইয়া ফিউডাল রাজন্যবর্গের উদয় হয়, ভারতবর্ষেও সেইরূপ সমুদয় পুরাতন রাজবংশের লোপ হইয়া এক নূতন রাজন্যবর্গের উদয় হইল। তাঁহারা আধুনিক ভারতবর্ষের রাজপুতগণ! খ্রীষ্টের ৯৫০ অব্দে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র রাজপুত প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। উজ্জয়িনী ও কাণ্যকুব্জে বিক্রমাদিত্যের বংশীয়দের সিংহাসনে তাঁহারা অধিরোহণ করিলেন, এবং পশ্চিম ভারতের ও গুজরাটের বল্লভী বংশীয়দের রাজ্য তাঁহাদের হস্তগত হইল। তাঁহারাই বিপদের সময়ে ভারতরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং গজনীপতি সুলতান মাহমুদের ভারতাক্রমণের সময় তাঁহারাই দেশ রক্ষার সংগত হইলেন।

এই যুগে কেবল এক অভিনব রাজবংশের উদয় ও ক্ষমতা প্রাপ্তি হইল, তাহা নয়; আধ্যাত্ম জগতেও এক প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার বংশীয়দের সময়ে হীনপ্রভ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ছিলনা। বিক্রমাদিত্য হিন্দুদের প্রতি অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের নির্য্যাতন করিতেন না। তাঁহার অনেক সভাসদ্, এমন কি, একতম রত্ন অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বংশীয়েরা কেহবা বৌদ্ধের কেহ বা হিন্দুর উপর অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু কাহারও নির্য্যাতন ছিল না। রত্নাবলী রচয়িতা দ্বিতীয় শীলাদিত্য নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন, চীন পরিব্রাজক হোয়েন সাঙ ভারতে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই যুগে নির্য্যাতন-কথা কাহারও কল্পনায় প্রবেশ করে নাই। স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দুয়ানি নবজীবন পাইয়া প্রাধান্য লাভ করিতেছিল, এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অল্পে অল্পে অবনতি হইতেছিল। কিন্তু ৭৫০ হইতে ৯৫০ অব্দ মধ্যে বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন, তাঁহাদের চৈত্য, বিহার ও গ্রন্থ সমূহের অগ্নিদাহ, এবং বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করার বিশেষ প্রমাণ আছে। ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মের পরমশত্রু শঙ্করাচার্য্যের জন্ম। তাঁহার গ্রন্থে যে নির্য্যাতন-স্পৃহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তৎকালীন নরপতিরা সেই রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং মুমূর্ষু বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ করিলেন।

নবোত্থিত রাজপুত জাতি যে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কোথা হইতে এই রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হয়, তদ্বিষয়ে নানা মত উদ্ভাবিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হোরেস উইলসন, কর্ণেল টড এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে সকল বিদেশীয় আক্রমণকারীগণ (শকাদি জাতিরা) নানারূপে ভারত প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদিগকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাড়না করিয়াছিলেন, তাঁহারাই রাজপুতানার মরুভূমিতে বাস স্থাপন করেন এবং আধুনিক রাজপুতগণ তাঁহাদেরই সন্ততি। সে যাহা হউক, রাজপুতদের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ অতি আধুনিক ঘটনা। বেদ উপনিষদাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাজপুত নাম দৃষ্ট হয় না। নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অপর ধর্ম্ম-নির্য্যাতন স্পৃহা বলবতী হয়, রাজপুতদের তাহাই হইল। কেহ অভিনব হিন্দু বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে, এজন্য তাঁহারা সূর্য্য চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন, এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের এই দাবী মঞ্জুর করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিনাশ ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কার্য্য সিদ্ধ করাইয়া লইলেন। রাজপুতগণ যে কোন দেশ জয় করিলেন, বৌদ্ধ সেই দেশেই চৈত্য বিহার ধ্বংস করিয়া হিন্দুমন্দির ও দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টের দশম শতাব্দীর মধ্যে রাজপুতগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই রাজা হইলেন, এবং প্রতিমা পূজা রূপ ভিত্তির উপর নূতন আকারের হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাসের সৌসাদৃশ্য অতি বিস্ময়জনক। রোমীয় সম্রাটেরা যেমন রোম-আক্রমণকারী বর্ব্বরদিগের গতি প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্যও তদ্রূপ শকদিগকে ভারত প্রবেশে বাধা দিয়াছিলেন। শত শত বৎসর পর্য্যন্ত রোম ও হিন্দুরা স্বদেশ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষ উভয়ত্র আক্রমণকারিদের জয় হইল, এবং প্রাচীন রাজত্ব ও প্রাচীন জাতিগণ হীনবল হইল। উভয়ত্র এইরূপ পরাজয়ের পর জাতীয় ইতিহাস নীরব, অথবা কেবল অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনের কথায় পরিপূর্ণ। ঘোর অমানিশির অন্ধকারের পর সূর্য্যোদয়ের ন্যায়, ইউরোপে ফিউডাল রাজন্যবর্গ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যেমন পুরোহিত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই ধর্ম্ম বিস্তার করিলন, ভারতবর্ষেও নবহিন্দুরাজপুতক্ষত্রিয়েরা নবোৎসাহে পৌরাণিক হিন্দুয়ানি ও পুরোহিত-প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন।

এস্থলেই সৌসাদৃশ্যের শেষ নয়। ইহার পর ফ্রান্স স্পেন প্রভৃতির নরাধিপতিরা যেমন মুসলমানদের হস্ত হইতে আত্ম রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইলেন, ভারতবর্ষের রাজপুতগণ তেমনি মুসলমানদের আক্রমণে বাধা দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে ইংলণ্ডপতি সিংহবীর্য্য রিচার্ড তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দিল্লীপতি পৃথুরায় মুসলমান-আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইউরোপে খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া তাড়িত করিলেন, কিন্তু ভারত-

বর্ষে রাজপুত রাজন্যবর্গ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ১১৯৩ ও ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদঘোরী দিল্লী ও আজমীর, কানোজ ও কাশীর নরপতিদিগকে পরাজয় করিলেন; এবং তাহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমান অধীনতা স্বীকার করিল।

এই পঞ্চম পৌরাণিক যুগের ব্যাপ্তিকাল খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত। আমরা ইতিপূর্ব্বে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। সংবৎ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রচলিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিতেন যে, পূর্ব্বশতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য ও কবি কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আধুনিক পুরাবেত্তাদের গবেষণায় বিক্রমাদিত্যের যশসৌরভ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রাচীনত্বের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হইয়াছে। তদীয় অভ্যুদয় কাল সম্বন্ধে অধুনা কিঞ্চিৎ মাত্র সন্দেহ নাই। বিক্রমাদিত্য ও তদীয় সভারত্ন কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এস্থলে দুই এক কথা বলিয়া নিরস্ত হইব।

বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের একতম রত্ন ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তিনি যে জ্যোতিষশাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি নিজের সময় নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন,—সে সময় খ্রীষ্টের পর ষষ্ঠ শতাব্দ। অমরসিংহ অন্যতম রত্ন। তিনি বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং পঞ্চশতাব্দির পর এই মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহাও নির্ণীত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক হোয়েন সাঙ বলেন, বিক্রমাদিত্যের পর প্রথম শীলাদিত্য রাজা সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, এবং ঐ প্রথম শীলাদিত্য হোয়েন সাঙের ভারত গমনের ষষ্টি বর্ষ পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। ইহা হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হয়। কাশ্মীর ইতিহাস-লেখক কহ্লণ পণ্ডিত বলেন যে, কাশ্মীরের কনিষ্ক রাজার পর ত্রিংশৎ জন রাজা রাজ্য করেন, তৎপর উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য ও কাশ্মীরে মাতৃগুপ্ত রাজা হয়েন। কনিষ্কের প্রচলিত মুদ্রা হইতে এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে আমরা অবগত হই যে, তিনি খ্রীষ্টের জন্মের পর শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। অতএব বিক্রমাদিত্য ও মাতৃগুপ্ত যে খ্রীষ্টের অনুমান পাঁচ শত বৎসর পর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তবে সম্বৎ কি? ও শকাব্দই বা কি? সম্বৎ বিক্রমাদিত্যের অব্দ নহে,—মালব জাতির একটি বহুৎ কাল প্রচলিত অব্দ। শকাব্দ শালীবাহনের অব্দ নহে, কাশ্মীরের তুরণীয় (অর্থাৎ শক) নরপতি কনিষ্কের অব্দ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কনিষ্কের নাম সকল বৌদ্ধদেশে প্রসিদ্ধ, এবং শকাব্দ নামক তাঁহার অব্দ তিব্বত ও ব্রহ্ম, সিংহল ও যবদ্বীপ প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল ঘটনার কাল নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে কয়েক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে। পাঠ-সৌকর্য্যার্থে নিম্নে প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। বৈদিক যুগ।

১। সিন্ধুপ্রদেশে আর্য্য নিবাস স্থাপন　খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ পর্য্যন্ত।

২। ঋগ্বেদ প্রণয়ন　ঐ

২। মহাকাব্যের যুগ।

৩। গাঙ্গ্যপ্রদেশে আর্য্যনিবাস খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১৪০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত।
৪। চন্দ্রায়ন নির্ণয় (lunar zodiac) „ ১৪০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত।
৫। বেদসংগ্রহ „ ১৪০০ „ ১২০০ „
৬। কুরু পাঞ্চালের প্রাদুর্ভাব সময় ১৪০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত।
৭। কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধ „ ১২৫০
৮। কোশল, কাশী ও বিদেহ রাজ্যের প্রাদুর্ভাব „ ১২০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত।
৯। ব্রাহ্মণ প্রণয়ন „ ১৩০০ হইতে ১১০০ পর্য্যন্ত।
১০। উপনিষৎ প্রণয়ন „ ১১০০ „ ১০০০ „

৩। দার্শনিক যুগ।

১১। আর্য্যদের সমগ্র ভারতজয় খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১০০০ হইতে ২৪২ অব্দ পর্য্যন্ত।
১২। যাস্ক „ ৯ম শতাব্দী সম্ভবতঃ।
১৩। পাণিনি „ ৮ম শতাব্দী সম্ভবতঃ।
১৪। সূত্র নানা ঋষি প্রণীত ৮০০ „ ২০০ „
১৫। সুল্ব সূত্র (ক্ষেত্রতত্ত্ব বা Geometry). ৮ম শতাব্দী।
১৬। কপিল ও সাংখ্যদর্শন „ ৭০০
১৭। অন্যান্য দর্শন ৬০০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত।
১৮। গৌতম বুদ্ধ ৫৫৭ হইতে ৪৭৭ „
১৯। মগধ-রাজ বিম্বসার ৫৩৭ „ ৪৮৫ „
২০। অজাতশত্রু „ ৪৮৫ হইতে ৪৫৩ „
২১। প্রথম বৌদ্ধসভা (মহাসঙ্ঘ) „ ৪৭৭
২২। দ্বিতীয় বৌদ্ধসভা „ „ ৩৭৭
২৩। মগধের রাজা, নয়জন নন্দ ৩৭০ হইতে ৩২০
২৪। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ হইতে ২৯১ „
২৫। মগধরাজ বিন্দুসার ২৯১ হইতে ২৬৩ „
২৬। উজ্জয়িনীর সামন্ত, অশোক ২৬৩ হইতে ২৬০ পর্য্যন্ত।
২৭। সম্রাট অশোক „ ২৬০ হইতে ২২২ „
২৮। তৃতীয় বৌদ্ধসভা (মহাসঙ্ঘ) „ ২৪২
২৯। মহেন্দ্র কর্ত্তৃক সিংহল প্রবেশ „ ২৪০
৩০। কাত্যায়ন খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৪র্থ শতাব্দী।
৩১। পাতঞ্জলি „ ২য় শতাব্দী
৩২। অন্ধ্ররাজ্য সংস্থাপন „ ৬০০ সম্ভবতঃ।
৩৩। চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্য ৪০০ সম্ভবতঃ।
৩৪। আর্য্যকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ও উৎকলাধিকার „ ৫০০ হইতে ২০০ অব্দ।

৪। বৌদ্ধ যুগ।

৩৫। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৪২ অব্দ হইতে খ্রীষ্টের পর ৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত।
৩৬। মগধে মৌর্য্যবংশ „ খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৩২০ হইতে ১৮৩ পর্য্যন্ত।
৩৭। মগধে সুঙ্গ বংশ „ ১৮৩ „ ৭১ „
৩৮। মগধে কণ্ব বংশ „ ৭১ „ ২৬ „
৩৯। মগধে অন্ধ্রবংশ „ ২৬ হইতে খ্রীষ্টের পরে ৪৩০ পর্য্যন্ত
৪০। পরাশর কৃত জ্যোতিষ „ ২০০
৪১। গর্গ কৃত জ্যোতিষ „ ১০০
৪২। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সমুদয়, খ্রীষ্টের পর ২০০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত।
৪৩। গুপ্ত সম্রাটগণ „ ৪০০ „ ৫০০
৪৪। বাক্‌ত্রিয়াদের (বাহ্লিক) ভারতাক্রমণ খ্রীষ্টেরপূর্ব্বে ২য় ও ১ম শতাব্দী।
৪৫। ইউ-চিদের ভারতাক্রমণ খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ও পরে প্রথম শতাব্দী।
৪৬। কনিষ্কের কাশ্মীরে রাজত্ব ও শকাব্দ প্রচলন খ্রীষ্টের পরে ৭৮ অব্দে।
৪৭। সৌরাষ্ট্রে সাহ রাজাদের শাসন „ ১৫০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত।

৪৮। কাম্বোজ অর্থাৎ কাবুল কান্দাহারবাসী কর্ত্তৃক ভারত প্রবেশ „ ২০০ „ ৪০০ „

৪৯। গৌর হূনজাতি কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ „ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী।

৫। পৌরাণিক যুগ।

৫০। পৌরাণিক ধর্ম্ম খ্রীষ্টাব্দ ৫০০ হইতে ১২০০

৫১। বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী ও আর্য্যাবর্ত্ত শাসন „ ৫১৫ „ ৫৫০

৫২। কোরুর যুদ্ধে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক শক পরাজয় ” ৫৪০

৫৩। কালিদাস, অমরসিংহ ও বররুচি ” ৫২০ হইতে ৫৫০

৫৪। ভারবি, বিষ্ণুশর্ম্মা, চরক ও সুশ্রুত ৫৫০ হইতে ৬০০

৫৫। আধুনিক হিন্দু জ্যোতিষ কর্ত্তা আর্য্য ভট্ট ” ৪৭৬ ” ৫৩০

৫৬। বরাহমিহির ” ৫০০ ” ৫৫০

৫৭। ব্রহ্মগুপ্ত ” ৫৯৮ ” ৬৫০

৫৮। আর্য্যাবর্ত্ত সম্রাট দ্বিতীয় শীলাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) ” ৬১০ ” ৬৫০

৫৯। দণ্ডী „ ৫৭০ „ ৬২০

৬০। বাণভট্ট, সুবন্ধু, ভর্ত্তৃহরি ও ভট্টিকাব্য „ ৬১০ „ ৬৫০

৬১। হোয়েন সাঙ কর্ত্তৃক শীলাদিত্যের সভাদর্শন, খ্রীষ্টাব্দ ৬৪০।

৬২। আর্য্যাবর্ত্তের নরপতি যশোবর্ম্মা, ভবভূতি „ ৭০০ হইতে ৭৩০ পর্য্যন্ত

৬৩। পশ্চিম ভারতের বল্লভী রাজগণ ৪৭০ হইতে ৭২০ পর্য্যন্ত।

৬৪। প্রাচীন রাজবংশের অধোগতি ও রাজপুতের প্রাদুর্ভাব „ ৭৫০ হইতে ৯৫০ „।

৬৫। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব „ ৭৮৮ হইতে ৮৫০ „

৬৬। বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন „ ৭৫০ „ ৯৫০

৬৭। আর্য্যাবর্ত্তে রাজপুতের আধিপত্য ও পৌরাণিক হিন্দুয়ানি সংস্থাপন „ ৯৫০ হইতে ১২০০

৬৮। দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজবংশ „ ৫০০ „ ১২০০

৬৯। বাঙ্গালার পালরাজবংশ „ ৮৫০ „ ১১৫০

৭০। বাঙ্গালার সেনরাজবংশ ১০০০ „ ১২০৪

৭১। উৎকলে কেশরী বংশ „ ৪৭৬ „ ১১৩২

৭২। উৎকলে গাঙ্গ্যবংশ „ ১১৩২ „ ১৫৩৪

৭৩। কর্ণাটে বল্লাল বংশ „ ১১শ শতাব্দীতে

৭৪। ওরাঙ্গলে কাকতি বংশ „ ১২০০ হইতে ১৩২৩

৭৫। বিজয়নগর রাজবংশ „ ১৩৭৪ „ ১৫৬৫

৭৬। ভাস্করাচার্য্য „ দ্বাদশ শতাব্দীতে।

৭৬। জয়দেব, শ্রীহর্ষ, মাঘ „ দ্বাদশ শতাব্দীতে

৭৮। সায়নাচার্য্য „ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে।

৭৯। মুসলমানদিগের দাক্ষিণাত্য বিজয় „ ১২৯৪ হইতে ১৫৬৫

৮০। মুসলমানদিগের কাশ্মীর বিজয় „ ১৫৮৬

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হিন্দু আর্য্যদিগের-প্রাচীন-ইতিহাস নামক ইংরাজি পুস্তক, বিলাত প্রত্যাগত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় অনুবাদ করিতেছেন এবং তাহা শ্রীযুক্ত দত্ত মহোদয় সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিতেছেন। এই দুই মহাত্মা নব্যভারতের জন্য যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। বিধাতা ইঁহাদিগের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল করুন। ন, স।

সম্মতির বয়স ও স্বদেশীয়দিগের নিকট নিবেদন। *

এতদ্দেশীয় বালিকাদিগের সম্মতির বয়স সম্বন্ধে আমরা পুনঃ পুনঃ যাহা বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে অনেকগুলি যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ও বিজ্ঞ লোক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, যাহা আছে, তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? হরি মাইতির ন্যায় ঘটনা সর্ব্বদা হয় না, এটী ব্যতিক্রান্ত উদাহরণ মাত্র। পক্ষান্তরে অল্প বয়সে কন্যা পারস্থ করিলে অনেক সুবিধা আছে। দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকিলে ধর্ম্মনীতির হানি হইতে পারে। এইটীই এই সকল লোকে প্রধান তর্ক-স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলেন, ব্যবস্থাপকসভায় আমাদিগের যথার্থ প্রতিনিধি নাই। সকল বিষয়ের ঠিক তর্ক হওয়া সম্ভব নহে। আর একবার গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের সামাজিক বিষয়ের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তাহার সীমা কোথায় থাকিবে? শেষোক্ত তর্কটী কেহ কেহ সবিশেষ গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করেন।

আমরা স্বদেশীয়দিগকে প্রশান্তচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। দুই শত বৎসর হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বারম্বার স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবেন। তাঁহারা এই অঙ্গীকার পালন করেন নাই, কোন্ ব্যক্তি ইহা বলিবেন? এক জন লোক সম্প্রতি বলিয়াছেন, আমাদিগকে চিরকাল একটী নিকৃষ্ট জাতি রাখা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখন আমাদিগের সভ্যতা ও উন্নতির সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন না। বিদেশীয় লেখকেরা বলেন যে, এ দেশে বিদ্যার উৎসাহ দিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের পতনের উপায় করিতেছেন। তথাপি ইংরাজজাতির মহত্ত্ব ও সম্মানের বিষয়, সাধারণতো ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এই বিপদে পড়িতে প্রস্তুত আছেন। তথাপি তাঁহারা একটা ভীরু অসভ্য ক্রীতদাস জাতিকে শাসন করিবেন না। গবর্ণমেণ্টকে লইয়া যতদূর কথা, তাহাতে তাঁহাদিগের সাধুতার উপর সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের চেষ্টায় বিধবা বিবাহের আইন হইয়াছে। বস্তুতঃ সমাজ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যখন যাহা করিয়াছেন, দেশের প্রধান প্রধান লোকের সম্মতি লইয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তবে একটী বিষয় আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে, লর্ড ওয়েলেস্লিই এই প্রকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির ব্যাখ্যা করি-

---

* অন্যান্য প্রবন্ধ রাখিয়া সহচরের এই সুন্দর প্রবন্ধটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম। এরূপ একজন প্রাচীন, বিজ্ঞ, চিন্তাশীল সম্পাদকের কথা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, আশা করি। সহচর হিন্দুসমাজের মুখপাত্র। আমাদের কথা অপেক্ষা ইঁহার কথার অধিক আদর হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ন, স

যাছিলেনঃ—"গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার উত্তরাধিকারের নিয়ম রক্ষা করিবেন। কিন্তু যেস্থলে এই ব্যবহার ও নিয়ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম মানব জাতির উপকার এবং কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী হইবে, তথায় গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনভাবে কাজ করিবেন।' এক্ষণে কোন্ স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান ফেলিতে সম্মত হন? কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন এইরূপ হৃদয়বিদারক কার্য্য করিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না। সহমরণ সম্বন্ধেও এই ভাব ছিল। কিন্তু এখন? সেদিন পর্য্যন্ত বাণফোড়া চলিয়াছে। কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে যে সকল লোক বাঙ্গ হইয়াছেন, তাঁহারা পিঠ, জীব প্রভৃতি ফোড়ার বর্ণনা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন। অথচ আমরা বাল্যকালে চড়কিদিগের এই সকল অস্বাভাবিক কার্য্য দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম। এই সকল প্রথা স্বাভাবিক ধর্ম্মের,—যে ধর্ম্ম সমস্ত জগতে প্রচলিত আছে, তাহার বিপরীত। কিন্তু আমরা জানি, যখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক সহমরণ উঠাইবার উদ্যোগ করেন, তখনও ধর্ম্মের নামে বিস্তর আপত্তি হইয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করেন। এক্ষণে লোকে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্কের কার্য্যকালে যে আশঙ্কা হয়, তাহা কি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে? বরং ইহা কি সত্য নহে যে, শাসন কর্তৃপক্ষ নিতান্ত বিপাকে না পড়িলে আমাদিগের সমাজ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন না? তাঁহারা স্বদেশে যাহা করেন, ভারতবর্ষে তাহা করিতে চাহেন না। গবর্ণমেণ্ট চক্রান্ত করিয়া আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন, অথবা সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবেন, এই আশঙ্কা যাঁহারা করেন, তাঁহারা ইতিহাসকে মান্য করেন না।

এক্ষণে কি হইতেছে? তোমরা ধর্ম্মের সহিত দেশের রাজনীতিক উন্নতি দেখিতে চাহ কিনা? রাজনীতিক উন্নতি কেবল শিক্ষার উপরে নির্ভর করেনা। যে দেশে অসীম সভ্যতা, জ্ঞান ও বিদ্যার বিমল জ্যোতি বিদ্যমান, সেদেশ বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে কি নিরাপদে থাকিতে পারে? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর। অপেক্ষাকৃত অসভ্য রোমানেরা সাতিশয় সভ্য গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আবার রোমানেরা প্রাচীনতম কালে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেও গথ, ও হুনদিগের নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন। তৎপরে ইদানীন্তনকালে আইস। তুরস্কদিগের দ্বারা রোমানদিগের পূর্ব্ব সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের দেশ প্রথমতঃ সুলতান মামুদ, তৎপরে পাঠান মোগল প্রভৃতির রণক্ষেত্রে কতবার পরাজিত হইয়াছে। তৈমুর অসভ্য তাতার ছিলেন, কিন্তু তোমর সভ্য ভারতবর্ষীয়গণ কি করিতে পারিয়াছিলেন? এমন কি, কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটে জ্ঞানবাপী বলিয়া একটী পচা বিল্বপত্রপুষ্পপরিপূর্ণ স্থান আছে। প্রবাদ এই যে, কালাপাহাড়ের ভয়ে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর,—সংহারকর্ত্তা—জ্ঞানবাপীতে পলাইয়া ছিলেন। এতদূর আমাদিগের জাতীয় অধোগতি হইয়াছে। ইহার কারণ কি? অবশ্যই অনেক কারণ আছে; কিন্তু প্রধান

কারণ এই যে,যে জাতি আমাদিগের দেশকে উৎসন্ন দিয়া আমাদিগেকে অধীনতা শৃঙ্খলে রাখিয়া আসিতেছেন, শারীরিক বলে তাঁহারা সাধারণতঃ আমাদিগের অপেক্ষা প্রধান। ইতিহাস বলেন, —চিকিৎসকেরা অনুকূল সাক্ষ্য দিতেছেন, প্রাচীন হিন্দু স্ত্রীলোকেরা যথার্থ যৌবন প্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না। প্রথম মুসলমান আক্রমণ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচার প্রবল হইলে অল্পবয়সে স্ত্রীলোকদিগকে পাত্রস্থ করিয়া এক জন রক্ষাকর্ত্তার অধীনস্ত করিবার প্রথা স্থাপিত হয়। সেই প্রথা এখনও চলিয়া আসিতেছে। যে পুরাণ ও অন্য অন্য গ্রন্থের এত দোহাই দেওয়া হয়, সেই পুরাণকে মধ্যস্থ মান। জানিবে, আমরা যাহা বলিতেছি, আর্য্য পিতামহগণ তাহাই করিতেন। তোমরা সেই যথার্থ হিন্দু আর্য্য পিতামহগণের অনুকরণ করিবে, না গোলামের ন্যায় কতকগুলি ইদানীন্তনকালের স্বার্থপর পুরোহিতের কথা শুনিয়া কাজ করিবে? আমরা যাহা বলিতেছি, যদি কেহ তাহা প্রাচীনকালের আর্য্য পিতামহগণের অনুমোদিত নহে বলিয়া সাব্যস্ত করেন, আমরা তৎক্ষণাৎ ভ্রম স্বীকার করিয়া আত্মমতের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইব।

বিবি ফিপসন বহুকাল এদেশে চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি এক জন স্ত্রীলোক। তিনি যেমত স্বজাতীয়দিগকে চিনিবেন, কোন পুরুষ তাহা পারিবেন না। সম্প্রতি এই চিকিৎসায়ত্রী বোম্বাইয়ে কি বলিয়াছেন? তিনি বলেন যে পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহার সংস্কার হয় যে, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বে পুষ্পবতী হন। কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, পঞ্চদশবর্ষীয়া ভারতবর্ষীয়া বালিকা একাদশবর্ষীয়া ইংরাজ বালিকার ন্যায় অপ্রস্ফুটিত। ডাক্তার চার্লস ধাত্রিবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিযাছিলেন যে, যৌবন সম্বন্ধে শীতপ্রধান দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় বালিকাদিগের মধ্যে প্রভেদ নাই। বিবি ফিপসন বলেন, কেবল ঋতুমতী হইলে যৌবন কাল হয় না। যতদিন শরীরের শেষবৃদ্ধি না হয়, ততদিন সে স্ত্রীলোককে যুবতী বলা ভ্রম। কিন্তু আমাদিগের দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোক সামান্য ঋতুর পূর্ব্বেই স্বামীগৃহে যান, একথা কি অপ্রকৃত? অকালে স্বামীসহবাস নিবন্ধন অকালে অপক্ক সন্তান জন্মে। শরীরের বৃদ্ধির সময় সন্তান জননী হওয়ায় ইহাদের শরীর দুর্ব্বল হয়। অল্পকাল মধ্যে প্রসবের ক্ষমতা লোপ পাইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদের এই কথা। এক জন ভূয়োদর্শী স্ত্রীচিকিৎসক এইরূপে আমাদিগকে বলিয়াছেন, "যদি কোন কারণে কখন ইংরাজ রাজত্ব যায়, তবে নিশ্চয় জানিবে তোমাদিগের অপেক্ষা বলবান আর এক জাতি আসিয়া তোমাদিগের উপরে প্রভুত্ব করিবে।" যাহাতে আমাদিগের শরীর বলবান হয়, এই চেষ্টা কি দুশ্চেষ্টা? যদি গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজজাতির দুরভিসন্ধি থাকিত, তাহা হইলে ত আমাদিগকে দুর্ব্বল রাখা তাঁহাদিগের স্বার্থ হইত। অতএব স্বদেশীয়গণ! কুসংস্কার ও কাল্পনিক ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আপমাদিগের যথার্থ স্বার্থ হারাইও না। কার্য্যতঃ এক্ষণে ব্রাহ্মণ কায়স্থের কন্যাগণের ১২। ১৩। ১৪ বৎসরে বিবাহ হইতেছে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর

লোকেরা ৫।৬।৭ বৎসরের অধিক ঘরে অবিবাহিত কন্যা রাখেনা। এই সকল লোকের প্রতি কটাক্ষ করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? হিন্দু ধর্ম্মের যথেষ্ট স্থিতি স্থাপকতা গুণ আছে। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা নির্ব্বোধ লোক ছিলেন না। যদি প্রাচীন কালের স্ত্রীলোকেরা অষ্টাদশ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিতেন, এখনও তাহা হইবে না কেন? এক্ষণে সতীত্বের কি এত কম মূল্য হইয়াছে? তাহা নহে। অকালে বালিকাদিগকে "কিলাইয়া কাঁঠাল" পাকান হয় বলিয়া এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের আস্বাদ পাইতেছেন। অতএব সাহস ও অধ্যবসায় অবলম্বন কর। পিতৃভূমির মঙ্গলের চেষ্টা পাও। যাহাতে আমাদিগের দেহ বলিষ্ঠ হয়, তাহার উপায় করিতে হেলা করিও না। "বীরপ্রসবিনী হও" বলিয়া পূর্ব্বতন ঋষিগণ স্ত্রীলোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। চেষ্টা কর, সেইকাল আবার আসিবে। আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র,—যথার্থ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কর—আপনার বিবেচনা কর,—দেখিবে বিবি থিপসন প্রভৃতি তোমাদিগের যথার্থ মঙ্গল কামনা করিয়া পরামর্শ দিতেছেন। আমাদিগের সনাতন ধর্ম্ম আর্য্য পিতামহদিগের ধর্ম্ম কোন প্রকার উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে না। পরীক্ষা কর, পরের কথে ঝাঁপ খাইও না।

সহচর।

ভারতীয় মুদ্রা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমি যত প্রকার ধাতু মুদ্রা দেখিয়াছি, তাহাদের সকলাপেক্ষা ইংরাজের মুদ্রা দেখিতে অতি সুন্দর এবং পরিষ্কার। ভারতবর্ষীয় ইংরাজ মুদ্রার ধাতু বিশুদ্ধ নহে বটে, কিন্তু গঠন এবং আকৃতিতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইংরাজের পয়সা, টাকা বা মোহর গলাইলে অনেক "খাদ" পাওয়া যায়, অন্যান্য মুদ্রার সেরূপ নাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পয়সা, টাকা, আধুলি, শিকি, মোহর ইত্যাদি যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি কারুকুশলতায় পরিপূর্ণ। ইংরাজের নজর অর্থাৎ দৃষ্টি বোধ হয় বাহিরের চাকচিক্যতার বিশেষ পক্ষপাতী। যাহা হউক, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবতারণায় যে সকল মুদ্রার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের অবশিষ্ট কতক গুলির বিবরণ বর্ত্তমান প্রস্তাবে সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে। যত গুলি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাদের সকলের সমগ্র বিবরণ এখনও অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই, এই জন্য অনেক গুলি ধাতবীয় মুদ্রার আদৌ উল্লেখ করা যাইবে না।

অবকাশ ও সুবিধা মত সময়ান্তরে অন্য প্রস্তাবে (যদি পারি) অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিব।

টানা দামড়ী—টানা নগরী বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর ডিসটি্ক্ট রূপে পরিণত হইয়াছে। বোম্বাই সহরের কলের জল টানার নিকটবর্ত্তী টানসা কারখানা হইতে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। বহু বৎসর ব্যাপিয়া পর্টুগীজেরা টানা নগরীতে রাজত্ব করিয়াছিল। ইংরাজের বর্ত্তমান জেল খানা, পূর্ব্বে পর্টুগীজের সুদৃঢ় দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইত; সারসেট্ দ্বীপের এই স্থানেই সূত্র পাত। পর্টুগীজ শাসন সময়ে টানার হিন্দু রাজা অতি ক্ষুদ্রাকার তাম্র মুদ্রা প্রচলন করেন, ঐ মুদ্রার নাম টানা দামড়ী, ইহা এখন অপ্রচলিত অবস্থায় পতিত। ইংরাজের অর্দ্ধ পয়সা প্রায় ইহার অনুরূপ। এই পয়সার একদিকে মহারাষ্ট্র ভাষায় "টানা দামুড়ী" এবং সম্বৎ লিখিত আছে, অন্যদিকে পর্টুগীজের খ্রীষ্টাব্দ এবং Portugeza do Tanaso অক্ষর কয়েকটি দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, এই মুদ্রার বহুসংখ্যক এখন গোয়া নগরীর দুর্গে রক্ষিত হইতেছে। যে রাজার সময়ে এই মুদ্রার প্রচলন হয়, তাহার নাম চূড়ামণি রাও, ইঁহারই প্রসিদ্ধ আত্মীয় (সদ্দার মুরারী রাও) মাদ্রাজ প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত অনন্তপুর জিলার অধীন গুত্তী পাহাড়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

বুর্হানপুর।—মধ্য ভারতের অন্তঃপাতী গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনীন্সুলার রেলওয়ে লাইন মধ্যে বুর্হানপুর অতীব প্রাচীন, প্রশস্ত ও প্রধান নগর। খান্দেশের তুর্ক বীর নশীর খাঁ ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন; ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে আকবর ইহা স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া লয়েন; তদনন্তর ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নিজামের হস্তগত হয়। কাল-প্রভাবে মহারাষ্ট্র পুরুষগণ প্রবল হইয়া মুসলমানের হস্ত হইতে এই প্রাচীন নগরীকে উদ্ধার করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বুর্হানপুর ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। তুর্কী, মোগল, পাঠান, আফগান, মহারাষ্ট্র, পিণ্ডারী, রোহিলা, আরবী, ফরাশী, ইংরাজ, প্রভৃতি কেহই এখানে রাজত্ব বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই। অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজের ভারতাগমনের পূর্ব্বে এদেশে জলের কল ছিলনা। মুসলমান-দিগের সময়ে বুর্হানপুরে যে অত্যাশ্চর্য্য, বর্ণনীয় এবং কৌতুককর জলের কল ছিল, তাহা এখনও সুন্দর রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে মেরামত করাইয়া ব্যবহার করিতেছেন। বুর্হানপুর তাপ্তী নদীর উপরে অবস্থিত। এই নদীর উপরে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন দুর্গ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক মুসলমান নবাব (পুরের্ খাঁ) এখানে বাস করিতেন। অনেকে বলেন, পুরের্ খাঁ জাহাঙ্গির বাদসাহের উপপত্নী-পুত্র। যাহাই হউক, পুরের খাঁর সমসাময়িক তাম্র মুদ্রা এখনও পাওয়া যায়। ইহা জয়পুরের পয়সার প্রায় অনুরূপ। তিনভাগ তাম্র এবং একভাগ রৌপ্যে ইহা নির্ম্মিত। পয়সার এক দিকে এক মস্‌জিদের অর্দ্ধ প্রতিকৃতি এবং অপর দিকে নবাবের নাম। প্রথম জেম্‌সের রাজত্ব কালে, সার টমাস রো নামক ইংলণ্ডীয় দূত সর্ব্ব প্রথমে বুর্হানপুরে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন,

জাহাঙ্গীর সে সময়ে এখানে ছিলেন। ইতিহাসে লিখিত আছে, জাহাঙ্গীর বাদসাহ ১০১ টি সুবর্ণ মুদ্রা এবং ১০১ টি বুর্হানপুরীয় তাম্র মুদ্রা রো সাহেবকে উপহার দেন। আমার নিকট যে পয়সাটি আছে, তাহার নিম্ন ভাগের অক্ষর পড়া যায় না, সুতরাং 'সন' সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে পারি নাই।

গদাধরী পয়সা—বোম্বাই হইতে এই স্থান প্রায় ২৭০ ক্রোশ। গদাধর নগর জি, আই, পি, রেলওয়ের একটি প্রধান ষ্টেসন। বাণিজ্যের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। জব্বলপুরের ইহা নিকটবর্ত্তী। ইংরাজীতে ইহাকে Gidarwara কহা গিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত নাম গদাধর নগর। ফরাসী বীর ডিউপ্লের সময়ে বৈশ্য জাতীয় (বণিক) গদাধর হঠাৎ প্রবল হইয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ঐ নগরের পূর্ব্বতন নামের পরিবর্ত্তে আপনার নামানুসারে ইহাকে গদাধর নগর বলিয়া প্রচার করেন। এই প্রদেশের পূর্ব্বনাম কৌয়াপুর ছিল। গদাধর এক প্রকার পয়সার প্রচলন করেন। গদাধরের রাজত্ব কাল মোটে ২২ বৎসর, সুতরাং কেবল ২২ বর্ষের জন্য ঐ পয়সা চলিয়াছিল। এই পয়সা গোলাকার এবং রাজপুতানার অন্তর্গত ভীলোয়াড়া প্রদেশের পয়সার মত দেখিতে কদাকার এবং ওজনে খুব ভারি। এক একটা পয়সা প্রায় সার্দ্ধ দুই তোলা। আমি নিজে পারস্য ও উর্দ্দু জানি, কিন্তু এই পয়সার খোদিত অক্ষর এত জঘন্য যে, ইহার এক বর্ণও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। গদাধরী পয়সা এখনও স্থানে স্থানে চলে।

ভোঁসলা পয়সা—বেরারের রাজধানী অমরাবতী। ইহা অতীব প্রাচীনা নগরী। তন্ত্র শাস্ত্রে এই নগরীর উল্লেখ আছে। ইলিচপুর এবং চিকলদহ পর্ব্বতের মধ্যদেশে এই নগরী অবস্থিতা। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ। ইংরাজ শাসনের অথবা ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ইহা হিন্দুরাজাদের অধীন ছিল। ভোসলা রাজাগণ ইহা শাসন করিতেন। পিণ্ডারীদিগের আক্রমণ হইতে নগরীকে রক্ষা করিবার জন্য রাজাগণ ৪ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া সহরের চতুর্দ্দিকে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছেন, ঐ প্রচীর এখনও সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হুনাদাজীর দাদোবা ভোঁসলা নামক রাজা আপনার রাজত্ব কালে এক প্রকার পয়সার প্রচলন করেন। এই পয়সা অষ্টকোণ। ধাতু বিশুদ্ধ তাম্র। অনেক দিনের নির্ম্মিত পয়সা, অনেক মলিনতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য এখনও দেদীপ্যমান। ইহার একদিকে রাজার নাম এবং গাভী মূর্ত্তি, অপর দিকে মহাদেবের মন্দিরের প্রতিকৃতি, একটি ত্রিশূল এবং শকাব্দা।

মুলুক বাহাদুরী।—হায়দ্রাবাদ রাজ্যে গুলবর্গা বা কুলবর্গা এক প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা অতীব প্রাচীন নগর। নিজাম ষ্টেট রেলওয়ের ইহা এক বিখ্যাত ষ্টেশন। বাণিজ্য, ব্যবসা, অট্টালিকা, ধন, ধান্য, সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে গুলবর্গা নগরী বিশেষ শোভাময়ী। পূর্ব্বে ইহাই হায়দ্রাবাদ রাজ্যের রাজধানী ছিল। জন সংখ্যা ৪০ সহস্র। পূর্ব্বতন নিজামের যখন ইহা রাজধানী ছিল, তখন এই স্থানে নিজাম বাহাদুর

চতুষ্কোণীর এক প্রকার তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। ইহার অক্ষর ছাঁচ ঢালা নহে, খোদাই করা। নিজাম সম্রাটেরা নিজাম-উল্-মুল্ক এই উপাধিতে খ্যাত, এই জন্য এই পয়সাকে গুলবর্গা মুলুক বাহাদুরী পয়সা বলে। বর্ত্তমান সময়ের হায়দ্রাবাদী পয়সা এইরূপ নহে, কিন্তু গুলবর্গার পয়সা এখনও চলে। ইহার ওজন ইংরাজী এক পয়সা হইতে কিঞ্চিৎ কম, ধাতু তাম্র। "রুস্তম খাঁ-নিজাম্-উল্-মুলুক্-বাহাদুর-সাঁহান্ সাঁ" এই কথাগুলি পারস্য অক্ষরে খোদিত আছে। অপর দিকের অক্ষর পড়িতে পারা যায় না। এই প্রকারের পয়সা এখন নির্ম্মিত হয় না। প্রাচীন পয়সার সংখ্যা খুব কম।

রোয়াশী পালম্।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ইণ্ডিয়ান্ মিড্‌লাণ্ড রেলওয়ের মধ্যে, বান্দা জিলার অন্তঃপাতী, যমুনা ও পৈশানী নদীদ্বয়ের তটদেশে কাকই নগর বিশেষ স্বাস্থ্যকর এবং নানা কারণে প্রসিদ্ধ। ১৮৫৭ অব্দের ঘোরতর সিপাহী বিদ্রোহ কালে কাকইয়ের রাজা বিদ্রোহী বলিয়া বন্দী হয়েন এবং তাঁহার বহু মূল্যবান প্রাচীন হীরা মাণিক্যাদি কলিকাতার হামিণ্টন কোম্পানী বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের কোষাগার পূর্ণ করেন। এখন যে প্রকাণ্ড প্রস্তর অট্টালিকায় গবর্ণমেণ্টের ট্রেজরী এবং কালেক্টরী কাছারী হইতেছে, পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের ইহা দুর্গ এবং প্রাসাদ ছিল। রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে অধিবাসীরা পলায়ন করিয়া রেওয়া রাজ্যে গমন করেন। বর্ত্তমান সময়ে সাত সহস্র লোক এখানে বাস করে। হিন্দু রাজত্ব কালে এক জন মুসলমান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি দয়ালু, ধর্ম্মভীরু, স্বদেশ-হিতৈষী, সুপণ্ডিত এবং মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। ইংরাজ রাজপুরুষ ইঁহাকে বিদ্রোহের মূল বিবেচনা করিয়া প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। ঐ মন্ত্রী "নবাব" আখ্যায় অভিহিত হইতেন। রাজাগণ "রোয়াশ্" উপাধিতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এই জন্য কাকই নগরের প্রাচীন পয়সা "রোয়াশী পয়সা বলিয়া বিখ্যাত। এই পয়সা গোলাকার, ওজনে এক তোলা, ধাতু তাম্র। উর্দ্দু ভাষায় "পালম্" শব্দে "তোলা" বুঝায়। পয়সার এক দিকে রোয়াশ্ ও নবাব অর্থাৎ "রোয়াশ্-ই নেওয়াব্" এই কথাগুলি উর্দ্দু অক্ষরে লিখিত, অন্য দিকে উর্দ্দ অক্ষরে "কিল্লা-ই বাবা-কাকই। সাল ১২০৩" এই কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকূট তীর্থ কাকই নগর হইতে তিন ক্রোশ মাত্র, এই তীর্থ সাবিত্রী নদীর উপরে স্থিত। ক্রমাগত পর্ব্বতের মধ্য দিয়া ঐ তীর্থে যাইতে হয়। চিত্রকূট তীর্থে রোয়াশী পয়সা অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

ময়ূরভঞ্জ।

উড়িষ্যার ১৯ উনবিংশতি গড়জাত বা করদ রাজ্য মধ্যে ময়ূরভঞ্জ আয়তনে, লোক সংখ্যায় এবং রাজস্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৪৩৫২ বর্গ মাইল।* লোক সংখ্যা প্রায় চারিলক্ষ, এবং রাজস্ব পাঁচ লক্ষ টাকা।

ইহার উত্তর সীমা ধলভূম ও সিংভূম, দক্ষিণ সীমা বালেশ্বর জিলা ও নীলগিরি নামক করদ রাজ্য। পূর্ব্বসীমা মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জিলা। এবং পশ্চিম সীমা কেন্দুঝর নামক করদ রাজ্য।

অপরাপর গড়জাত রাজ্যের ন্যায় ময়ূরভঞ্জও পর্ব্বতময়; এবং ভূমিজ, বাথুরি, সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি আদিম জাতির আবাস।

ময়ূরভঞ্জ সম্প্রতি চারিভাগে বিভক্ত; সদর বারিপদা, পাঁচপীড়, বাওনঘাটী; এই তিন মহকুমার মধ্যস্থিত সুবিস্তৃত মালভূমি, শিমলী পাল।

কথিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই রাজ্যে ময়ূরধ্বজ উপাধিধারী এক আদিম জাতীয় রাজার অধিকার ছিল। ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান ভঞ্জ বংশ ইহাতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজবংশের জয়সিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয়, আদিসিংহ ও জ্যোতিসিংহ নামক স্বীয় তনয়দ্বয় সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দেবের দর্শন উপলক্ষে পুরীধামে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যার সেই সময়ের রাজা জয়সিংহকে সদ্বংশজাত জানিয়া আপন তনয়ার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ আদিসিংহের পরিণয় সম্পাদন করিলেন। এই বিবাহের পর, জয়সিংহ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূ সহ বাটী যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, ময়ূরধ্বজ রাজার উৎপীড়নে প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সুবিধা পাইয়া সুক্ষত্রিয় জয়সিংহ নানা উপায়ে আদিম জাতীয় প্রজাগণের প্রীতি লাভ করিলেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যে ময়ূরধ্বজকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া এই রাজ্যে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া বাওনঘাটী নামক স্থানে গড় নির্ম্মাণ করিলেন। ময়ূরভঞ্জের অপরাপর অংশ জমিদারগণের অধিকারে রহিয়া গেল।

জয়সিংহ বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। পিতার মৃত্যুর পর আদিসিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্ববাহুবলে কেন্দুঝর পর্য্যন্ত অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন, এবং আধুনিক পাঁচপীড় মহকুমার অন্তর্গত আদিপুর নামক স্থানে স্বনামে একটী পল্লী স্থাপন পূর্ব্বক গড় নির্ম্মাণ করিয়া নিজে ময়ূরভঞ্জ শাসন করিতে লাগিলেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কেন্দুঝরের অধিপতি করিলেন। তদবধি কেন্দুঝরের রাজা অপুত্রক হইলে ময়ূরভঞ্জবংশীয় কোন ব্যক্তি এবং ময়ূরভঞ্জের রাজা অপুত্রক হইলে কেন্দুঝরের রাজার কোন সন্তান রাজ্য প্রাপ্ত হইবার প্রথা চলিয়া আসিয়াছিল। ইংরাজ বাহাদুর ১৮৬২ সালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করাতে কেন্দুঝর বিদ্রোহী

* প্রায় ময়মনসিংহ জিলার সমান।

হইয়াছিল। জ্যোতিঃসিংহের নাম অনুসারে তদ্‌নির্ম্মিত গড় জ্যোতিঃপুর নামে বিখ্যাত। আদিপুর ও জ্যোতিপুর সিংহবংশের কুলদেবতা কীচকেশ্বরীর * মন্দির আছে এবং তথায় নানা প্রকার খোদিত প্রস্তর দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রস্তরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্পর্ক আছে কি না, জানি না।

আদিসিংহ আপন বাহুবলে সমস্ত জমিদারদিগকে একে একে পরাস্ত করিয়া ময়ূরধ্বজের অধিকৃত সমস্ত রাজ্য করতলস্থ করিলেন। এই রূপে ময়ূরধ্বজের দর্প ভঞ্জন করিয়া নিজ "সিংহ" পরিবর্ত্তে "ভঞ্জ" উপাধি গ্রহণ করিলেন, অধিকৃত রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ নাম প্রদান করিলেন এবং ময়ূরধ্বজের "ময়ূরচিহ্ন" স্বীয় রাজচিহ্ন বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপ জনপ্রবাদ ময়ূরভঞ্জে প্রচলিত আছে।

আদিভঞ্জ রাজকার্য্য শাসন সুবিধার জন্য ময়ূরভঞ্জকে ২২ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন করিয়া সরবরাকার নিযুক্ত করিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে, রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরবরাকারী পদ পাইয়া পুরস্কৃত হইলেন। ইহারা রাজাকে প্রতি বর্ষে "পেসকস" নামে কর প্রদান করিয়া স্ব স্ব সরবরাকারী মধ্যে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। যখন যে সরবরাকার অবাধ্য বা বিরোধী হইল, তাহার বিভাগ খাস হইয়া শাসিত হইতে লাগিল। এই রূপে ২১ বিভাগ খাসে আসিয়াছে কপ্তিপদা (১) সরবরাকারের দখলে আছে। সজনাগড় বা নীলগিরি বিদ্রোহী হইয়া স্বতন্ত্র গড়জাত বলিয়া গণ্য হইয়াছে; খিচিং, হলদিপুকুর ও কোলহান সিংভূম জিলার অন্তর্গত হইয়াছে। আদিপুর, মসীপুর, করঞ্জিয়া, রতনপুর ও ঠাকুরমুণ্ডা এই পাঁচ বিভাগ বা পীড় "পাঁচপীড়" নামক মহকুমার অন্তর্গত হইয়াছে। বাওনঘাটী ও শিমলীপাল দুই স্বতন্ত্র মহকুমা। উপরভাগ, বনহাটি, বগনিয়া, হরিপুর, ওলমরা প্রভৃতি দশটী পরগণা লইয়া সদর বারিপদা মহকুমা গঠিত হইয়াছে।

আদিভঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাজ্যে ৪১ জন ভঞ্জ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না।

রাজধানী বারিপদায় প্রস্তরময় এক জগন্নাথ মন্দির আছে। পুরীর মন্দির ভিন্ন ঈদৃশ জগন্নাথ মন্দির উড়িষ্যায় আর নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ ষোড়শ শতাব্দীতে বারিপদায় রাজধানী স্থাপন ও এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যখন মহারাষ্ট্রদিগের হস্ত হইতে ইংরেজ বাহাদুর উড়িষ্যা অধিকার করেন, তখন সুমিত্রা দেবীভঞ্জ ময়ূরভঞ্জে প্রভুত্ব করিতেছিলেন। ১৮১০ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সপত্নী যমুনা দেবীভঞ্জ তিন বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করাতে ভঞ্জবংশের নিয়মানুসারে কেন্দুঝর রাজবংশের ত্রিবিক্রমভঞ্জ ময়ূরভঞ্জে রাজপদ প্রাপ্ত হয়েন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্রোহী হওয়ায় নীলগিরি, কোহ্লান, হলদিপুখুর ও খিচিং, এই চারিটী বিভাগ এখন ময়ূরভঞ্জের অধীন

---

* স্থানীয় ভাষায় কিচকেশ্বরী বলে।

(১) কপ্তিপদার জমিদার ২৭০৲ মাত্র পেসকুস দেন, কিন্তু তাঁহার আয় ৩০০০৲ হইবে।

নহে। মহারাজা যদুনাথ ভঞ্জ রাজস্ব খাসে আদায় করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তজ্জন্য বেতনভোগী সর্দ্দার নিযুক্ত করেন। ৫০ বৎসর এই নিয়মে কার্য্য চলিতেছে। যদুনাথ অতি প্রতাপশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

রাজা শ্রীনাথভঞ্জের কুশাসন সময়ে বাওনঘাটী ও উপরভাগ বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজ শাসনে আসিয়াছিল। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ রাজত্ব পাইয়া সুশাসন স্থাপন করিলে তাঁহাকে তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। ১৮৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদবধি ময়ূরভঞ্জ ইংরেজ শাসনাধীন হইয়াছে। নাবালগ রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ সুশিক্ষিত ও সুচতুর, ইংরেজী ও সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন। ১৮৯১ সালে রাজত্ব পাইবেন।*

ময়ূরভঞ্জের প্রজার অবস্থা অতি উত্তম। বাস্তু ভূমি ও ররিশস্য জন্মে। এইরূপ ভূমির জন্য কর অতি সামান্য, নাই বলিলেও হয়। শারদ ধান্য জমির করও বেশী নয়। তসর, লাক্ষা প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। গাড়ী শকট চলিবার পাকা রাস্তার অভাব নাই। রাস্তার ধারে ধারে ৭।৮ ক্রোশ অন্তর পথিকদের রাত্রি বিশ্রাম করিবার ঘরও আছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য চিত্ত মুগ্ধকর। একটী এণ্ট্রান্স স্কুল, ২টী মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয় এবং প্রায় ৫০টী প্রাইমারী বিদ্যালয় ও পাঠশালা রাজার ব্যয়ে চলিতেছে।

ময়ূরভঞ্জ, ভূমিজ, ভূইয়া, বাথুরি, পুরাণ প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা উপবীত ধারণ করে, এবং চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শ্রীকৃষ্ণের যে নন্দবংশে জন্ম, তদ্বংশীয় অনেক গোপ ময়ূরভঞ্জে আছে। তাঁহারা কিন্তু উপবীত ধারণ করেন না।

ময়ূরভঞ্জের নদী সমূহে স্বর্ণ এবং পর্ব্বত সমূহে লৌহ পাওয়া যায়। *

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

বল্লাল চরিতম্।

(সমালোচনা)

"যেন্দু যদি আজ ভবত সঙ্গ,
অভিনব কিছু দেখাব রঙ্গ॥"

কবিচূড়ামণি কালিদাস মস্তক হইতে বাগ্দেবীর রূপ বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা ভারতীর বরপুত্রের পবিত্র পদ স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে "টাইটেল" পেজ হইতে এই গ্রন্থের সমালোচনা আরম্ভ করিব। ভরসা করি পাঠকগণ অদ্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ইহার টাইটেল পেজটী এইরূপ;—

* অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাব, তাঁহার দুই তিন শত বৎসর পরে রাজপুতদের অভ্যুদয়। এই গণনানুসারে পঞ্চম শতাব্দী হইতে উৎকলে কেশরী বংশের সঙ্গে সঙ্গে ভঞ্জবংশের উদয়, বিশ্বাস হয় না।

বল্লালচরিতম্—শ্রীযুক্ত গোপালভট্ট বিরচিতম্—শ্রীযুক্তানন্দভট্ট বিরচিত পরিশিষ্ট সহিতম্—শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্যেন অনুদিতম্—প্রেসিডেন্সি কালেজ সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপকেন-শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন সংশোধিতম্—কলিকাতা রাজধান্যাম্ গিরিশ বিদ্যারত্ন-বর্ত্মস্থ চতুর্ব্বিংশ সংখ্যক সদ্মনি—গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য্যেন মুদ্রিতম্ শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন প্রকাশিতঞ্চ ইত্যাদি।"

এক ভট্টমল গ্রন্থ প্রণেতা, দ্বিতীয় ভট্ট পরিশিষ্ট লেখক, তৃতীয় ভট্ট অনুবাদক ও মুদ্রাকর, চতুর্থ ভট্ট সংশোধক ও প্রকাশক। এইরূপ চতুর্ভট্ট যোগ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ভা লাম, এই যোগের ফল না জানি কি একটা ও ভণ্ড কাণ্ড হইবে; প্রকৃত পক্ষেও তাহাই বটে।

"শ্রীযুক্ত" ও শ্রী" দেখিয়া ভাবিলাম, ভট্ট চতুষ্টয় সকলেই জীবিত, কিন্তু ভূমিকা ও গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম "শ্রীযুক্ত" ভট্টগণ বহুদিন হইল নরলোক হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেত-লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "শ্রী" সংযুক্ত ভট্টযুগল অদ্যাপি ভব সংসারে লীলাখেলা করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ সাবধান। তোমাদের গুরু মহাশয়ের অবিধানে "শ্রীযুক্ত" অর্থ—মৃত।

গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন ২৪ নং ভবনের পরিবর্ত্তে এইরূপ সংস্কেরিকেরি ঝাড়িবার প্রয়োজন এই ভট্টযুগ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। টাইটেল পেজ উল্টাইয়া দেখিলাম, সার্টিফিকেট একতাড়া অর্থাৎ আড়াই গণ্ডা, সার্টিফিকেট সকল গুলিই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের প্রদত্ত। তৈলবট দ্বারা এই আড়াই গণ্ডা সার্টিফিকেট হাসীল করা হইয়াছে কিনা, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। কিন্তু কোন কোন মহাত্মা অনুরোধে পড়িয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কেহ বা স্বীয়নাম জাহির করিবার জন্যও সার্টিফিকেট দিয়াছেন। সর্ব্বশেষে সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সার্টিফিকেট দেখিতে পাইলাম। হরিশ্চন্দ্র ও শশীভূষণ ভট্টযুগল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্রযুগল। পুত্রের প্রকাশিত গ্রন্থে পিতার সার্টিফিকেট ভট্টযুগের একটি ফল বলিতে হইবে। এই অদ্ভুত গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভ হইতে একবারে আড়াই গণ্ডা সার্টিফিকেট সহ ভূমিষ্ট হইয়াছেন। সমালোচকের বিচারে এই সকল সার্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপ কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারেনা, অতএব তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর।

তদনন্তর ভূমিকা। "বার হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি।" অক্ষর গণনা করিলে বোধ হয় মূলগ্রন্থ হইতে ভূমিকার অক্ষর সংখ্যান্যূন হইবে না।

ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে, বল্লাল সেনের গুরু গোপাল ভট্ট ১৩০০ শকাব্দে মূল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আর নবদ্বীপাধিপতির আদেশে ১৫০০ শকাব্দে আনন্দ ভট্ট দ্বারা ইহার পরিশিষ্ট রচিত হইয়াছে।

কলিকাতার যুঙ্গী (যুগী) কুলতিলক পদ্মচন্দ্র নাথের পুত্র "বাবু চন্দ্রকুমার নাথ মহাশয়" এই গ্রন্থের সত্বাধিকারী। তিনি কবিরত্ন ভট্টকে এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন। কবিরত্ন ভট্টের অবকাশ না থাকাতে তিনি তাঁহার অনুজভট্টকে ইহার অনুবাদের

ভাবার্পণ করেন। এক সময় ব্রাহ্মণ শূদ্র সংযোগে চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, আর এই ঘোর কলিকালে যুঙ্গীভট্ট মিলনে "বল্লালচরিত" নামক অদ্ভুত গ্রন্থের উৎপত্তি।

আমরা বাল্যকালে দিদিমার নিকট এক-টুকু ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা অবগত আছি যে, ১৩০০ শকাব্দে ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭৮০ হিজরি অব্দে খ্যাতনামা পাঠান নরপতি সামস্ উদ্দিন আবুল মোজাফর ইলিয়স সাহার পুত্র আবুল মোজাহেদ সেকন্দর সাহ বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতে ছিলেন; *সুতরাং ১৩০০ শকাব্দে বল্লালের* গুরু গোপালভট্ট দ্বারা মূলগ্রন্থ রচিত হওয়ার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নবদ্বীপের রাজবংশের ইতিহাসও আমরা একটুকু জ্ঞাত আছি। নবদ্বীপ রাজ-বংশের স্থাপনকর্ত্তা ভবানন্দ মজুমদার জাঁহাঙ্গীর কাননগুই দপ্তরে কার্য্য করিয়া "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৫২৮ শকাব্দে তিনি ১৭টি পরগণার জমিদারি সত্ত্ব ও "চৌধুরী" উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫৩৫ শকাব্দের ফরমাণ দ্বারা তিনি ওখড়া প্রভৃতি ৪টি পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় নবদ্বীপ নগরী তাঁহার হস্তগত হয়। ভবা-নন্দের প্রায় এক শতাব্দী পর তাঁহার উত্তর পুরুষগণ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৫০০ শকাব্দে নবদ্বীপাধিপতির অনুমত্যনুসারে এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচিত হওয়ার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যুঙ্গী হিতৈষী অর্থপিশাচ—ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞানবিজ্ঞ কোন আধুনিক ভট্টদ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সমালোচকের বিচারে তিনি জালের জন্য দণ্ডিত হওয়ার উপযুক্ত পাত্র।

প্রাচীন আর্য্যগণ যে জীবনচরিত রচনায় কিরূপ সক্ষম ছিলেন, হর্ষচরিতই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গুণবান গুণগ্রাহী, বিদ্বান—বিদ্যোৎসাহী "পরমেশ্বর পরম মাহেশ্বর নিশঙ্কশঙ্কর পরমভট্টারক মহা-রাজাধিরাজ বল্লাল সেন দেবের" গুরু স্বীয় শিষ্যের কুৎসা কীর্ত্তন করিবার জন্য "বল্লাল চরিত" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কোন সুবোধ ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে? মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে বল্লালের চরিত্র বর্ণনা কিছুই নাই। ইহার পূর্ব্ব খণ্ড ব্রাহ্মণ, কায়স্থ *প্রভৃতির কুলজিগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।* উত্তর খণ্ড আদ্যোপান্ত একটি অদ্ভুত কাণ্ড।

ইহাতে আছে কি—"বল্লালের রাজ্যে লোকসমূহের পাপাচারণ, সুবর্ণ বণিকদিগের অবশ্যতা, বল্লভানন্দের বিদ্রোহ, উহার দমন চেষ্টা, যোগীদিগের সহিত বিরোধ, বলদেব ভট্ট ও যোগীরাজের রচনা, যোগিরাজ কর্ত্তৃক বলদেবের নিষ্কাসন, যোগীদিগের দমনার্থ বল্লালের নিকট ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধ, বল্লাল সেনের ক্রোধ ও তাঁহার, সুবর্ণবণিক ও যোগিদিগের জাতিপাতনার্থ প্রতিজ্ঞা, সুবর্ণবণিকদিগের কর্ত্তৃক দাসত্ব কার্য্যে প্রতিবন্ধকতাচরণ, উহার প্রতিকারার্থ বল্লালের চিন্তা, দাস্য কর্ম্মে কৈবর্ত্তদিগের নিয়োগ। * কৈবর্ত্তদিগের চিহ্ন ধারণ শূদ্রের পক্ষে কাষ্ঠমালা ধারণের আবশ্যকতা, যোগীদিগের মধ্যে কতগুলির বল্লালের রাজ্য-

* মিথ্যা কথা। সেনরাজাদিগের রাজধানী প্রদেশে—পূর্ব্ববাঙ্গালায় কৈবর্ত্তগণ অনাচরণীয় সুতরাং বল্লালের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায় হইয়াছে। গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানেই কৈবর্ত্ত আচরনীয়। ইহা গঙ্গার মাহাত্ম্য, বল্লালের নহে।

ত্যাগ ও কতগুলির চিহ্নত্যাগ ইত্যাদি * *” মনুর বংশাবলী, দক্ষ কন্যাগণ, ও রুদ্র ও রুদ্রাণী-দিগের নাম গোত্রাদি শ্রেণী ভেদ রুদ্র-দিগের বংশ, বিন্দুনাথের জন্ম (এই বিন্দুনাথ হইতে যোগীদিগের উৎপত্তি) তৎপর ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে ... র জাতি সমূহের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

আমাদের প্রথম আপত্তি এই—যোগী ও (যুঙ্গী) যুগী একজাতি নহে। যাহাদের জন্ম মৃত্যু লীলা খেলা সমস্তই মারহাট্টা ডিচের মধ্যে হইতেছে, ধান্য বৃক্ষ নামক মহাবৃক্ষের আকৃতি বর্ণন করিতে যাহাদের পলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাঁহারাই বোধ হয় যোগী জাতির সংবাদ না জানিতে পারেন। বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তস্থিত হুগলী বর্দ্ধমান হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্ত-স্থিত ত্রিপুরা পর্য্যন্ত যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, আমাদের দেশে যোগী নামক এক জাতি লোক বাস করে, ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহারা প্রধানত সন্ন্যাসী বেশে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এজন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ইহাদিগকে “খেলান্ত যোগী” অর্থাৎ ছদ্মবেশী যোগী এবং পশ্চিম বাঙ্গালায় ইহাদিগকে “সন্ন্যাসী যোগী” বলিয়া থাকে। আমাদিগের দেশীয় যুঙ্গী (যুগী) গণ সেই কুলুৎপন্ন বিন্দুনাথের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় তাহাদের এরূপ যত্ন নিতান্ত ঘৃণা-জনক।

ভগবান মনু বলিয়াছেন, মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সকল জাতির নামোল্লেখ করা হয় নাই, ব্যবসায় দ্বারা তাহাদের জাতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যদি ব্যবসায় দ্বারা যুঙ্গী (যুগী) জাতির উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, তন্তু-বায় ও কোন প্রকার নীচজাতির সংযোগে যুগী জাতির উৎপত্তি। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে যুঙ্গী (যুগী) জাতির উৎপত্তি বৃত্তান্ত অন্যরূপ লিখিত হইয়াছে। তদ্পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বেশধারীর (ছদ্ম সন্ন্যাসী অর্থাৎ খেলান্তযোগীর) ঔরসে গঙ্গা-পুত্রজাতির রমণীর গর্ভে যুঙ্গী অর্থাৎ যুগী জাতির উৎপত্তি।

বল্লালচরিত প্রণেতার অসাধু ব্যবহার প্রদর্শন জন্য এস্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে তিনটী ও বল্লালচরিত হইতে ৪ টি শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

লেটাত্তীবর কন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ শৌনক।
বভূব সদ্যো যো বালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৭ ॥
গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১০৮॥
বৈশ্যাত্তীবর কন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূবহ।
শুণ্ডী যোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চবভূবহ ॥ ১০৯ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১০ ম অধ্যায়।

তৎপর বল্লাল চরিত শ্রবণ করুন—

লেটাত্তীবর কন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ নিশ্চিতম্।
বভূব সদ্যো যো বালো গঙ্গাপুত্র প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯০ ॥
গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ। *
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯১ ॥
ব্রহ্মপুত্র কুলে যুঙ্গা বসতি বাদ্যকারকঃ।
সংস্কার বিহীনশ্চৈব শৌচাচার বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯২ ॥
বৈশ্যাত্তীবর কন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূবহ।
শুণ্ডী যোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রক শ্চাপ্যজায়ত ॥ ৯৪ ॥

বল্লাল চরিতম্। ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শৌনকঋষিকে সম্বো-

---

* শশীভূষণ ভট্ট “বেশধারিণ” শব্দের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে নটস্থির করিয়াছেন। বিদ্যার দৌড় না হবে কেন?

ধন করিয়া জাতিবৃত্তান্ত বলা হইয়াছে। এজন্য ১০৭ শ্লোকের প্রথম চরণের "শৌনক" শব্দটী উঠাইয়া দিয়া বল্লাল চরিতের ৯০ শ্লোকের প্রথম চরণে 'নিশ্চিত'' শব্দ বসান হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ১০৯ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের "পৌণ্ড্রকশ্চ বভূবহ'' পদটি উঠাইয়া বল্লালচরিতের ৯১ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে ''পৌণ্ড্রকশ্চাপাজ্জাবত'' সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত উক্ত পুরাণের উল্লিখিত ১০৭, ১০৮, ১০৯ শ্লোকের সহিত বল্লাল চরিতের উল্লিখিত ৯০, ৯১, ৯৩ শ্লোকের মধ্যে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পাঠকগণ দেখুন, বল্লালচরিত-লেখক কি আশ্চর্য্য কৌশলে ৯২ শ্লোকটি মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বোধ হয়, গ্রন্থকার ভাবিয়া ছিলেন, সঙ্গী দিগকে একবারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। "স্থবিমামাব" দেশে বরাত দেওয়া হউক, কে তাহার খবর লইবেন। কিন্তু গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্য বশত সমালোচক "ব্রহ্মপুত্রকুলের'' খবর বিশেষ রূপে রাখেন। তথায় বাদ্যকারক সঙ্গী জাতি নাই। পশ্চিম বাঙ্গালায় যুগীগণ যে ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, পূর্ব্ব বাঙ্গালার যুগীগণ সেই ব্যবসায় অবলম্বী।

এই গ্রন্থে এইরূপ আগ্রম, বাগ্রম পাগলামী ঢের আছে। কিন্তু তাহার প্রত্যেক বিষয়ের সমালোচনা করিবার আমাদের অবকাশ নাই। আমরা বাঙ্গালায় ইতর জাতি সমূহের উন্নতির সমূহ পক্ষপাতী, কিন্তু এরূপ ঘৃণিত পন্থা কেহ অবলম্বন করিলে আমরা তাহাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। একেত বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে মাটী করিয়াছেন। তাহার পর আবার এ সকল কুকাণ্ড কেন?

উপসংহারে আমরা আর একটী কথা উল্লেখ করিব, তাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা।

এক নির্ব্বোধ জমিদার পুত্র "হেণ্ডনোট" কাটিয়া টাকা উপার্জ্জন করিত এবং বলিত 'বাবা কি কল করিয়া গিয়াছেন নাম দস্তখত করিলেই টাকা পাওয়া যায়।" আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বলিতে পারেন, "প্রাচীন পিতৃপুরুষগণ কি সুন্দর কৌশল করিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থা দিলেই টাকা পাওয়া যায়।''

বল্লালচরিতের ভূমিকার ।৵৹ পৃষ্ঠার টীকায় লিখিত—হইয়াছে যে,''বল্লাল রাজার রাজ্যে তাঁহার আজ্ঞায় ইহাঁদের (যোগীদিগের) যজ্ঞসূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা বাহির সিমুলিয়া নিবাসী পরম-পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন এবং দেশ দেশান্তরের পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থানুসারে ইহাঁদের বংশধরেরা সন ১২৮৪ সালের ২৪ ফাল্গুন তারিখ হইতে বিধি পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্রমশ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন।''

৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও অন্যান্য কয়েক জন পণ্ডিতের প্রদত্ত একখণ্ড মুদ্রিত ব্যবস্থা পুস্তক আমরা পাঠ করিয়াছি। যদি ঐ ব্যবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তবে তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি এই যে—

(১) কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ (স্মৃতি, শ্রুতি) দ্বারা এই ব্যবস্থা সমর্থিত হয় নাই।

(২) পণ্ডিতেরা অর্থ লোভে যে কোন ব্যবস্থা দিলে সমগ্র হিন্দুজাতি তাহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিবে কেন।

(৩) ব্যবস্থা যোগীদিগের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) যুঙ্গী (যগী) জাতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

"নদীয়ার চাঁদ" ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থা আমরা দর্শন করি নাই। কিন্তু "বিদ্যারত্নখুড়" বঙ্গীয় পাঠক-দিগের নিকট বিশেষ রূপে পরিচিত। বঙ্গের শিরোভূষণ মহানুভব বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেনযে "বিদ্যারত্ন খুড়" ব্যবস্থা দানে দাতাকর্ণ ছিলেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ ব্যবস্থা প্রার্থনা করিতেন, তিনি মুক্ত হস্তে সেই রূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। কোন এক জমিদার পরিবারে পৌষ্যপুত্রের কলহে "বিদ্যারত্নখুড়" উভয় পক্ষে ব্যবস্থা প্রদান পূর্ব্বক অনেক টাকা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একপ কীর্ত্তিকাহিনী দিগন্তব্যাপী। এবম্প্রকার লোকের ব্যবস্থার মূল্য এক কপর্দ্দক হইতে পারে না। আমরা "ব্রজ-বিলাস মহাকাব্যের" সূচনাটি এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিব।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদ মস্তক গুণ রতনে মণ্ডিত॥
শুভক্ষণে তারে মাতা ধরিল উদরে।
নাহি দেখি সম তাঁর ভুবন ভিতরে॥
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি।
রূপের তুলনা নাই যেন রতিপতি॥
রসিকের চূড়ামণি সর্ব্বগুণাকর।
সুশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর॥
সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণপ্রায়।
যেই যে বিধান চায়, সেই তাহা পায়॥
এবিষয় কেহ নাহি তাঁহার সমান।
একমাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান।
তাহার গুণের কিছু করিব বর্ণন।
অবহিত চিত্তে সবে করহ শ্রবণ॥

পাঠকগণ "ব্রজবিলাস" পাঠ করিলে "বিদ্যারত্ন খুড়র" কীর্ত্তি কলাপ অবগত হইতে পারিবেন। এবম্প্রকার পণ্ডিত-গণের ব্যবস্থা কোন সুবোধ ব্যক্তি গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ নূতন স্মৃতি প্রস্তুত করিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, কর্ণ হইতে যোগী, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি।

মুখেন উৎপত্তি বিপ্রঃ কর্ণে যোগী তাথৈব্যচ।
বাহুঃ ক্ষত্র উরুর্ব্বৈশ্যঃ পাদৌ শূদ্রোযাতিস্তথা॥

স্মৃতিশাস্ত্রের অবমাননাকারী এবম্প্রকার "ব্রাহ্মণ পুঙ্গব" দিগকে পাগলা গারদে প্রেরণ করা উচিত কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

হা বিধাতঃ ইহারাই হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক ও হিন্দু সমাজের নেতা। এইরূপ মহারোগাক্রান্ত সমাজের কি পুনরুদ্ধারের আশা আছে!

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

প্রবন্ধের মুখবন্ধে বলিয়াছি, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। সে শক্তি কিরূপ ধীর গতিতে সঞ্চিত হইতেছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে লিখিব। এই শ্রেণীকেও লক্ষ্য করিয়া কবিবর রাজকৃষ্ণ তাঁহার "শারদীয় জলদ খণ্ডে" যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"————বাঙ্গালী মাত্রেই অই,
নিরেট পাগল মেব সন্দেহ কি তায়?
নাশিতে দেশের দুখ, বাক্যে হয় শত মুখ
কবন্ধের মত কিন্তু কাজের বেলায়!
* * * * * *
বালক ক্রীড়ার মত, সভা করে কত শত
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়
আকাশ কুসুম সম শেষটা দাঁড়ায়!
কারে বলে দেশোন্নতি,নাহি জানে একরতি
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায়!"

আমরা মুখে যেমন রোখা, কাজে তেমন চোখা নই। বৃক্ষের মধ্যে যেমন এরণ্ড, পক্ষীর মধ্যে যেমন আরসুলা, সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে বাঙ্গালী সেই স্থান লাভ করিয়াছে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা। *

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪০)

দক্ষিণাপথে—রামানন্দ সঙ্গোৎসব।

রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, আমি এ সব তত্ত্বের কি জানি? তুমি যাহা বলাইতেছ, শুক পাখীর ন্যায় তাহাই বলিয়া যাইতেছি। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; হৃদয়ে প্রেরণা দিতেছ, জিহ্বায় তদুপযোগী কথাও ফুটাইতেছ; আর আমার মুখ বীণা যন্ত্রের ন্যায় বাজিয়া যাইতেছে।

শ্রীচৈতন্য রামানন্দের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না, সার্ব্বভৌমের সহবাসে আমার হৃদয় নির্ম্মল হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, রামানন্দ ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি কেহ জানে না। তোমার মহিমা শুনিয়া তোমার নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমি এখন আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া স্তুতি করিতেছ, এই কি তোমার উচিত? সন্ন্যাসী, পরম হংস হইলেই হয় না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন, তিনিই গুরু। শূদ্র ও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলে পরম গুরুর পূজা পাইবার যোগ্য। আমাকে সন্ন্যাসী জ্ঞানে বঞ্চনা করিও না। রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব বলিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

* ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গলার জমিদারদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষরূপে জানিতে হইলে আদর্শ ভূম্যধিকারী রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর প্রণীত "জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী" পাঠ কর।

রামানন্দ রায় মহা ভাগবত ও প্রেমিক হইয়াও গৌরের ব্যাকুলতা ও অনুরাগ দেখিয়া ভাবপ্রেমে টলমল করিতে লাগিলেন এবং অনুরাগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, 'বুঝিলাম তুমি সূত্রধার, আমি নট; তুমি যেমন নাচাবে, আমাকে তেমনি নাচ্‌তে হবে। তুমি বীণাধারী, আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি যেমন বাজাইবে, তাহাকে তেমনি বাজিতে হইবে। শুন! শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, পরম ঈশ্বর, সর্ব্ব অবতারী ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্ব মাধুর্য্য, সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার অপ্রাকৃত নব যৌবন, তিনি চির নূতন পরম সুন্দর। অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত অবতার সকলের আশ্রয়। যত ভক্ত, যত সাধক ও যত উপাসক, সকলের ভক্তি ও প্রীতির আশ্রয়ও বটেন ও বিষয়ও বটেন। যত রস, যত ভক্তি, যত তত্ত্ব, সব তাঁহাতেই পর্য্যবসিত। তিনি পরম পুরুষ, উজ্জ্বল শ্যাম রসময়; কি পুরুষ, কি যোষিৎ, কি স্থাবর জঙ্গম, সকলেরই চিত্তাকর্ষক; এমন কি আপনার মাধুর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া আপনাকে আপনি আলিঙ্গিতে চাহেন।

শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেগে বলিলেন, বুঝাইয়া বল।

রামানন্দ উত্তর করিলেন, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের আনন্দেই সৃষ্টিলীলা। শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দ রূপ ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ! আনন্দরূপেই স্থিত এবং আনন্দরূপেই পর্য্যবসিত। তিনিতো আপন আনন্দে আপনি মাতোয়ারা। তবে আবার লীলা কেন?

ইহার উত্তর এই যে, জীবকে সেই আনন্দের মধুর রস আস্বাদন করাইতে। শ্রুতি তাঁহাকেই 'রস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনন্দ রূপ লীলা-তত্ত্ব ও রস-তত্ত্বের সহিত প্রকটিত হইলেই কৃষ্ণ রূপ নিষ্পন্ন হয়। যাহা খাঁটি রস তাহাই অমৃত, আর যাহা অমৃত, তাহাই চির নূতন, তাহাতে জরা বার্দ্ধক্য, ক্ষয়, বিনাশ কিছুই নাই। আবার যাহা লীলা, তাহাই পরম সুন্দর সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক, পরম কল্যাণময়, অরূপ রূপমাধুরী পূর্ণ। এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক, পরম সুন্দর, নবকিশোর অপ্রাকৃত পুরুষ কিনা? আনন্দ রূপ হইতে সৃষ্টি-লীলা, ইহাতেই বুঝা যায়, তিনিই সকল অবতারের অবতারী, সকল কার্য্য কারণের মূল কারণ, সকল বৈকুণ্ঠ, সকল ব্রহ্মাণ্ড ও সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। জড় জগতের অতীত ধামের নাম শ্রীবৈকুণ্ঠ, তাহার তিনটী প্রকার ভেদ আছে। মথুরা জ্ঞান রাজ্য, দ্বারিকা ঐশ্বর্য্য ধাম, আর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রজধাম মাধুর্য্য পরিপূর্ণ। সেই ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলার স্থান। সেখানে তিনি অপ্রাকৃত গোপ বালক বা শ্রীনন্দ-নন্দন, পিতা মাতার অকপট বাৎসল্যে ক্রীড়মান। সেখানে তিনি পরম সুন্দর হৃদয় সখা, বিপদ সম্পদ, রোগ শোকের একমাত্র বন্ধু। সেখানে ঐশ্বর্য্য বা চিদ্‌বিভূতির লেশ মাত্র নাই। অথচ দাস্য সেবার পরম পাত্র। আর সেখানে তিনি শৃঙ্গার রসময় নব নাগর। তাঁহাতে আত্ম পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেও হৃদয়ের আবেগ যায় না, সকল দিয়াও আত্তি ফুরায় না। এইতো শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিলাম। সহস্র ২ জিহ্বা হইলেও কৃষ্ণের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। বলিতে বলিতে রায় রামানন্দ অধৈর্য্য

হইলেন। গৌরও অবহিত ভাবে শুনিতে লাগিলেন।

রামানন্দ রায় বলিলেন, এখন শ্রীরাধিকার তত্ত্ব কিছু বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। যথা চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। প্রথমটী অন্তরঙ্গা, দ্বিতীয়টী বহিরঙ্গা ও তৃতীয়টী তটস্থা। ইহার মধ্যে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই তাঁহার স্বরূপশক্তি। যে শক্তি ঈশ্বর স্বরূপে না থাকিলে, ঈশ্বরত্ব অসম্ভব হয়, তাহারই নাম চিচ্ছক্তি। এই শক্তি ঈশ্বরতত্ত্বে ওতপ্রোতরূপে চিরবিরাজিত। জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি কখন ঈশ্বরতত্ত্বে প্রকটিত থাকে, কখন বা থাকে না, সে জন্য তাহা তটস্থা। আর মায়াশক্তি ভগবান্ হইতে প্রকটিতা হইয়া ভগবৎ স্বরূপে আপনার প্রভাব বিস্তার না করিয়া তাঁহার বাহিরে থাকে, এজন্য তাহা বহিরঙ্গা। একথার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের পূর্ণ ও অনন্ত-শক্তি কিছু সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। অত্যল্পাংশ মাত্র বিশ্ব রচনায় লিপ্ত থাকায় সৃষ্ট পদার্থমাত্রে কাজেই অপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই অপূর্ণতা নিবন্ধনই উহারা ভ্রান্তি বা মোহের অধীন হইয়াছে। ইহার নামই মায়াশক্তি। সে যাহা হউক, সমুদায় চিচ্ছক্তিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের 'সৎ বা 'নিত্যত্ব' প্রকাশিকা শক্তির নাম সন্ধিনী; 'চিৎ' বা চৈতন্য প্রকাশিকা-শক্তির নাম সম্বিৎ; আর আনন্দ বা আহ্লাদ প্রকাশিকা-শক্তির নাম 'হ্লাদিনী'। শক্তি ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না; সুতরাং এই সকল শক্তি বা প্রকৃতিই আমাদিগকে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের আনন্দ-রূপই লীলার মূল কারণ সুতরাং এই হ্লাদিনী শক্তিই কৃষ্ণকে আহ্লাদ দান করে, অথবা সুখরূপ কৃষ্ণ হ্লাদিনী দ্বারা লীলা সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আবার ভক্ত-গণও এই হ্লাদিনী দ্বারা সুখরূপ কৃষ্ণের সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব জানা যাইতেছে, ভগবানের জাবতীয় শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। হ্লাদিনীর সার অংশ অর্থাৎ হ্লাদিনী হইতে সুখাস্বাদন করিলে ভগবৎ হৃদয়ে বা ভক্ত হৃদয়ে যে স্থায়িভাব অঙ্কিত হয়, তাহার নাম আনন্দ চিন্ময় রস; যাহার অপর নাম প্রেম। এই প্রেম আবার প্রগাঢ় হইলে যাহা স্থায়ী হয়, তাহার নাম মহাভাব। শ্রীরাধিকা এই মহাভাব স্বরূপিনী বই আর কিছু নন। এই মহাভাব সমস্ত চিন্তার সার চিন্তা বা চিন্তামণি। চিন্তামণিই শ্রীরাধিকার প্রকৃত স্বরূপ, আর ললিতাদি সখীনিচয় তাঁহার কায়াব্যূহ। শ্রীরাধার প্রাকৃত কায়া নাই। আবর্ত্তিত কৃষ্ণস্নেহই তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ। কারুণ্য রসের তারল্য বা চির নবীন রসের ও লাবণ্যরসের অমৃত জলে রাধারূপ যেন পুনঃ পুনঃ স্নাত হইয়াছে। লজ্জারূপ শ্যাম-সাটী ও কৃষ্ণানুরাগ রূপ রক্তসাটী পর্য্যায়ক্রমে রাধা-দেহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; প্রণয় বা মান কঞ্চুলিকার বক্ষ সমাচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, প্রণয়-চন্দন এবং স্মিত কান্তি-কর্পূরে শ্রীঅঙ্গ বিলেপিত ও শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদে চর্চ্চিত। প্রচ্ছন্ন মান তাঁহার বেণী-বিন্যাস, আর রস শাস্ত্রে যাহাকে নায়িকার ধীরা ধীরাত্মক গুণ বলে, তাহা তাঁহার উত্তমাঙ্গের পট্টবাস; অনুরাগ তাঁহার অধরের তাম্বুল রাগ; প্রেম কৌটিল্য নয়-

নের কজ্জল। প্রদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারিভাব, ও কিল কিঞ্চিতাদি রসশাস্ত্রের বিংশতি ভাব তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ। ত্রৈলোক্যে যত গুণ শ্রেণী আছে, তাহা তাহার অঙ্গের পুষ্পমালা; সৌভাগ্য রূপ চারু তিলক ললাটে সমুজ্জ্বল, আর প্রেম-বৈচিত্র্য রত্নাদিতে মণ্ডিত কলেবর। তিনি মধ্যা বয়স্কা হইলেও কিশোরী। নিজাঙ্গ-সৌরভ-পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণলীলা-বিভাসিনী মনোবৃত্তি সখীনিচয়ে পরিবৃতা হইয়া শ্রীরাধিকা সদা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ চিন্তা করিতেছেন; কৃষ্ণনামগুণযশঃ শ্রবণ করিতেছেন এবং কৃষ্ণনামগুণযশঃ কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি নিরন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল রসের মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে যত্নবতী। রাধার ন্যায় সৌভাগ্য-শালিনী কে? তাঁহার ন্যায় সুন্দরী ও কলাবতীই বা কে হইতে পারে? শ্রীরাধিকার গুণ শ্রীকৃষ্ণই সংখ্যা করিতে পারেন না, তা জীব ছার কি বলিবে?

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, ইহাতে কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণলীলার গৌরবই অধিক বুঝা যাইতেছে। লীলাময়ী শ্রীরাধিকা হইতে আনন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় মধুর রস আস্বাদন করিয়া বিভোর হইতেছেন, তাহাতেই শ্রীরাধার এত গৌরব। আচ্ছা এই যে কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি রূপ সখীর কথা বলিলেন, ইহা কোন্ তত্ত্ব?

রায় রামানন্দ বলিলেন যে, সৃষ্ট জীবকে স্বীয় আনন্দরস আস্বাদন করান, লীলা-প্রকাশের যেমন এক উদ্দেশ্য, তেমনি লীলার উজ্জ্বল মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিয়া স্বকীয় পূর্ণানন্দকে উচ্ছ্বাসিত করা অপর উদ্দেশ্য। বিন্দু সিন্ধুসঙ্গমে যেমন সুখী হইবে, আবার সিন্ধুও বিন্দুর বিন্দু দান পাইয়া ততোধিক সুখী হইয়া থাকেন। জীবের প্রেম ভগবানে, ভগবানের প্রেম জীবে; এই বিনিময়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দ-লহরীই উঠিয়া থাকে? পরা প্রকৃতি ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা ভিন্ন এই সুখ-লহরী তুলিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু কৃষ্ণ-লীলার মহাভাবময়ীর বিকাশ তো সখীর সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। মহাভাবকে পরিপুষ্ট করে কে? লীলাময়ের আনন্দ চিন্ময় রসের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহারা মঙ্গল, সৌন্দর্য্য, শোভা, সুচিত্র, সুভাব, সুহাস্য, প্রণয়, অনুকূলতা প্রভৃতি যাহা কিছু লীলাময়ী সদ্‌বৃত্তি, তাহারাই নিরন্তর মহাভাবের পরিপোষিণী। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীসঙ্গমে মহানদী পরিপুষ্টা হইয়া প্রধাবিতা হয়, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ চিন্ময় ভাবলহরী মহাভাবে সঙ্গতা হইয়া উহাকে নিরন্তর সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আনন্দ রসের এই সকল খণ্ডই ললিতাদি সখী প্রকৃতি। ইহারা মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার পরিবারবর্গ হইয়াও তাহা হইতে অভিন্নাত্মিকা, বলিতে কি, ইহারাই শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ রূপিনী। রাধাকৃষ্ণের সুখ বিভু স্বপ্রকাশ হইলেও চিৎ-বিভূতি রূপিনী সখীদিগের সাহায্য ব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই সখীতত্ত্ব বা গোপীতত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্য প্রেম-বিহ্বল বাক্যে বলিলেন, এসকল তত্ত্ব ত শুনিলাম। এক্ষণে রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিলাস বর্ণন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ কর।

রামানন্দ উত্তর করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধীর ললিত নায়ক, তিনি নানা রসে রসিক, নিত্য

নবীন, পরিহাস-বিশারদ এবং সদানন্দ। যখন নব জলধ শ্যাম সুন্দর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হৃদয়ে উদিত হইয়া ডাকিতে থাকেন, তখন কি আর গৃহে মন ফিরিতে চায়! রাধা সঙ্গে নিরন্তর কাম ক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, উত্তম কথা, কিন্তু ইহার পর আর যদি কিছু থাকে, বর্ণন করিয়া পরিতৃপ্ত কর।

রায় উত্তর করিলেন, ইহার পর আর কি আছে জানিনা, তবে প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস নামে যে এক লীলা আছে, তাহা শ্রবণে তুমি সুখী হইবে কি না, বলিতে পারিনা। এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যে লীলারূপী কাম, শিল্পী পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত জতুতে শ্রীরাধিকার মহাভাবময়ী প্রকৃতি জতু যখন উভয়ের নবানুরাগরূপ হিঙ্গুল বর্ণ প্রেমাগ্নি দ্বারা গলাইয়া অভিন্ন রূপে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলে, তখনই প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস হয়। বর্ষা কালীন প্রগল্ভা নদীর গৌরবর্ণ জল, জলধির সুনীল জলে মিশিয়া একাকার হইয়াও ঈষৎ রেখায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই বলিয়া রামানন্দ রায় প্রেমভরে স্বরচিত এক গীত গাইলেন।

পহিলহি রাগ নয়ন. ভঙ্গ ভেল; অনু দিন বাড়ল অবধি না পেল। না সো রমণ না-হাম রমণী; দুঁহু মনোভাব পেশলজানি। এ সখী সে সব প্রেম কাহিনী, কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি। না খোঁজলু দূতি, না খোঁজলু আন; দুঁহুক মিলনে মধ্যেতে পাঁচ বাণ। অবশ্যই বিরাগ তুহু ভেলি দোতি! সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি।

এই কথা শুনিতেই শ্রীচৈতন্য প্রেম বিহ্বলচিত্তে স্বহস্তে রাম রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন এবং প্রেমাবেগ সংযত হইলে কহিলেন, এখন কামতত্ত্ব কি, বলিলেই সাধ্য নির্ণয় সমাপ্ত হয়। রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, লীলা সুখ আস্বাদিতে ভগবানের যে সুতীব্র কামনা, তাহারই নাম কাম। ইহা কেবল এক মহাভাবময়ী রাধিকাতেই পরিতৃপ্ত হয়, অন্যত্র তাহা তৃপ্ত হইতে পারে না। অস্মদাদি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনাকে কাম বলা যায় বটে, কিন্তু তাহা আমাদের নরকের কারণ মাত্র। ভগবৎ সেবার জন্য যে সুতীব্র বাসনা বা লোভ, তাহার নাম কাম নহে, উহা নির্ম্মল প্রেম। জীবকে কামে মজায়, প্রেমে ভজায়। গোপীদিগের নিঃস্বার্থ প্রেম কেবল কৃষ্ণকে সুখ দিতে! তাহাতে কাম গন্ধ নাই, সুতরাং উহা প্রেম। ভগবান্ যখন গোপীদিগের ও শ্রীরাধিকার এই সুনির্ম্মল প্রেম আস্বাদন জন্য সুতীব্র লালসা-যুক্ত হয়েন, তখনই তাঁহাকে শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি বলা যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, সাধ্য বস্তু এই পর্য্যন্তই, তাহাতে সন্দেহ নাই, তোমার অনুগ্রহে এসব বুঝিলাম। সাধন বিনা তো সাধ্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, অতএব কৃপা করিয়া উহা পাইবার উপায় বলিয়া দাও?

রামানন্দ উত্তর করিলেন, আমি তোমার ক্রীড়ার পুতুল, যা বলাইতেছ, তাই বলিতেছি। আমার মুখে তুমিই বক্তা, আবার তুমিই শ্রোতা। সাধনের রহস্য কথা বর্ণন করি, শুন। রাধা কৃষ্ণের এই গূঢ় লীলা, ঐশ্বর্য্য ভাবের তো কথাই নাই, মাধুর্য্য ভাবেও জানা যায় না, দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবেরও অগোচর। একমাত্র সখীদিগেরই ইহাতে অধিকার। সখীরাই এই

লীলা পুষ্টি করিয়া বিস্তার করেন, আবার তাঁহারাই ইহা আস্বাদন করেন। সখীদিগের আনুগত্য ভিন্ন ইহা পাইবার উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সখীদিগের প্রেম নিঃস্বার্থ। তাঁহারা কৃষ্ণলীলার সুখ আস্বাদন করিতে চাহেন না। শ্রীকৃষ্ণ সহ রাধিকার মিলন করাইয়াই অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা ব্রজ-কুমুদ-বিধু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কল্পলতা, আর সখীগণ সেই লতিকার যেন পত্র পুষ্প। লীলামৃত জলে এই লতিকা অভিসিঞ্চিত হইলে, পল্লবাদি তাহাতেই সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাদের জন্য পৃথক সিঞ্চনের প্রয়োজন হয়না, এই নিঃস্বার্থ গোপি-প্রেম লাভ করিতে না পারিলে রাধা কৃষ্ণের যুগল ভাব লাভের উপায়ান্তর নাই। বেদ ধর্ম্ম, লোক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, জাতি, কুল, ধন মান, ভয়, ভাবনা, যোগ তপস্যার আশা ছাড়িয়া দিয়া সুতীব্র অনুরাগ-ময়ী ভক্তি পথে সিদ্ধ ভাবময়ী কোন গোপীর ভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তত্তৎ গোপীভাবামৃত লাভ করিতে হয়; সাধক দেহে গোপীর সিদ্ধ দেহ আরোপ করিয়া গোপীর আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। তবে কালে সিদ্ধিলাভ করিয়া রাধা কৃষ্ণের যুগল ভাব লাভে সমর্থ হইতে পারা যায়।

এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য রামরায়কে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমাবেশে উভয়ে গলাগলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাবের জমাটে কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি পোহাইয়া গেল, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। বিদায়কালে রামরায় বলিলেন "যদি আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছ, তবে দিন দশ থাকিয়া আমার পামর মনকে পরিশুদ্ধ কর।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন "তোমার গুণ শ্রবণে যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসের তোমাতেই সীমা। দশদিন কি, আমি যত দিন বাঁচিব তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলাচলে দুই-জনে একত্র থাকিয়া মধুর কৃষ্ণ কথায় কাল কাটাইব। ইহার পর সেদিনকার জন্য রাজা রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলেন। পরদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে আবার মিলিত হইলে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যা মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার?' রামানন্দ উত্তর করিলেন, —কৃষ্ণ ভক্তি বিনা আর বিদ্যাই নাই।" শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কীর্ত্তি বড়?

উত্তর। "কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যার খ্যাতি।"

প্রশ্ন। "শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কি?"

উত্তর। "যার রাধাকৃষ্ণ প্রেম আছে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।"

প্রশ্ন। "দুঃখের মধ্যে গুরুতর কি?"

উত্তর। "কৃষ্ণভক্তি বিরহের ন্যায় আর দুঃখ নাই।"

প্রশ্ন। "মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

উত্তর। "যাহার কৃষ্ণপ্রেম আছে।"

প্রশ্ন। "গানের শ্রেষ্ঠ কি?"

উত্তর। "রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি গীত।"

প্রশ্ন। "শ্রেয়ঃ কি?"

উত্তর। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বিনা জীবের শ্রেয়ঃ নাই।"

প্রশ্ন। "স্মৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?"

উত্তর। কৃষ্ণ নামগুণ লীলাই প্রধান স্মরণ।

প্রশ্ন। ধ্যেয়ের মধ্যে কি ধ্যান্ কর্ত্তব্য?

উত্তর। "রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান।"

প্রশ্ন। কোন্ স্থানে বাস কর্ত্তব্য?"

উত্তর। "ব্রজলীলার স্থানে।"

প্রশ্ন। "শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কি?"

উত্তর। "রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই কর্ণ রসায়ন।"

প্রশ্ন। "শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি?"

উত্তর। "রাধাকৃষ্ণ যুগল নাম।"

প্রশ্ন। মুক্তি বাঞ্ছাকারী ও ভক্তি বাঞ্ছাকারীর মধ্যে প্রভেদ কি?"

উত্তর। "যেমন স্থাবর দহ ও দেব দেহ, অরসজ্ঞ কাক নিম্বের তিক্ত ফল খায়, আর রসজ্ঞ কোকিল আম্র মুকুলের মাধুর্য্য পান করে, এই প্রভেদ।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর নৃত্য কীর্ত্তনে রজনী অবসান হইলে রামানন্দরায় স্বস্থানে গমন করিলেন। আট দশ দিন এমনি করিয়া কাটিয়া গেলে রামানন্দ রায় গৌরের প্রেমাবেগ ও অপূর্ব্ব ভাব লহরী যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিতে রামরায় গৌর চরণে নিবেদন করিলেন "এই কয় দিনে কৃষ্ণতত্ব, রাধাতত্ত্ব, লীলাতত্ব, প্রেমতত্ব, রসতত্ব, কত তত্বই আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল। আমি জন্মেও এত তত্ব কখন জানিতাম না। বুঝিলাম, ভগবান্ নারায়ণ যেমন ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তুমি কৃপা করিয়া অলক্ষিতে এত তত্ব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করিয়া দিয়াছ। এ শক্তি অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন কাহারও নাই, তিনি বাহিরে কাহাকে কিছু না বলিয়া হৃদয়ে বস্তুতত্ব উন্মীলিত করিয়া দেন। এখন আমার মনে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কৃপা করিয়া তাহা অপনয়ন করিয়া দাও।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? রামানন্দ উত্তর করিলেন, বলিব? প্রথমে তোমাকে সন্ন্যাসীরূপ দেখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি যেন, শ্যাম রূপ, আর যেন তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিকা রহিয়াছে, তাঁহার গৌর কান্তির আভায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ যেন অচ্ছাদিত। আবার দেখিতেছি, যেন তুমি বংশীবদন শ্যামসুন্দর রূপে ভাবময় সচঞ্চল আঁখিতে আমাকে দেখিতেছ। ইহার কারণ কি, আমাকে অকপট ভাবে বল। এ যে দেখি, বড়ই চমৎকার। গৌর চন্দ্র উত্তর করিলেন "রাধা কৃষ্ণে তোমার কি না প্রগাঢ় প্রেম, সেই জন্য এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক মহাজন গণ প্রেম-নেত্রে স্থাবর জঙ্গমেও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি দেখিতে পান, স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি তাঁহাদের নেত্রগোচর হয় না, সর্ব্বত্রই ইষ্টদেব স্ফূরণ হইয়া থাকে। শুন নাই কি শাস্ত্রে লিখিত আছে, ভাগবতোত্তম মহাকল্পাধি ষ্ঠানে সকলেই পরিপূর্ণ দেখেন, তাঁহার নিকট তরুলতা পত্রপুষ্প সকলই আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া যেন মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। তুমি রাধাকৃষ্ণের মহা প্রেমিক ভক্ত, সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণ দর্শন করা তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।

যখন এই আলাপ হইতেছিল, তখন উভয়েই প্রেমে ভরপুর। রামানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশিয়া বলিয়া উঠিলেন, প্রভু, আমার কাছে আর চালাকি করিওনা। আমি সব বুঝিয়াছি। শ্রীরাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গূঢ়রূপে নিজ রস আস্বাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া

অন্নসঙ্গে ত্রিভুবন প্রেমে ভাসাইলে, এখানে আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া আবার কপট ব্যবহার করিতেছ কেন?

গৌরচন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, রামরায়! আমিও এক পাগল, আর তুমিও এক পাগল। আমরা সকেলই সমান পাগল। আমার পাগলামি শুনিলে লোকে উপহাস করিবে, সে জন্য কোথায়ও কিছু বলি না। তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার গৌরদেহ নয়; রাধাঙ্গ স্পর্শন জন্য গৌরাঙ্গ হইয়াছে। শ্রীরাধিকা তো ব্রজে ন্দ্রনন্দন বিনা আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি তাহার ভাবে স্বীয় আত্মা অনুভাবিত করিয়া কৃষ্ণ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতেছি। একথা অন্যের গোপ্য হইলেও তোমার কাছে লুকাইতে পারিনা। কথা গোপনে রাখিও, লোকে শুনিলে উপহাস করিবে। এই বলিয়া গৌরচন্দ্র নাকি রামানন্দকে রসরাজ, মহাভাব, দুই রূপে বিবর্ত্তিত অপূর্ব্ব রূপ দেখাইয়া ছিলেন। রামানন্দ সেরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলে, গৌর তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। মূর্চ্ছা-বসানে রামানন্দ রায় গৌরের সন্ন্যাসী রূপ দেখিয়া পূর্ব্ব-দৃষ্ট রূপ স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন।

এই রূপ প্রেমালাপে, রস লীলা তত্ত্ব বিচারে, অপরূপ দর্শনে, কৃষ্ণ কথা-রঙ্গে শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগরে রাজা রামানন্দের সহিত দশরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্ন চিন্তামণি মিশ্রিত কোন খনি পাইয়া খুঁড়িতে থাকিলে লোকে যেমন ক্রমে ক্রমে উত্তম বস্তু লাভ করে, তেমনি রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যে এ কথা ও কথা হইতে হইতে কতই মূল্যবান তত্ত্ব কথা আলোচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে তিনি চরিতামৃতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই ছায়া লইয়া এই পরিচ্ছেদের বৃত্তান্ত লিখিত হইল। রস-রাজ মহাভাব মূর্ত্তি দর্শনে রামানন্দের মূর্চ্ছা ও রাধাঙ্গ স্পর্শনে গৌরচন্দ্রের আত্ম প্রকাশ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কিভাবে হই-য়াছিল, তাহা সুরসিক পাঠক আপন আপন আলোকে বুঝিয়া লইবেন।

দশম রাত্রের শেষে গৌরচন্দ্র রামা-নন্দের নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন, তুমি বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ কর; এদিকে আমিও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অচিরে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করি-তেছি। উভয়ে এক সঙ্গে থাকিয়া নির-ন্তর কৃষ্ণ আলাপনে সময় কাটাইব। পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনের পর রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলে গৌরচন্দ্র শয়ন করিলেন এবং রজনী অবসানে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে বিদ্যা নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

মন্ত্রি-অভিষেক।*

শক্তিশালী সহোদরদ্বয়,—দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের শান্ত ছায়ায় বিচরণ করেন, ক্রীড়াও বার্য্য করেন,—সম্প্রতি রাজনীতির বঙ্গাকাশে সমুদিত,—দৃশ্য সুন্দর,—বঙ্গভূমি আশা করে, উহা কার্য্যকরও হইবে। প্রখরবুদ্ধি পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর বৃটিশ-সঙ্ঘের প্রথম রাজ নৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তি। ঠাকুর বংশ আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য আলোক বিস্তারের "পায়োনিয়ার"। দ্বারকানাথের বংশধরগণ বংশের মণ, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল-তর করিতেছেন।

সাহিত্য, সংসারে থাকিয়া, সংসার-কোলাহল হইতে দূরে থাকে। সাহিত্যের কামনা—শান্তি। স্বভাবতই সে কামনা। সুতরাং সাহিত্য-সেবকগণ রাজ নীতির কোলাহলময় কোন্দলে কদাচিৎ যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু সংসারের লোকে তাঁহাদের রাজনৈতিক মতামত শুনিতে এবং জানিতে সর্ব্বদাই কৌতূহলাক্রান্ত। তাহার কারণ সুস্পষ্ট।

সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যকারের চিন্তা, অন্যান্য অনেক শ্রেণীর লোকের চিন্তা অপেক্ষা স্বভাবতই সুদূর-ব্যাপিনী। সে চিন্তা দ্বারা রাজনৈতিক প্রশ্ন-বিশেষ বা ঘটনা-বিশেষ কিরূপ ভাবে গৃহীত ও চিন্তিত হয়, তাহা জানিতে কাহার না বাসনা হইয়া থাকে? পুনশ্চ,—সাহিত্যকার সদা সর্ব্বক্ষণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত; অথচ তাঁহাদের বৈষয়িক ব্যাপারে,—তাহাদের সাময়িক কোন্দল কোলাহলে একরূপ নির্লিপ্ত। কাযেই কৌতূহল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

রাজনীতির দৈনিক সংগ্রামে, সাহিত্যের উপাসক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক সময়েই প্রবেশ করেন না, প্রায়ই তাহা হইতে তাঁহারা 'প্রচ্ছন্ন' থাকেন, কিন্তু রাজনীতির, [illegible] নীতিরই মূল বীজ বপন করেন তাঁহারা। তাঁহারা অনভিব্যক্ত অধিনায়ক,—অদৃশ্য অভিনেতা।

টেনিসন রুদ্ধদ্বার কুটীর-কক্ষে কাব-ল্যাইল ধ্যান-নিমগ্ন, কিন্তু কে বলিবে, মানবীয় কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের নৈতিক রাজ্যে কার্লাইল কর্তৃত্ব করেন নাই? ভারতায় আর্য্যঋষি নিবিড় অরণ্য নিবাসে লুক্কায়িত থাকিয়া সাম্রাজ্য শাসনের সর্ব্বময় প্রভুত্ব করিতেন। সাহিত্যের স্বভাব-জাত সম্প্রীতি রুশো ও ভিক্টর হুগো;—তাঁহারা, সাহিত্য মাত্র উপজীবী,—কিন্তু রাজনৈতিক জগতে কি মহা আলোড়নই না উত্থিত করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

সাহিত্যাচার্য্যগণ রাজনীতির উন-কোটি, খুটী নুটী লইয়া নাড়া চাড়া করেন না; কিন্তু যাহা রাজ-নীতির বা প্রজা-নীতির মৌলিক পদার্থ, তাহা সাহিত্য হইতে অলক্ষ্যে উদ্ভূত ও বিবর্ত্তিত হইয়া জন সাধারণের মধ্যে অলক্ষ্যে বিস্তার লাভ করে।

পৃথিবীতে যাঁহারা প্রভূ শক্তিসম্পন্ন, তাঁহারাই প্রয়োগ কর্ত্তা। প্রয়োগ কর্ত্তা রাজা,

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক বক্তৃতা।

সাম্রাজ্য-শাসন-সচীব এবং সমাজের অধিনেতৃগণ। সাহিত্য বিজ্ঞানে উদ্ভাবন করে, শিল্পে সংগঠন করে,—শাসয়িতা-গণ করেন প্রযোগ। সংসারের প্রযোগ-কর্ত্তাদিগের পদবী সর্ব্বোচ্চ। শিল্প-বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সাহিত্যের সত্য, সংসারে প্রযুক্ত ও প্রচারিত না হইলে তাহা প্রায় কিছু-নয়ের মধ্যে,—অতএব তাহা,—সমাজের হিতার্থে বা সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি অর্থে,—কার্য্যে প্রযুক্ত ও কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া জন সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। শিল্প ও বিজ্ঞানের কীর্ত্তি ও সাহিত্যের মুক্তি, প্রচার করেন, কার্য্যে পরিণত ও প্রযোগ করেন,—শাস য়িতা, সচীব ও সামাজিকগণ। ইঁহারা কর্ম্মী। কর্ম্মীর হস্তে সভ্যতার অনুষ্ঠান, কবির মস্তিষ্কে তাহার উপাদান। কবি অর্থে বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাহিত্যকার কোম্পা-নীকে বুঝিব।

কবিবর বায়রণ, কবি অপেক্ষা কর্ম্মীর পক্ষপাতী ছিলেন। বায়রণ এবং শেলি উভয়ই ঘোর প্রজা তান্ত্রিক ছিলেন। মহাকবি মিলটন প্রজা-নৈতিক রাজ্যের কেবল সেবক নহেন, সম্পাদকত্ব করিয়া-ছিলেন। মিল্টন কবি এবং কর্ম্মী। বায়রণ এবং শেলির নাম কর্ম্ম জগতে প্রকাশ্যে প্রচা-রিত তত নহে। না হউক। বায়রণ এবং শেলির নাম য়ুরোপীয় সাধারণ তন্ত্রের সূক্ষ্ম-দেহে গভীর অঙ্কিত। বায়রণ এবং শেলি নীরবে রাজনৈতিক সংস্কারের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাম্য স্বাধীনতার যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ফুল-ফল-বান বৃক্ষে পরিণত হইতে এখনও বহু যুগ বাকী আছে।

অসাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই জন্মেন। কিন্তু সংসারে অসাধারণকেও সাধারণ কার্য্য করিতে হয়, —করা উচিত,—না করা প্রত্যবায়। সেক্ষপীয়র অসাধারণ কবি। কিন্তু সাধারণ কার্য্য,—সাধারণের অতি সামান্য কার্য্যও সেক্ষপীয়র করিয়া গিয়াছেন। করিয়া গিয়াছেন বলিয়া কি সেক্ষপীয়র অসাধারণ নহেন? কবি হইলেই যে তাঁহাকে ঘর গৃহ স্থালীর কিছুমাত্র কর্ম্ম করিতে নাই, ক্রমাগত "কুঞ্জ-কাননে" বসিয়া কোকিলের ডাক শুনিতে হয়, এমনতর কোন কথা নাই। কবিরও কর্ম্মী হওয়া উচিত।

সেক্ষপীয়র, মিল্টন মহা কর্ম্মী। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কবিকঙ্কণও কোন্ কর্ম্মী নহেন? তিনি রাজনৈতিকও কোন্ নহেন?—প্রজানৈতিকও কোন্ নহেন? কবিকঙ্কণ বাঙ্গালীর কবি, ঐতিহাসিক, পুরোহিত, প্রতিনিধি,—সব। যেমন পুরী, তেমনি পুরোহিত, যেমন প্রকৃতির লোক, তেমনি প্রতিনিধি,—তাহার অন্যথা হয় নাই বলিয়া যাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করে, তাহারা নির্বোধ। মুকুন্দরাম যদি মন্দ হয়েন, সে দোষ মুকুন্দরামের নহে, সে দোষ তৎকালিক বাঙ্গালী-জগতের মনুষ্যের।

বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করিলে বলা যায়, বায়রণ শেলির ন্যায় আমাদের হেম নবীনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ কার্য্য করিয়াছেন। আনন্দমঠের কবিও কিঞ্চিৎ করিয়াছেন। স্বীকার করুন বা না করুন, বাঙ্গালীর অদ্যকার এই কংগ্রেস উপরোক্ত কবি-কার্য্য পরম্পরার নিকট কিয়ৎপরিমাণও ঋণী।

ঠাকুর ভ্রাতৃ-যুগল নৎ প্রকৃতির সুসন্তান,

—সদ্বিদ্যায় শিক্ষিত;—তাঁহারা সম্পদের সুললিত ক্রোড়ে বর্দ্ধিত ও পালিত। অতএব স্বভাবতঃ এবং শিক্ষা বশতঃ তাঁহারা সুখ-সরলতার সুস্বাদু দুগ্ধময়। তাঁহারা সংসার ক্লেশের ন্যায় বিষয়ীর বৈষয়িক চতুরালীতেও অনভ্যস্ত। শুনিয়াছি, তাঁহাদিগের 'সঙ্গ' সংসারের সাধারণ 'সঙ্গ' হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র,—সাধারণতঃ দৈনিক পৃথিবীর তুলনায় তাঁহাদের অধিবাসিত পৃথিবী টুকু যেন একটু অভিনব।

জীবন-যাত্রার জ্যোৎস্নাময় পথের পথিক, তাঁহারা নৈসর্গিক শোক-সন্তাপ অবশ্যই সহ্য করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,—কিন্তু কঠোর সংসারে সন্তরণ-কারী জীবের যাহা অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট,—সেই অনিবার্য্য নিত্য অভাবের দারুণ দংশন কখনও সহ্য করেন নাই;—স্বতঃ করেন নাই,—পরতঃ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া হয়ত অনুভবও করেন নাই। সেই জন্যই বোধ হয় কবি রবীন্দ্রনাথ কবি মুকুন্দ রামের কাব্যে কবিতা উপভোগ করিতে সম্যক সক্ষম হয়েন না। কল্পনার কবি, কার্য্যের কবিকে বুঝেন না, ইহা এক আক্ষেপ। কিন্তু সে আলোচনার অবকাশ এখানে নাই।

স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি সর্ব্বত্রই সমান কার্য্য করে। বিচক্ষণতা ধর্ম্মমঞ্চের ন্যায় বৈষয়িক বেঞ্চেও বিচক্ষণতা। সাহিত্য-সেবক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত কতিপয় বৎসর হইতে ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য;—সম্প্রতি তিনি "জমিদার পঞ্চায়তের" সম্পাদক। জমিদার পঞ্চায়ত" এক বৈষয়িকী সভা। ব্রাহ্মসমাজস্থ বেদিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; বৈষয়িকী সভার সম্পাদক রূপেও তিনি অল্প বিচক্ষণতার আভাস দেন নাই। 'বিষয়কার্য্যে' অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া যাঁহারা বিশিষ্ট এবং অনবরত বিষয়-ব্যাপারে নিরত, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অপেক্ষা বিষয় ব্যাপারে নূতন ব্রতী জমীদার পঞ্চায়তের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পঞ্চায়তের কার্য্যপ্রণালী পরিচালনা কল্পে অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

বিষয়ীরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম দৃষ্ট পাঞ্চায়ত গৃহে। পরন্তু তিনি 'মরকত-গৃহে' প্রজা-নৈতিক রাক্ষসী সভার সভাপতি। দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের রাজ-নৈতিক বক্তৃতার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অতএব এস্থলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই পাঠকের সম্মুখে রীতিমত উপস্থিত করি। কারণ তিনিই এ প্রবন্ধের প্রধান নায়ক।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য 'মনোনয়ন' পদ্ধতির খণ্ডন ও 'নির্ব্বাচন' প্রস্তাবের অনুমোদন জন্য উপরি উক্ত প্রজা-সভা। সভার সভাপতি দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর;—সভায় সম্রাজ্ঞীর কলিকাতা-নিবাসী অগণিত সংখ্যক প্রজা সমুপস্থিত;—সভার বহুতর বক্তাদিগের মধ্যে রবীন্দ্র নাথ জনৈক বক্তা। বক্তাদিগের অনেকেই ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন;—স্বয়ং দ্বিজেন্দ্র নাথও ইংরেজীর দৌরাত্ম্য পরিহার করিতে পারেন নাই; কিন্তু রবীন্দ্র নাথের বক্তৃতা বাঙ্গালায়। ইহা বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলা ভাষার অহঙ্কার এবং রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গৌরব।

রবীন্দ্রবাবুর এই রাজ-নৈতিক বক্তৃতা "মন্ত্রি-অভিষেক" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বোধ করি ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজ-নৈতিক

সন্দর্ভ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আধ-সাহিত্যিক, আধ রাজ-নৈতিক ও সামাজিক রকমের বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার নাম,—(স্মৃতি-শক্তি যদি আমাদিগকে প্রবঞ্চিত না করিয়া থাকে) "হাতে কলমে"। হাতে কলমে বিদ্রূপ ও রহস্য-রসিকতায় রগ-রগে।" সুকোমল কবিতার উৎস রবীন্দ্র নাথ বিদ্রূপ করিতেও বিশিষ্ট হস্ত। "তাঁহার হাতে কলমে" ছোটখাট গোছের একখানা ব্যঙ্গ কাব্য। 'হাতে-কলমের' লেখক রাজ-নৈতিক গলাবাজির প্রতি এবং তথা কথিত Constitutional agitation এর প্রতি এমনতর এক কটাক্ষ করিয়াছিলেন যে, সে কটাক্ষ,—সে কোমল নূতন কটাক্ষ অনেকের আমরণ মনে থাকিবার কথা। কিন্তু 'হাতে কলমের' লেখক এবং মন্ত্রি-অভিষেকের বক্তায়, এই কতিপয় বৎসরমাত্র সময়ে যেন কিঞ্চিত ভিন্নতা ঘটাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইল। এই 'ভিন্নতা'—সাময়িক স্রোত ধরিয়া হিসাব করিলে উন্নতিরই দিকে বলিতে হয়।

'হাতে-কলমের' কর্ত্তা রবীন্দ্রনাথ যাহার দোষ ঘোষণা করিয়াছেন, মন্ত্রি অভিষেকের বক্তা রবীন্দ্রনাথ তাহারই অতি সুন্দর সমর্থন করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বাঙ্গালী বড় 'বাক্যবাগীশ' হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনেকে ব্যঙ্গ করে। সাহেবরা ত করেনই,—স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও করেন;—হাতে কলমের কবিও খুব কঠিন-রূপে করিয়াছিলেন; করার যে কারণ নাই, তাহা বলিতেছি না; তবে মন্ত্রি-অভিষেকের বক্তা সে বিষয়ে কি বক্তৃতা করিয়াছেন শুনুন;—

"ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী "ষড়যন্ত্রকারী বাবু সম্প্রদায়" "মুখ-সর্ব্বস্ব বাক্যবীর" ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে আপন গাত্র জ্বালা নিহিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সশব্দে আমাদের প্রতি (বাক্যবাণ?) নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা হাসিয়া বলিতেছি, কথা তোমরাও কিছু কম বল না। তোমরা যদি আরম্ভ কর ত আমরা কি তোমাদের সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারি। তোমাদের কাছেই আমাদের শিক্ষা। কথার বায়ব শক্তিতেই ত তোমাদের এত বড় রাজ নৈতিক যন্ত্রটা চলিতেছে। কথা ভরা রাশি রাশি পুঁথি জাহাজে করিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ, এতদিন মুখস্থ করিয়াও যদি দুটো কথা কহিতে না শিখিলাম, তবে আর কি শিখিলাম। তোমাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি, কথাই তোমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিতেছে।"

ইহার মধ্যে একটু মিষ্ট ব্যঙ্গ আছে, তা থাকুক। কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেকালেও কথার 'কেরামত' কম ছিল না। কথার জোরে বিষ নামিত, কথার তোড়ে ভূত ছাড়িত;—তোমার "মন্তর—তন্তর" সেও বাক্যন্ত্রের বায়বীয় শক্তি হইতে উদ্ভূত।

'মন্ত্রি-অভিষেক' নামটী বেশ। এবং অর্থটা একটু "আগ বাড়াইয়া" ধরিলে, নামটী বক্তব্য বিষয়টীর কতক কাছাকাছিও বটে।

রাজকার্য্য চলে আইন-কানুনে। আমাদের এখনকার আইনকানুন তৈয়ারি হয় লাটসাহেবদের সভায়। সভায় অবশ্য সভ্য থাকে, সভ্য নহিলে আর সভা কি? এখন

ধর লাটসাহেবরা হোলেন রাজা। আইন তৈয়ার করার সভার সভ্যেরা কাজেই লাট-সাহেবরূপ রাজার মন্ত্রী। এই মন্ত্রী মহাশয়েরা রাজকার্য্য বা অকার্য্যের উপর বড় একটা মন্ত্রণা দিতে অধিকারী নহেন;—কোন একটা আইন তৈয়ার হওয়ার সময় সে বিষয়ে আপন আপন মতামত জানাইতে সক্ষম। তা সে যা হউক, ইঁহারা এক রকমের মন্ত্রী বই কি?

এই রকমের মন্ত্রী মহাশয়দিগকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, লাট সাহেব অর্থাৎ রাজা; এখন সেই মন্ত্রীদের কতক কতককে নিযুক্ত করিতে চাই আমরা, প্রজা। ইহা লইয়া গণ্ডগোল,—কথা বার্ত্তা, কংগ্রেস এবং আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা। পরন্তু ইহা লইয়াই লর্ড ক্রস এবং মিঃ ব্রাডলার "বিল"। ক্রসের 'বিল' বলে, মন্ত্রি-অভিষেক করিবেন রাজা, ব্রাডলার বিল বলে, তাহা করিবে প্রজা।

কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গ ত আর মূর্খ নহেন যে, ঐ সর্ব্ব-শিক্ষিত-জন-বিদিত এবং আলোচিত বিষয় অত অধিকতর খোলসা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে?

ক্রসের বিলে নির্ব্বাচন প্রচলনের অভাব বলিয়াই তাহার প্রতিবাদ; নতুবা তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে অনেক উন্নতির কথা আছে। আক্ষেপের বিষয়, সেই সকল উন্নতির কথা গুলির উল্লেখ আদপেই কেহ করিতেছেন না। রবীন্দ্র বাবুও করেন নাই।

রবীন্দ্র বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই; মিষ্টার ব্রাডলার 'বিল' সম্বন্ধেও বিশেষ কোন কথা কহেন নাই। সংক্ষিপ্ত কথায় তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, যখন আমরা ভারতীয় প্রজা নির্ব্বাচন প্রণালী একান্ত ব্যগ্রতার সহিত আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তখন তাহা প্রদান করা ইংরাজ রাজের সর্ব্বতোভাবে উচিত। কারণ তদ্দ্বারা প্রকৃতি-পুঞ্জের সন্তোষ উৎপাদিত হইবে। শাসন-কার্য্যে সন্তোষ পদার্থটী উপেক্ষার যোগ্য নহে।

ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি,—রবীন্দ্র বাবু এই কয়েকটী কথাকে 'জ্যামিতিক' স্বতঃ-সিদ্ধ এবং স্বীকার্য্য বলিয়া ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্য্যের উপর তাঁহার সব কয়টা যুক্তি, তর্ক স্থাপিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবুর যুক্তি এইরূপ;—

"ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারত-বর্ষের উন্নতি। সেই উন্নতির জন্য ভারত-বর্ষীয় কতকগুলি মন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। অতএব ইহা সহজেই মনে হয় যে, আমরা ভারতীয় লোক সেই সকল ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে আপনারা নিজে নির্ব্বাচন করিয়া দিলে কাজটাও ভাল হইবে, আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।"

ইহা কবি-হৃদয়ের উপযুক্ত সরল যুক্তি, তাহাতে অবশ্য কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্র বাবু তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—

* * ভরসা করিয়া বলিতে পারি, এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেহই নাই, যিনি বলিবেন, ভারতের উন্নতিই ভারত শাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে।"

পুনশ্চ তিনি বলিতেছেন;—

* * আমরা যদি স্থির চিত্তে প্রণি-

ধান করিয়া দেখি, তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র।"

ভারতের উন্নতি কল্পে ভারত শাসিত হইতেছে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে ভারতবর্ষে বহুল সুফল লাভ করিয়াছে, ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় আমরাও স্বীকার করি, আমাদের ন্যায় অনেকেই স্বীকার করেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বাবুর 'স্বীকার্য্যে' এবং আমাদের স্বীকার্য্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। কারণ "অবিশ্বাসী" ও "কৃতঘ্ন" হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার আশঙ্কা সত্ত্বেও আমরা সরল ভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত নহি যে, ভারতের উন্নতি ভারত শাসনের উদ্দেশ্য হইলেও তাহা "মুখ্য উদ্দেশ্য" নহে;—গৌণ উদ্দেশ্য। পরন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অনুষ্ঠিত ভারত-উপকার "নিঃস্বার্থ" বা "নিষ্কাম" নহে,—তাহা স্বার্থমূলক ও সকাম। কারণ তাহাই স্বাভাবিক এবং তজ্জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিন্দু মাত্রও নিন্দনীয় নহেন। যদি এ সময়ে, বা যে কোন সময়েই হউক, এ দেশে হিন্দু রাজার হিন্দু গবর্ণমেণ্ট থাকিত, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠিত ভারত উন্নতিও গৌণ উদ্দেশ্যমূলক এবং তৎকৃত উপকারও স্বার্থ-সঙ্কুল হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবুর 'রাজ-নীতির' মূল কথাতেই আমাদের যখন কিঞ্চিৎ মত ও বিশ্বাস পার্থক্য হইতেছে, তখন তিনি সেই মূল হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা উত্থিত করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য হইবারও সম্ভাবনা নাই। সে বিষয়ে বাক্য ব্যয় করাও বিফল বিবেচনা করি।

উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে আমাদের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, তাহা এই যে, যদি ক্রশের বিল বিষয়োপযোগী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাডলার বিলও বিষয়োপযোগী হয় নাই। আমাদের বিবেচনায়, উভয়ই "এক ভস্ম আর ছার" ইত্যাদি। ব্রাডলার বিলে প্রতিনৈধিক নির্ব্বাচন আছে বটে, কিন্তু সে থাকা না থাকা। তদ্দ্বারা আসল কার্য্য এক পদও অগ্রসর হইবে না,—একটা হৈ চৈ হইবে বটে।

ব্রাডলার বিলে 'নির্ব্বাচন' আছে যেন নির্ব্বাচনেরই জন্য, শাসন-কার্য্যের সংস্কারের জন্য নহে। ব্রাডলার বিল ও কংগ্রেসের কথা একই। কংগ্রেসও এ সম্বন্ধে চাহিতেছেন কেবল 'নির্ব্বাচন', সুশাসন নহে। কারণ প্রজা-নির্ব্বাচিত শত সংখ্যক সদস্যের মত যদি একমাত্র সভাপতির ইঙ্গিতে 'রদ' হইয়া যায়,—তবে আমাদের সেই নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের সফলতা কোথায়? তাঁহারা কার্য্যতঃ যে "সাক্ষী-গোপাল" সেই সাক্ষী-গোপালই ত রহিয়া গেলেন। সাক্ষী-গোপালের সাধ কি আজও আমাদের মিটে নাই!!!

রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন;—

"এমন দুরাশাও আমরা করিতেছি না যে, আমাদের প্রতিনিধিদের হস্তে রাজ ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা কেবল নিবেদন করিবেন মাত্র, বিচারের ভার, কার্য্যের ভার তোমাদের।"

হায়! এই অধিকার-মাত্র-বিহীন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া ভারতভূমি নিজের

কি উপকার সাধন করিবেন, আমরা জানি না। আর ইহার জন্য,—এই নাম মাত্র নির্ব্বাচনের জন্য, কেন বৃথা "জলধি বন্ধন" হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারি না!! এ সম্বন্ধে বরং প্রতিবাদিত বিলের কোন কোনও ধারা মন্দের ভাল।

কংগ্রেস যে প্রকৃতির 'নির্ব্বাচন' চাহিতেছেন, ও দেশকে চাহাইতেছেন, তাহা ত গেল এই। পরন্তু নির্ব্বাচনের নিজের বস্তুগত আলোক ও অন্ধকার আছে। আলোক অপেক্ষা অন্ধকারের পরিমাণ অল্পও নহে। রবীন্দ্র বাবু আলোকের কথা কহিতে গিয়াছিলেন, আলোকের কথাই কহিয়াছেন। অন্ধকার তাঁহার বক্তৃতায় অকথিতই আছে। না থাকিলে চলিতও না। আলোক অন্ধকার উভয়ের বিচার করিয়া কথা কহিতে হইলে নির্জ্জনে বসিয়াই তাঁহাকে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে হইত; মরকত গৃহে তিনি বক্তা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না।

আমরা লর্ড ক্রসের বিলের অনুমোদন করি না; মিষ্টার ব্রাডলার বিল পাশ হইলে আমরা কৃতার্থ হইব, এমন কথাও সজ্ঞানে বলিতে পারি না। তবে লর্ড ক্রসের বিল পাশ হইলে যে দেশ অচিরাৎ উৎসন্ন যাইবে বলিয়া মহা "হুলস্থূল" পড়িয়া গিয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই। মরকত-গৃহের সভায় রবীন্দ্র বাবু যে "রেজ্লিউসনটী" "চালনা" করিয়াছিলেন, তাহা এই উৎসন্ন বিষয়ক,—

"That this meeting views with **apprehension and alarm** the introduction of Lord Cross's India Councils' Bill into the British Parliament and desires to record i's firm conviction that if this measure be passed into law in its present shape, it will create deep and wide-spread discontent and injure the vital interests of the Indian Nation."

ইত্যাদি।

সংস্কার সম্পাদনের জন্য সময়ে অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় রাজনীতির বেপেসাদার চিন্তাশীল ব্যক্তি বিকারণে দ্বিধা শূন্য হইয়া উপরি-উক্ত 'রেজলিউসন' প্রচার করিলেন, ভাবিলে একটু বিস্মিত ও লজ্জিত হইতে হয়। ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অবস্থা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—সে অবস্থা আমাদের অনুমোদনীয়, আশানুরূপ ও সন্তোষের না হইলেও তদ্দ্বারা দেশ একেবারে অবশ্য উৎসন্ন যায় নাই, পক্ষান্তরে তাহা আমাদিগকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিয়া প্রতিনিধি-প্রণালীর শাসন সম্বন্ধে অন্ততঃ আকাঙ্ক্ষা করিতেও উপযুক্ত করিয়াছে। লর্ড ক্রসের কাউন্সিল বিলের যাহা উদ্দেশ্য, তদ্দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অবস্থা উন্নত বই অবনত হইবে না; অতএব লর্ড ক্রসের কাউন্সিল বিল আইনে পরিণত হইলে দেশ কেন কথিতরূপ রসাতলে যাইবে, বুঝিয়া উঠা যায় না। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদে ও প্রতিনিধি প্রণালীর প্রার্থনায় আমরা নিজেও যোগ দিতেছি,—কিন্তু যাহা সত্য তাহা সত্যের অনুরোধেও বলা উচিত। অত্যুক্তিতে অসারতাই প্রকাশ পায়, আসল কার্য্যও নষ্ট হয়।

লর্ড ক্রসের বিলের লিখিত সংস্কার কেহ চাহেন না, সে সংস্কারে শিক্ষিত সম্প্রদায় কহিতেছেন, সর্ব্বনাশ হইবে,—সম্ভবতঃ সে

বিল 'সেবেন্তা জাতই' হইবে।* সে বিল 'সেবেন্তা জাত' হইবে,—ব্রাডলাব বিল পাশ হওয়া পবেব কথ, পাবলামেণ্টে পেশও হইবে না।† প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন হইল না, ব্যবস্থাপক সভার গবর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত সংস্কারও আমরা করিতে দিলাম না। অবস্থা যাহা ছিল, তাহাই রহিল, অথচ আমরা 'দাপাদাপি' করিয়া মরিলাম। কত অর্থ সামর্থ অনর্থক ব্যয় করিলাম।

বলিবে, লর্ড ক্রসের বিল আমাদেরই আন্দোলনের ফল,—আমরা সে বিল গ্রাহ্য ও গ্রহণ করিলাম না,—আমাদেরই আন্দোলনে পুনরায় অধিকতর অধিকার সংযুক্ত বিল প্রসবিত হইবে। ভাল, তোমাদের এই যুক্তি দম সঙ্কুল নয় কে বলিল? লর্ড ক্রসের বিল আমাদের আন্দোলনে উৎপাদিত বলিয়া যদি যথার্থই তোমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তাহা একটা মহা ভ্রম, সে ভ্রমের উপর আর অধিক নির্ভর করা উচিত হইতেছে না।

রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন আবশ্যক, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের যে রূপ অবস্থা, তাহাতে উৎকট আন্দোলনে বড় বেশি কাজ হইবে না। আমাদের কাংগ্রেসিক আমলে আন্দোলনটা কিছু উৎকট রকম হইতেছে; ইহা অনেকেরই বিবেচনায় বিড়ম্বনা। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে আমরা তুমুল আন্দোলন উত্থিত করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না,—কাযেই সে আন্দোলন জীবিত রাখিতে চাহিতেছি। অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে, কংগ্রেসে আন্দোলন চলিবে; বিলাতেও আমরা আন্দোলন করিব। যতদিনে আমরা উচ্চতর রাজনৈতিক অধিকার না পাই, আন্দোলন ছাড়িব না। কিন্তু এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে যে আন্দোলনেরও আন্দোলনত্ব থাকিবে না। সংসারে সকল দ্রব্যের ন্যায় আন্দোলনের এ কার্য্যে মহা আকর্ষণ, তাহার নূতনত্ব,—অধিকাংশের মধ্যে সারত্ব অপেক্ষা অভিনবত্ব অধিক কার্য্যকরী হয়। পরন্তু একটা ধারাবাহিক ও অবিশ্রান্ত আন্দোলন উত্থিত করিয়া রাখা রাজা প্রজা উভয়েরই পক্ষে অমঙ্গল, ইহাও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। আন্দোলনে উভয়েরই অশান্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

প্রজার ন্যায় রাজা ও রাজপুরুষগণও রক্ত মাংসে গঠিত মনুষ্য। তাঁহাদেরও মেজাজ আছে, খেয়াল আছে,—আশক্তি ও বিরক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ বাবুর কথায় তাঁহারাও "নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন্-টেনিস খেলেন, মহিলাদের সহিত মধুরালাপ করেন।" অতএব তাঁহারা আমাদের অনন্ত আন্দোলনে একান্ত আপ্যায়িত হইবেন, তাহাও নয়? বলিবে "তাঁহারা আপ্যায়িত না হউন, আশঙ্কিতও হইবেন।" আচ্ছা? আশঙ্কিত হইয়া আমাদিগকে অধিকার প্রদানের পরিবর্ত্তে আঘাত করিতেও ত পারেন। রবীন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, মনুষ্য প্রকৃতির অতীত বলিয়া কেহই বিবেচনা করে না। রাজভক্ত প্রজাদের পক্ষে ক্রমাগত রাজ-ভক্ত বিচলিত করা কর্ত্তব্যও নহে।

---

* এ প্রবন্ধলেখার পর তাহাই হইয়াছে।

† হয় নাই। পুনরায় ব্রাডলা আর এক বিল প্রস্তুত করিয়াছেন।

বিলাতি আন্দোলনের উপর আজ কাল আমরা কিছু অতিরিক্ত বিশ্বাস করিতেছি। এ বিশ্বাসেরও বিশিষ্ট কারণ দেখি না। বিলাতি প্রজার পারলামেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অধিকার আছে এবং তাঁহাদের কোন কোন সম্প্রদায়ের কতক কতক লোক আমাদের প্রেরিত বক্তাদিগকে আদর আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মিষ্টার দাদা ভাই নোরোজী ও মিষ্টার লালমোহন ঘোষ বহু বৎসর তাঁহাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া বিলাত প্রবাস করিলেন, কত বক্তৃতা দিলেন ও করতালি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কই কার্য্য ত কিছুই হইল না। বিলাতি নির্ব্বাচকগণ সর্ব্বত্রই আত্ম-স্বার্থের বশীভূত, অধিকাংশ স্থলে আত্ম-স্বার্থ' ও উৎকোচের বশীভূত। আমরা উৎকোচের আয়োজন করিলেও যে তাঁহাদের মন পাইব, তাহারই বা স্থিরতা কি? আমরা অনেক সময়ে "লিবারাল" ও "রেডিকাল" সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আশা প্রাপ্ত হইয়া থাকি; কিন্তু সে আশা পাই, যখন তাঁহারা শাসন-শক্তি হইতে বিচ্যুত; যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা রাজ্যের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, সে মুহূর্ত্তেই পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া মতান্তর প্রাপ্ত হয়েন। যখন উদার প্রকৃতি বড় বড় মেম্বর ও মন্ত্রিগণ সম্বন্ধেই এই কথা, তখন সাধারণ নির্ব্বাচকদিগের প্রদত্ত আশ্বাস সম্বন্ধে আর অধিক কথা কি? ফলতঃ ইংলণ্ডে আমরা করতালি পাইলেও পাইতে পারি, কিন্তু কার্য্য কদাচিৎ পাইবার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞতাতে যতটা ইঙ্গিত করে, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে। তবে "আশা বৈতরণী নদী।" ইংলণ্ডে আম-মোক্তার রাখার উপযোগিতা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য, আমাদের আলোচিত রবীন্দ্র বাবুর এই বক্তৃতা বাজারের সাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইতে অনেক উচ্চ শ্রেণীর; ইহাতে "রূপ রস গন্ধ স্পর্শ আছে।" কাজেই ইহা চিত্তাকর্ষক।

রাজনৈতিক কার্য্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্র বাবুকে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, তিনি সে ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।*

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
মালঞ্চ সম্পাদক।

প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান্?

মানুষের দুর্ব্যবহার দেখিলে, আর মানুষের ধারে যাইতে ইচ্ছা হয় না। মানুষকে ভালবাসা, মানুষের স্বভাব। বিধাতার কি এক গুপ্তলিপি মানুষের মুখে প্রতিভাত, তাঁহার আকর্ষণবলে মানুষ মানুষের ধারে যাইতে বাধ্য। এই জগৎ প্রেমের লীলাভূমি। মানুষ, মানুষকে ভালবাসিবে—প্রতি মানুষের ভিতরে বিধাতার প্রদত্ত যে বিশেষত্ব বিদ্যমান, তাহা গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইবে, ইহাই যেন বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা।

* এই প্রবন্ধ লেখার পর লর্ড ক্রসের বিল পারলামেণ্টের মহা সভায় লীন হইয়া গিয়াছে; ব্রাডলা বাহাদুরের প্রথম বিল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় বিল প্রস্তুত হইয়া পথে ঘাটে বিতর্কিত হইতেছে;—অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের মূল কথা "মন্ত্রি-অভিষেক" পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল, এখনও ঠিক সেই স্থানেই আছে। অতএব আমাদের প্রবন্ধ এত কাল পরেও অপরিবর্ত্তিত ভাবে প্রকাশিত হইল।

নচেৎ মানুষকে দেখিয়া, মানুষ কখনও ভুলিত না। মানুষ, মানুষের ভিতরের ও বাহিরের দুর্ব্যবহার দেখিয়া তিক্ত বিরক্ত হইতেছে, তবুও মানুষের কাছে অবিরত ধাবিত। বিধাতার লীলা এইরূপ, কিন্তু তবুও পৃথিবীতে প্রেম-খেলার ঘর ভাঙ্গিতেছে,—স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ, পিতা পুত্রের বিচ্ছেদ,—ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ও বন্ধু-বিচ্ছেদে জগৎ অস্থির। আপন বলিয়া মানুষকে ধরি, কোল দেই, শরীরের রক্ত জল করিয়া উপকার করি, মানুষ তবুও বুকে ছুরি মারে! হা, জগৎ, এ কি চিত্র!! যে যার যত উপকার করিতেছে, সে যেন তার তত শত্রু। সম্প্রদায়-গত বিবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, এই শস্যশ্যামলা পৃথিবী, নানাবিধ ঝগড়া বিবাদের লীলাক্ষেত্র,—দিন দিন বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। হায়, মানুষ চায় বা কি, পায় বা কি? শুনিয়াছি, এক দিন প্রাতঃস্মরণীয়, বঙ্গের উজ্জ্বল-তম রত্ন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এক জন লোক উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, অমুক লোক আপনার নিন্দা করিয়াছে এবং আপনার অনিষ্ট চেষ্টায় রত আছে।"

এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে চিন্তা করিলেন, এবং তার পর বলিলেন—"সে ব্যক্তির আমি কখনও কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না—তবে কেন সে আমার নিন্দা করিবে বা অনিষ্ট চেষ্টা করিবে?"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কথার অর্থ এইরূপ যে, যে মানুষের উপকার করিবে, সে-ই তোমার নিন্দা-ঘোষণা ও অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে! উপকারীর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া থাকার পরিবর্ত্তে অনিষ্ট-চেষ্টা! এ কথা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দেখিয়া শুনিয়া বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের ধারণা হইয়াছে, এদেশ অকৃতজ্ঞতারূপ মহা কলঙ্ক-সাগরে যখন নিমগ্ন হইয়াছে, তখন এদেশের আর নিস্তার নাই। তিনি এখন সকল প্রকার উন্নতি সম্বন্ধেই সংশয়ী হইয়াছেন। কিন্তু তবুও অকাতরে দুঃখী দরিদ্রকে দান করেন, বহু বিধবাকে ভরণপোষণ করেন, অসহায়ার কথা শুনিলে অশ্রুতে ভাসেন! এ এক কি অপরূপ ব্যাপার!! ইহা কি প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান?

মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্র বিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। মানুষের সৎগুণ রাশির বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষের হিংসা বিদ্বেষ, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, উপকারীর প্রতি শত্রুতাচরণ, শত্রুর প্রতি জাতক্রোধ, অন্য ধর্ম্ম মতাবলম্বীর প্রতি ঘৃণা—পরের প্রতি অনিষ্ট আচরণ,—প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি নানা দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ হইলে মানুষকে পশু অপেক্ষাও হেয় বলিয়া বোধ হয়। ঘোরতর কপটতার আবরণে আচ্ছাদিত মানুষ, দিবা রাত্রি, মানুষকে ঠকাইতেছে, মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িতেছে! মানুষকে অবিশ্বাস করাও মহাপাপ—কিন্তু যেরূপ পৃথিবীর গতি, মানুষকে বিশ্বাস করাও দায়। মানুষ বারম্বার প্রতারিত হইয়াও আবার মানুষের কাছেই যায়। ইহা কি প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান?

মানুষ আর যাইবেই বা কোথায়? মানুষ ছাড়িয়া, মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে? নানা বিঘ্ন-পরিপূর্ণ এই সংসারে বাস করিতে হইলে এক দিকে যেমন বন্ধুর সাহায্যের প্রয়োজন, সূক্ষ্ম এবং পবিত্র ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে হইলেও, সেইরূপ, অভিন্নহৃদয় সুহৃদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জুডাস স্কেরিয়টের ন্যায় বন্ধুর অনিষ্ট সাধনে রত নয়, এমন লোক পৃথিবীতে কিছু দুর্লভ। প্রকৃত বন্ধুত্ব, এই স্বার্থ-পূর্ণ পৃথিবীতে আকাশ-কুসুম। মানুষ বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও আবার বিষ-পান করিয়াই দিবানিশি মজিতেছে। ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারে না। এ এক বিষম মোহ, এ এক ভয়ানক প্রলোভন! জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবার জন্যই বুঝি বিধাতার এই সৃষ্টি!

ভালবাসা—স্বর্গের কুসুম;—ভালবাসা

—নরকের ঢেউ!! যে সৌন্দর্য্য মানুষকে স্বর্গে লইবার জন্য, সেই সৌন্দর্য্য অপর দিকে মানুষকে নরকে ডুবাইবার অস্ত্র। রূপ দেখিয়া মানুষ বিধাতার মজে, রূপে মজিয়া মানুষ নরকের আশ্রয় লয়। যার মন যেমন, তার ভাবো নাই। ভালবাসা সৃষ্টির অতি মধুর জিনিস;—এমন জিনিস আর সৃষ্টিতে আছে কি না, জানি না। কিন্তু অপর দিকে যত অনর্থের মূল, এই ভালবাসা। ভালবাসার খাতিরে মানুষ ধর্ম্ম ডুবায়, কুল ত্যজে, চরিত্র হারায়, নরহত্যা করে;—কি না করে, আমি জানি না। ভালবাসার খাতিরে পৃথিবী নরশোণিত-পানে পূর্ণ। ভালবাসা না করিতে পারে, এমন অপকর্ম্ম নাই। ব্যভিচারী, কুলটা, স্বৈরিণী, এ সকল অপবাদই ভালবাসার খাতিরে। এক মানুষের বুকে অপর মানুষ অন্যের ভালবাসার খাতিরে ছুরি মারে। স্বর্গ আর নরক—এক বস্তুর।

পৃথিবীর সকল জিনিসেরই দুটি দিক আছে;—একটা ভাল, একটা মন্দ। মানুষ দেবতা, মানুষ পশু। এমন ভাল জিনিস নাই, যাহার মন্দ নাই। এমন যে পবিত্র সৃষ্টি—ফুল, তাহারও দুই দিক আছে। এমন যে সুমিষ্ট কোকিলের স্বর—তাহারও দুই দিক। এমন যে রমণীর সৌন্দর্য্য—তাহারও দুই দিক। ফুল, কোকিলের স্বর, রমণীর রূপ—কাহাকেও স্বর্গে তুলিতে, কাহাকেও নরকে লইয়া যাইতে। তুমি বলিবে, যার মন কলুষিত, সেই এই সকলের দ্বারায় নরকে যায়। কথা ঠিক বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখত,—কত মানুষের মন কলুষিত?—কত লোক মজিতেছে?—কত লোক ডুবিতেছে? পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ কর, বুঝিবে ভাল লোক দুর্লভ। তবে কি ফুল ফুটিবে না, পাখী গাইবে না, রমণী বেড়াইবে না? তুমিইত বল, "রমণী সর্ব্বনাশের মূল,—বেশ্যা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটার নরকের পথ।" তোমার মন কলুষিত বলিয়া কি এ কথা বলিতেছ না? বেশ্যাও যাঁহার সৃষ্টি, তুমিও তাঁহারই সৃষ্টি। বেশ্যা অপরাধিনী, আর তুমি কি কাজে, কি চিন্তায় অপরাধী নও? তুমি অপরাধী ভাই, তোমার ভগ্নীকে, বিধাতার কন্যাকে অপরাধিনী মনে করিয়া ঘৃণা করিতেছ? তাহাকে তোমার সমাজ বা তুমি যে ডুবাইয়াছ, তাহা ত একবারও ভাবিলে না। এদিকে তুমিই ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া বেড়াও? ধিক, তোমার ধর্ম্ম! তোমার মন যে কলুষিত, সে কথাটা নিজের সম্বন্ধে বলিলে না; অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিলে! তবেই দেখ, ভাল মন্দ সর্ব্বত্রই কি না। তুমি, আমি, সে,—কে ভাল, কে মন্দ; এ বিচার না করিয়া, বিচার কর না কেন, "আমি মন্দ, সে-ই ভাল!—আমারই যত দোষ, তার দোষ নাই।" হায়, তাহ হইলে এই হতভাগ্য পৃথিবী আজ সোণার পৃথিবী হইত। তোমাকে কে কি বলিয়া গালাগালি দিয়াছে, তুমি তাই ভাবিয়াই অস্থির। তোমায় কে কবে নিন্দা করিয়াছে, সেই চিন্তাতেই তুমি বিভোর! তোমার ধর্ম্মকে কে কবে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহা লইয়াই তুমি ব্যস্ত। একবারও তার গুণ ভাবিলে না? ভাবিলে না—তোমার দোষ আছে বলিয়াই সে গালি দিয়াছে; অথবা গালি দিয়া ত সে বন্ধুর কাজই করিয়াছে। মহাজনেরা বলেন, যে দোষ দেখায়, সেই বন্ধুর কাজ করে। তোমার দোষ না থাকে, তাতেই বা তোমার ক্রোধের বিষয় কি? কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দেও না কেন? যে গালাগালি দিয়াছে, নয় তাকে ক্ষমাই কর। তুমি তার পরিবর্ত্তে তার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ-পিণ্ড চট্‌কাইয়া সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছ; এ যে তোমার কি অভিনব ধর্ম্ম-প্রচারের ধূয়া, আমি কিছুতেই বুঝিলাম না। তোমার ঐ অহঙ্কার-মূলক (Moral-indignation) নীতি-ঘৃণাটাকে (?) কর্ম্মনাশার জলে কিছুতেই ফেলিতে পারিলে না, অথচ ধর্ম্মের বড়াই কর! আমার ধারণা ছিল, যে ধার্ম্মিক, সে বুঝি নিন্দা বা গালাগালিতে টলে না।—সে বুঝি এ সকলের অতীত। সে বুঝি পুণ্যভূমিতে পাদচারণা করে। অহো দুর্ভাগ্য, আজ দেখিতেছি; ধার্ম্মিকের ক্রোধ, হিংসা আরো বেশী। তাল

মন্দ যে সর্ব্বত্রই বিজড়িত, বিমিশ্রিত, এ কথাতে আর সন্দেহ রাখিতে পারিতেছি না।

আমি যতই সূক্ষ্মরূপে জগতকে পরীক্ষা করিতেছি, ততই দেখিতেছি, সকল বস্তুই এখন মন্দের দিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মানুষ এমন পশুত্বে চলিয়াছে,—ধার্ম্মিক যাহারা, তাহারাই এখন অধিক অধার্ম্মিক। মানুষের সৎগুণ রাশি এখন মহা পাপ-রাহু গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সত্য, পুণ্য, নীতি, ধর্ম্ম, চরিত্র হুজুগপ্রিয় কলিযুগে অন্তর্হিত হইয়াছে। কপটতা, প্রবঞ্চনা—এখন মানুষের ব্যবসা। সে-ই বড়, যে মানুষকে অধিক ঠকাইতে পারে। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না—এখন ভারতবর্ষ পশুর লীলাচল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যভিচারের স্রোতে, ভ্রূণ হত্যার স্রোতে, হিংসা বিদ্বেষের স্রোতে ভারত প্লাবিত। যে দিকে চাই, দেখি, আমরা রাশি রাশি পশু এই ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছি। কে কাকে দেখে, কে কাকে ধরে, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া সকলে অস্থির!!

বাল্যকাল হইতে কত লোককে আপনার বলিয়া বুকে ধরিয়াছি, প্রাণে ছুরি মারে নাই, এমন বন্ধু বিরল। জীবন দিয়া জীবন পাইবার চেষ্টা করিয়াছি, বিনিময়ে পাইয়াছি—ছাই। যাহাদিগের উপকার করিয়াছি—দেখিয়াছি, তাহারাই কিছু দিন পর প্রধান শত্রু। সমাজ-সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি,—পাইয়াছি, লোকের গালাগালি। দেখিয়া শুনিয়া, এমন সাধ হইয়াছে—চুপ করিয়া বসি। তোমার মধুর বন্ধুত্ব চাই না, তোমার ঐ মন-ভুলানে ভালবাসা চাই না, আড়ম্বরময় দেশ-সংস্কার চাই না—চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাই। কিন্তু কেমন যে বিষম মোহের ঘোর,—লোক কাঁদিতেছে, শুনিলেই প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। যে শতবার বক্ষে আঘাত করিয়াছে, সে দ্বারে আসিলে আবার তাকে বুকে না তুলিয়া থাকিতে পারি না। যে শতবার ঠকাইয়াছে, আবার কাঁদিয়া অভাব জানাইলে তাকেও কিছু না দিয়া থাকিতে পারি না। আমি কি এক বিষম মোহে পড়িয়াছি, ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছি। হিন্দুসমাজ বল, ব্রাহ্মসমাজ বল; ধনী বন্ধু বল, দরিদ্র বন্ধু বল;—সকলের ব্যবহার দেখিয়াই অবাক হইয়াছি! আমিও তাঁদেরই এক জন। তারাও আমার ব্যবহার দেখিয়া নাকি অবাক হইয়াছে। আমিও নাকি তাদের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! ইচ্ছা লইয়া কথা নয়; ইচ্ছা, মানুষ দেখে না—সুতরাং বন্ধুরাও যে আমাকে "অধঃপতিত" ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণ করিবেন, আশ্চর্য্য কি? অশ্রুবর্ষণের সহিত তাঁহারা অনিষ্ট চেষ্টাও করিতেছেন,—মহত্ত্বের কত পরিচয় দিতেছেন! আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি—আর অবাক হইতেছি। কোথাও যাইব না, ভাবি। ভাবিতে না ভাবিতে দেখি, অন্যত্র যাইয়া উপস্থিত হইয়াছি। কাহাকেও আপনার ভাবিব না, মনে ভাবি,—দেখি, ভাবিবার পূর্ব্বেই অন্যকে আপনার ভাবিয়া বসিয়াছি। ঠকিয়া, প্রতারিত হইয়া কত বার অন্যের তিরস্কার শুনিয়াছি—কিন্তু যত বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তত বারই অধিক ঠকিয়াছি। ঠকিয়া ঠকিয়া জেরবার হইয়া ভাবিতেছি—এ প্রেমের দায়—না কর্ত্তব্যের টান?

প্রেমের দায়ও না, কর্ত্তব্যের টানও না। এ এক মহাজনের মহা খেলা। ঋণ শোধ দিতে আসিয়াছি, আজীবন ঋণই শোধ দিতে হইবে। জীবন দিলেও ঋণের শেষ নাই। আছি ইহারই জন্য—মরণের দেশে যাইব, ইহারই জন্য। আশা, ভরসা, প্রত্যাশা, সব বিসর্জ্জিত হইয়াছে—এখন ভবের তীরে বসিয়া জীবনের ভাটী বেলায় ঋণ শোধিতে বসিয়াছি। মানুষের কাছে কত ঋণী ছিলাম, হিসাব কেতাব কিছুই নাই। যত শোধিতেছি, তত লোক ছুটিয়া আমার নিকট আসিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন আমার দিকে ছুটিতেছে। আমার ক্ষুদ্র বুকে সকলকে পূরিতে পারিতেছি না—তাই কেহ যাইতেছে, কেহ আসিতেছে। যে দিন আমার ঋণ শোধ হইবে, সেই দিন আমি মহাযাত্রা করিব। সেই দিন সকলে আমার সপিণ্ডীকরণ করিও।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কলনের বাল্য-জীবনী।

এই মহাপুরুষ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কেণ্টাকি প্রদেশের অন্তঃপাতী নোলিন ক্রীক নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আশৈশব দরিদ্রতার চির দুঃখময় ক্রোড়ে লালিত পালিত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে দারিদ্র্যের দুঃসহ ভাবে নিপীড়িত হইয়াও, স্বকীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, চরিত্র ও প্রতিভা বলে পৃথিবীর সভ্যতম প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হন। তিনি আত্ম বিদ্রোহানলে দহ্যমান জন্মভূমিকে নির্ভীক-চিত্তে ও প্রশান্ত হৃদয়ে রক্ষা করিয়া, ইউ নাইটেড্ ষ্টেটস্ (যুক্ত রাজ্য) হইতে সমূলে জঘন্যতম দাসত্ব-প্রথাকে উৎপাটিত করেন। আমেরিকার কৃষ্ণবর্ণ দাসদিগের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক, উপাংশুঘাতকের নিষ্ঠুর হস্তে স্বীয় পবিত্র জীবন, ধার্ম্মিক চূড়ামণি মহাত্মা খ্রীষ্টের ন্যায় উৎসর্গীকৃত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা যথোচিতরূপে রক্ষা করিতে গিয়া, তিনি নরাধম বিদ্রোহীর হস্তে নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। যত দিন পৃথিবীতে মনুষ্য বসতি করিবে, যত দিন ভূমণ্ডলে সাম্য ও স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, যত দিন নরলোকে আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশ-হিতৈষিতা, বিশ্বজনীন প্রেম ও সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব শব্দ বর্ত্তমান থাকিয়া অভিধানের পত্র উজ্জ্বল করিবে,—তত দিন প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলন স্বদেশ-হিতৈষিগণের অগ্রণী বলিয়া জগতে প্রীতি ও ভক্তির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী পাইতে বঞ্চিত হইবেন না, তত দিন দেবতার ন্যায় সভ্য জগতের গৃহে গৃহে পূজিত হইতে থাকিবেন, তত দিন ভূমণ্ডলস্থ নর নারী এক বাক্যে তাঁহার স্বর্গীয় অমর আত্মার উদ্দেশে গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম অনুরাগ উপহার দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। জর্জ ওয়াসিংটন ব্যতীত এমন মহাপুরুষ স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকায় আর কখনও আবির্ভূত হইয়াছেন কি না সন্দেহ স্থল।

কেণ্টাকির অন্তর্গত হাডিন প্রদেশে নোলিন ক্রীক্ নামে একটী সামান্য স্থানে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ভাবী অধিপতি শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম সময়ে তাঁহার পিতা টমাস লিঙ্কলনের বয়স ৩১ এবং তাহার মাতার ২৬ বৎসর বয়স ছিল। তাঁহারা উভয়ে যে সামান্য গৃহে বাস করিতেন, তাহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চারণের নিমিত্ত দ্বার কি গবাক্ষ কিছুই ছিল না। সেই কুটীরের সমীপে অন্য কোন প্রতিবেশীর বাসস্থল ছিল না। তাঁহার চতুর্দ্দিকের ভীষণ অরণ্যে নানাবিধ হিংস্র জন্তু নিরাপদে বাস করিত।

টমাস অনুমাত্রও লিখিতে পড়িতে জানিত না। শৈশবকালেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু ঘটিলে, টমাস দুরবস্থা ও দরিদ্রতার সহিত অনন্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই নিমিত্ত কোনও বিদ্যালয়ে পদার্পণ

করিতে এক দিনের জন্যও তাঁহার ভাগ্যে অবসর ঘটে নাই। টমাসের পত্নী কিছু কিছু পড়িতে পারিতেন বটে, কিন্তু পত্রাদি লিখিতে পারিতেন না। বিদ্যা, বুদ্ধি, উদারতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি কোন বিষয়েই টমাস নিজ পত্নীর সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়া পতির উপর টমাস পত্নীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি অতি কষ্টে পত্নীর নিকট নিজের নাম লিখিতে অভ্যাস করিয়া, নিরক্ষরতার অপবাদ হইতে মুক্ত হন।

বালক আব্রাহামের যখন ৪ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ও রমণীয় একটী স্থানে আসিয়া সপরিবারে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সমবয়স্ক যে ৬।৭ জন প্রতিবেশী বালক ছিল, অল্প কালের মধ্যেই আব্রাহাম বুদ্ধি কৌশলে তাহাদের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এখানে তিনিপাঠশালায় সামান্য লেখা পড়া আরম্ভ করিয়া, অতি অল্প কালেই গুরু মহাশয়ের আয়ত্তাধীন যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। আব্রাহাম জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারার সহিত পাঠশালায় প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। এই পাঠশালা তাঁহার পিতার বাসস্থান হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। চারি পাঁচ বৎসরের শিশু লেখা পড়া শিক্ষার জন্য প্রত্যহ আট মাইল পথ যাতায়াত করিত!!! কি অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়! কি প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা!

প্রতি রবিবার ও অন্যান্য দিনের অবসর সময়ে টমাসপত্নী পতি, পুত্র ও কন্যাকে বাইবল গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন। পড়িতে লিখিবার পূর্ব্বে বিদুষী মাতার নিকট হইতে এইরূপে শুনিয়া, আব্রাহাম সেই অমূল্য ধর্ম্ম পুস্তকের অনেক উপদেশ ও উপন্যাস শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতার পুস্তকাগারে আব্রাহাম যে তিন খানি কীটদংষ্ট্র ও অযত্নরক্ষিত পুস্তক পাইলেন, পাঠশালায় অবস্থান কালে অতি মনোযোগের সহিত ক্রমে তাহা পড়িতে ও শিখিতে লাগিলেন। সেই তিন খানি পুস্তক এই;—বাইবল, ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ডিলোয়ার্থের বানান পুস্তক।

পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে, আব্রাহাম গৃহে বসিয়া বাইবল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বাইবলের উপন্যাসাংশগুলি তাঁহার কোমল মনকে সমধিক আকৃষ্ট করে। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তাহার তৃপ্তির হ্রাস হইত না। বাইবলের ন্যায় বহুমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ যাঁহার বাল্য জীবনকে প্রথম হইতে গঠিত ও পরিচালিত করে, তিনি যে যৌবনে শৌর্য্য, বীর্য্য, নির্ভীকতা, উদারতা, সততা, সহৃদয়তা, মহানুভাবতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক মানব জাতির অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে টমাস দাসত্ব ব্যবসায়ের পাপে পরিপূর্ণ কেণ্টাকি প্রদেশ ছাড়িয়া ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে যাইয়া বসতি করিতে মনস্থ করিলেন। ইতি পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ানা প্রদেশ (যুক্তরাজ্যের United State) অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা হইতেছিল। মহাসভা কংগ্রেসে ঘোরতর তর্ক বিতর্কের পর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ানা যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে কেণ্টাকির ন্যায় জঘন্যতম দাস ব্যবসায়ের প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই নিমিত্ত দলে দলে দীন দরিদ্র লোক নূতন প্রদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে

লাগিল। টমাস দাসত্ব প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি জানিতেন যে, হেযতম দাসত্ব প্রথা যে যে স্থানে প্রচলিত আছে, সেই স্থানে উৎপীড়ন ও অবনতির এক শেষ ঘটিয়া থাকে। তিনি নিরক্ষর হইলেও বুদ্ধিহীন ও হৃদয় শূন্য ছিলেন না। কেণ্টাকি দাস ব্যবসায়ীদিগের পাশবিক ও অমানুষিক অত্যাচারের অন্যতম রঙ্গভূমি ছিল। কার্টার নামে টমসের পরিচিত জনৈক কৃষক ইতি পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত স্পেনসার কাউণ্টিতে উপনিবিষ্ট হন। তিনিও তথায়ই নিজের বাসস্থল মনোনীত করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কেণ্টাকি ছাড়িয়া নতন স্বাধীন প্রদেশে যাওয়ার টমাসের অন্যতর কারণ ছিল। দাসব্যবসায়িগণ অন্যায় পূর্ব্বক দরিদ্র কৃষকদিগের জমি ইত্যাদি কৌশলে স্বাধিকারভুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইত না। কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া যাহারা মানব জাতির অমূল্য স্বাধীনতা রত্ন অপহরণ করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিত, জমী জমা হরণ তাহাদের পক্ষে নিতান্ত সামান্য বিষয়। টমাস এই আকস্মিক বিপৎ পাত উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই সেই স্থান সত্বর পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার যে কিছু সামান্য ভূমি সম্পত্তি ছিল, তাহা তিন শত ডলার (প্রায় সাড়ে সাত শত টাকা) মূল্যে বিক্রয় করিলেন। মূল্যের মুদ্রার মধ্যে বিশ ডালার নগদ লইলেন। বাকী টাকার পরিবর্ত্তে দশ বেরেল (৪০০ গেলেন ৫০ মণ) মদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। জমীজমার বিনিময়ে হুইস্কি মদ! কি অদ্ভুত বিনিময়!! এই মদ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ ও জমীজমা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কর্ত্তন ও আহরণ করিয়া টমাস নিজ হস্তেই নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত মদ ও গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া টমাস জলপথে একাকী ইণ্ডিয়ানা অভিমুখে ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া চলিলেন। স্ত্রীপুত্রাদিকে কেণ্টাকির বাটীতেই রাখিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ওহিও নদীর গর্ভে তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে, তাঁহার ভবিষ্যতের আশা ভরসা বিনষ্ট হইল। তীরবর্ত্তী লোকদিগের সাহায্যে তিনি নৌকা খানির সহিত তিন বেরেল মদ নদীগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইলেন। তাহা নৌকায় উঠাইয়া নির্ভীক চিত্তে ও আশ্বস্ত মনে টমাস টমসনের খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পদব্রজে যাওয়ার জন্য টমাস একজন ভারবাহী গরুর অধিস্বামীকে দ্রব্যাদি বহনার্থে নিযুক্ত করিলেন। ভাড়ার পরিবর্ত্তে গোস্বামী নৌকা খানি গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। কিছু দূর যাইয়াই তাঁহারা উভয়ে দেখিতে পাইলেন যে, সেখানে জনমানবের যাতায়াতের কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। টমাস সঙ্গীর সহিত, কুড়ালি দ্বারা সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন! এইরূপে কিছু দিন অবিশ্রান্ত ঘোরতর পরিশ্রমের পর তাঁহারা আঠার মাইল পথ গমন করিয়া একটী ক্ষুদ্র কুটীর দেখিতে পাইলেন। তথায় বিশ্রাম করিয়া গৃহস্বামী উড সাহেবকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। পরে উডের সহিত দুই মাইল গমন করিয়া টমাস

আপন ভাবী বাসস্থল মনোনীত করিলেন। উডের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, দুই মাইল দূরে পূর্ব্ব দিকে, ছয় মাইল দূরে উত্তর দিকে এবং আট মাইল দূরে পশ্চিম দিকে তিন ঘর কৃষক বসতি করে। তাঁহার সমস্ত জিনিসাদি উডের কুটীরে রাখিয়া টমাস পদব্রজে কেণ্টাকীর পূর্ব্বতন বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে সপরিবারে মনোনীত নূতন বাসস্থলে যাওয়ার উদ্যোগ হইল। শয্যাদি দ্রব্যসহ সপরিবারে টমাস সওয়া শত মাইল সাত দিনে অতিক্রম করিয়া ভাবী বাসস্থানে উপনীত হইলেন। টমাসের যে দুইটী ভারবাহী অশ্ব ছিল, তাহার পৃষ্ঠে কথন [illegible]। লিঙ্কন পত্নী পুত্র কন্যা সহ স্বামীর অনুগমন করিলেন। মৃত্তিকাই তাঁহাদের বার কালের এক মাত্র শয্যা এবং আকাশ তলই এক মাত্র আশ্রয় ছিল।

টমাস তাড়াতাড়ি একটী অতি সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ানার দুঃসহ শীত কোন ক্রমে যাপন করিলেন। উপযুক্ত সময়ের অভাবে কুটীরের তিন দিক্ বদ্ধ এবং এক দিক খোলা রাখিতে হইয়াছিল। পর বৎসর এক খানি বাসোপযোগী প্রশস্ত কুটীর নির্ম্মিত হয়। এই কুটীর দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট ও প্রস্থে ১৬ ফিট বিস্তৃত ছিল। এই সামান্য কুঠরীতে আব্রাহাম সন্তুষ্টচিত্তে জীবনের দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করেন। কুটীর নির্ম্মাণ, কাষ্ঠ কর্ত্তন, জঙ্গল আবাদ, শস্যরোপণ, ক্ষেত্র কর্ষণ, ঢেঁকি নির্ম্মাণ প্রভৃতি পিতার অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যে আট বৎসরের বালক টমাসের এক মাত্র সাহায্যকারী ছিল। এই অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কুঠার আব্রাহামের নিত্য সহচর ছিল। প্রত্যহ কুঠার পরিচালন করাতে অল্পকালের মধ্যেই আব্রাহাম অতি বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কাষ্ঠ কর্ত্তন ও ছেদনাদি কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ইণ্ডিয়ানার বনবাসী দরিদ্র কৃষকগণ বন্য জন্তু শিকার করিয়া অনেক সময় জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিত এবং বন্য পশুর উপদ্রব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিত। বাল্যকালেই লিঙ্কন পিতার নিকট পশু পক্ষী শিকার করিতে শিক্ষা করেন। সেই নিবিড় বনদেশের মধ্যবর্ত্তী কুটীরের নিকটে কোথাও পানীয় জল ছিল না। জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারার সহিত লিঙ্কন এক মাইল দূরে অবস্থিত একটী নির্ঝরিণী হইতে সমস্ত পরিবারের ব্যবহার্য্য জল প্রত্যহ আনয়ন করিতেন।

তত্রত্য অশিক্ষিত নিরক্ষর দরিদ্র লোকের মধ্যে ধর্ম্ম, সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার বিশেষ অভাব ছিল। সময় সময় তাহারা সুযোগ ক্রমে অপরের দ্রব্যাদি চুরি করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিয়া সময় সময় পশুবৎ আচরণ করিত। এই সকল লোকের সংসর্গে সর্ব্বদা থাকিয়া কিসে আব্রাহাম সাধু, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক রহিবে, পুত্রবৎসলা মাতা সর্ব্বদাই তাহা চিন্তা করিতেন। পুত্রকে তিনি সময় সময় অনেক সুন্দর ও সরল উপদেশ প্রদান করিয়া, তাঁহার নৈতিক জীবন গঠন করিয়াছিলেন। মদ খাওয়া সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—"বৎস, মদ পান করিতে আরম্ভ করিয়াই লোকে মাতাল হয় ও পশুবৎ আচরণ করে। তুমি কখনও মদ্য পান করিওনা! তাহা হইলে তোমাকে

কখনও মাতাল হইতে হইবেনা।" আমরণ পুত্র মাতার এই সরল উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের অধিপতিত্বে বরিত হইয়াও চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে মদ্য পান করিতে অস্বীকৃত হন। এমন নৈতিক সাহস ও প্রগাঢ় মাতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই তিনি জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে টমাস স্পেরো লিঙ্কলন-পরিবারের প্রতিবেশী হইল। টমাস স্পেরোর পত্নী বেটসি লিঙ্কন-পত্নীর শৈশবের প্রতিপালিকা ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বেটসির ভগিনীপুত্র হাঙ্কস্‌কে সমবয়স্ক সহচর ও বন্ধু পাইয়া আব্রাহাম অত্যন্ত সুখী হইলেন।

কেণ্টাকিতে হেজেলের পাঠশালায় আব্রাহাম যে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এখানে গৃহে বসিয়া পিতার পুস্তকাগারের পূর্ব্বোক্ত তিনখানি পুস্তকের সাহায্যে অবসর ক্রমে তাহার উন্নতি বিধান করিতে ত্রুটি করিলেন না। অন্য পুস্তকের অভাবে এই তিন খানি পুস্তক পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলেন। শীতের দুঃসহ প্রকোপ প্রশমনের জন্য গৃহের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত, বালক লিঙ্কন রাত্রিকালে সেই প্রদীপ্ত আলোকের নিকট বসিয়া পাঠ করিতেন। কুটীরে অন্য-আলো ব্যবহৃত হইত না। নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনিয়া, দরিদ্র কৃষকগণ তদ্দ্বারা শীতের ক্লেশ দূর করিত, কাঠের নির্ম্মিত লাঠির অগ্রভাগ পোড়াইয়া বৃক্ষের বল্কল এবং প্রস্তর খণ্ডাদিতে লিখিয়া আব্রাহাম হাতের অক্ষর দুরস্ত করিতেন। শীতকালে যষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা বরফের উপর লিখা অভ্যাস করিতেন; গ্রীষ্মকালে পিতার বাগানে বসিয়া মৃত্তিকাতে লিখিয়া কালী কলম ও কাগজের অভাব দূর করিতেন!! এইরূপে তিনি পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দররূপে লিখিতেও অভ্যাস করিলেন। পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে করিতে আব্রাহাম পূর্ব্বোক্ত তিন খানি (বাইবল, ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর ও ডিলোযার্থের বানান) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি নূতন নূতন গ্রন্থ পড়িতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে সহসা মৃত্যুভয় উপস্থিত হইয়া তাঁহার জ্ঞান লাভে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে "দুগ্ধরোগ" নামে ভীষণ সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হইয়া প্রতিবেশীদিগের অনেককে অকালে কালগ্রাসে পাতিত করিল। লিঙ্কলন পরিবারের অকৃত্রিম সুহৃৎ স্পেরো সাহেব ও তাঁহার পত্নী একই সময়ে উক্তরোগের প্রবল আক্রমণে শয্যাশয়ী হইল। তথায় ৩০।৪০ মাইল দূরের মধ্যেও কোনও চিকিৎসক ছিলনা। প্রতিবেশীবর্গের সেবা শুশ্রূষা ভিন্ন কোনও রোগের যথোচিত প্রতীকার লাভ অসম্ভব ছিল। টমাস ও তাঁহার পত্নী পীড়িত স্পেরো পরিবারের যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অবশেষে টমাস তাহাদিগকে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে আনয়ন করিলেন। তাহার সমস্ত যত্ন চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিছুতেই রোগের

উপশম ঘটিল না। স্পেরো ও তাহার পত্নী কিয়ংদিনের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়া রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। টমাস স্বহস্তে কবরাধার (coffin) প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে সমাহিত করিলেন। স্পেরো পরিবারের সেবা শুশ্রূষার জন্য অনেক মানসিক উদ্বেগ ও শারিরীক কষ্ট সহ্য করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই টমাসের পত্নী সেই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। ৫ই অক্টোবর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কুটীরের মধ্যে অপরিজ্ঞাত শোকদুঃখ আনয়ন করিলেন। টমাসের ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে বিষাদপূর্ণ শোকের গভীর উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। বালক আব্রাহামের মুখে শোকের কালিমাময় রেখা অঙ্কিত হইয়া উঠিল। পরিবারের অশ্রুজলে সিক্ত ভূগর্ভে টমাসপত্নীর সুকোমল দেহ নিস্তব্ধে সমাহিত হইল। ধর্ম্মযাজকের কোনও সময়োচিত অনুষ্ঠান হইতে পারিল না।

শোকে দুঃখে বর্ষাধিক গত হইল। এলকিন্স নামে জনৈক ধর্ম্মযাজক টমাসের কুটীর হইতে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থান করিতেন। মৃত পত্নীর আত্মার সদ্গতির জন্য যথাবিহিত প্রার্থনা করিতে, টমাস তাঁহাকে আহ্বান করিতে মনস্থ করিলেন। একদা সন্ধ্যাকালে তিনি বালক আব্রাহামের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং পাদ্রি সাহেবের নিকট এক খানি অনুরোধ পত্র লিখিতে তাঁহাকে আদেশ করিলেন। দশমবর্ষীয় বালক অল্পকালের মধ্যেই পিতার আদেশ পালন করিয়া, টমাসকে স্বরচিত পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পূর্ব্বে টমাসের পরিবার ও পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহই সামান্য লেখা পড়াও জানিত না। আজ পুত্র আব্রাহামকে অনায়াসে পত্র লিখিতে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিলনা। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরক্ষর কৃষিজীবী হওয়া অপেক্ষা এরূপে পত্রাদি লিখিতে ও পড়িতে পারা শ্রেয়স্কর। টমাস হৃষ্টচিত্তে আপনার প্রতিবেশীগণের মধ্যে কুলতিলক পুত্রের এই অসাধারণ ক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার সমবয়স্ক বালকদিগের কথা দূরে থাকুক, সেই প্রদেশের এক চতুর্থাংশ যুবক ও বৃদ্ধ লোক ও এইরূপ পত্র লিখিতে পারিত না। এই ঘটনার পর হইতে দূরবর্ত্তী বন্ধুবান্ধবগণের নিকট পত্র লিখাইবার জন্য প্রতিবেশীগণ অনেক সময়ে বালক আব্রাহামের নিকট আসিত। এইরূপে তাঁহার রচনাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং হস্তাক্ষরও ক্রমে ক্রমে অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠিল।

তিন মাস পরে উক্ত অনুরোধ পত্র অনুসারে পাদ্রি এলকিন্স টমাসের বাসস্থলে অশ্বারোহণে উপনীত হইলেন। কুটীরের দুই মাইল দূরে আব্রাহাম পাদ্রি সাহেবকে দেখিয়া পুলকিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি প্রশ্নকর্ত্তা বালকের লিখিত পত্র পাইয়াছিলেন কিনা? বালক স্বয়ং এমন সুন্দর পত্র লিখিয়াছে বলিয়া পাদ্রি এলকিন্স বিস্মিত হইয়া লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বালক পাদ্রি সাহেবকে পিতার নিকট লইয়া গেল। টমাস পাদ্রি সাহেবের আগমনে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে মৃত পত্নীর প্রেতাত্মার সদ্গতির জন্য কবরস্থানে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ

করিলেন। রবিবার পাদ্রি সাহেব কবর-স্থানে প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী করুণভাব-পূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় আব্রাহামের মন সাতিশয় আকৃষ্ট ও বিগলিত হইল। বালক অতি মনোযোগের সহিত সেই বক্তৃতার সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। বাল্যকাল হইতেই আব্রাহাম সবিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন। অন্যান্যের ন্যায় কিছু পড়িয়া বা শুনিয়া তাঁহার সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধি তৃপ্তি লাভ করিত না। প্রতি কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ইহাতে তাহার বিচারশক্তি বাল্যকাল হইতেই বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়া পরিপক্বতা লাভ করিয়াছিল। এই ঘটনার পূর্ব্বে তিনি দুই তিন জন আগন্তুক পর্য্যটক পাদ্রির সরল উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন বক্তৃতায়ই তাঁহার মন এতদূর আকৃষ্ট হয় নাই। মাতৃবিয়োগের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত লিঙ্কলনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারা রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য ভ্রাতার সাহায্যে সম্পাদন করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে বালক লিঙ্কলন সমস্ত গৃহকার্য্য শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এতদূর বলবতী ছিল যে, তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, সেই কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে শিক্ষা না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৫ হইতে ১৮ ঘণ্টা কাল অনবরত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রদর্শন করেন যে, প্রতিবেশী কৃষকগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইত।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে লিঙ্কলনের পিতা টমাস পুনরায় বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বস্বামী জনসনের ঔরসজাত দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র বিধবা মাতার সঙ্গে সঙ্গে টমাসের কুটীরে আগমন করিল। তিনি সঙ্গে করিয়া বাক্স, সিন্দুক ও চেয়ার প্রভৃতি প্রভূত গৃহসজ্জা দরিদ্র স্বামীর কুটীরে আনয়ন করিলেন। এই বিবাহের নিমিত্ত টমাস কিংবা তাঁহার পুত্র কন্যা কাহাকেও কোন কালে অসুখী হইতে হয় নাই। টমাসের নব বিবাহিতা পত্নী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই বিমাতার চরিত্র গুণে লিঙ্কলন তাঁহাকে স্বীয় মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং তাহার পুত্র কন্যাদিগকে আপনার সহোদর ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতে আরম্ভ করিলেন। বালকের অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে বিমাতা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন এবং কিসে তাঁহার লেখা পড়ার সুবিধা হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি যত্নবতী হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিমাতার প্রতি লিঙ্কলনের অচলা ভক্তি অব্যাহত ছিল।

পুত্রের উন্নতির প্রতি টমাসও উদাসীন ছিলেন না। নিজের এমন অর্থসম্বল ছিলনা যে, ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া প্রিয়তম পুত্রকে পড়াইতে পারেন। কিন্তু তিনি ধার করিয়া আনিয়া পুত্রের দুর্নীবার্য্য জ্ঞান-পিপাসার তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিলেন। বিংশতি মাইল দূরে পিয়াসন নামে এক ব্যক্তি বাস করিত।

টমাস তাঁহার নিকট হইতে সুকবি বানিয়ানের বিরচিত Pilgrim's Progress নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আনয়ন করিয়া পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবিলম্বে লিঙ্কলন এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করিলেন। দ্বিতীয় বারে তাঁহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পঠিত হইলে সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান Esop's Fable তাঁহার হস্তগত হয়। লিঙ্কলন এই দুই খানি পুস্তক পাঠে এতদূর নিবিষ্ট হইয়া উঠিলেন যে, আবশ্যকীয় গৃহ ও কৃষিকার্য্যে নিতান্ত অমনোযোগী হইয়া পড়িলেন। এই জন্য টমাস সময় সময় অলস ও অমনোযোগী বলিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামজের লিখিত ওয়াসিংটনের জীবনচরিত ও Robinson Crusoe তাঁহার হস্তগত হয়। রবিনসন ক্রুসো পড়িয়া তিনি ডিফোর রচনা ও বর্ণনার চাতুর্য্যে মুগ্ধ হন। পিতার কুটীর হইতে দুই মাইল দূরে ইতিমধ্যে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডরসি নামক একজন নামমাত্র শিক্ষক বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের অধ্যাপনা কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। লিঙ্কলন এখানে বানান ও পাটীগণিত শিক্ষার নিমিত্ত ভর্ত্তি হইলেন। হাতের লেখা, বর্ণবিন্যাস, রচনা ও পুস্তক পাঠে লিঙ্কলন শিক্ষক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিলেন না। কয়েক সপ্তাহ পরেই অশিক্ষিত শিক্ষকের দোষে বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও দুইটী একবিধ ক্ষণস্থায়ী পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রফোর্ড নামক অপর একজন শিক্ষিত ব্যক্তি (পূর্ব্বে ডার্সির পাঠশালা যেখানে ছিল, ঠিক সেই স্থানে একটী পাঠশালা খুলিলে, লিঙ্কলন শিক্ষার্থী হইয়া সেই পাঠশালায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তিনি লিঙ্কলনের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতার নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অতি দুরূহ ও কঠিন বলিয়া তিনি বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রকেই রচনা শিক্ষা দিতেন না, কিন্তু লিঙ্কলনের মানসিক উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইয়া ক্রফোর্ড তাঁহাকে গদ্য ও পদ্য রচনা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে তিনি ক্রফোর্ডের নিকট বক্তৃতা দেওয়াও অভ্যাস করেন। তাঁহার এরূপ প্রখরা স্মৃতিশক্তি ছিল যে অধীত পুস্তক ও শ্রুত বক্তৃতা হইতে অনেক অংশ অবিকল বলিয়া বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র ও সহচরদিগকে অনেক সময়ে আমোদিত করিতেন। তিনি জীবজন্তুর প্রতি কখনও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদিগের এবম্বিধ নিষ্ঠুর কার্য্যে বাধা দিতেন এবং অনেক সময়ে তাহাদের অনেককে নিষ্ঠুরতার জন্য অতি তীব্র ও মর্ম্মভেদী তিরস্কার করিতেন। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার একান্ত অনুচিত এই বিষয়ে তিনি এক সুন্দর ও সবল বক্তৃতা দিয়া স্বীয় হৃদয়ের অপরিসীম মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

একদা লিঙ্কলন বিদ্যালয়ে যে হরিণ শাবক ছিল, তাহার শৃঙ্গ দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তিনি সরলভাবে আপনার দোষ শিক্ষক ও অপরাপর ছাত্রগণের নিকট প্রকাশ করিয়া সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন।

ওয়াসিংটনের ন্যায় তিনি অসত্য ও মিথ্যাকে বাল্যকাল হইতেই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। পাঁচ বৎসরের বয়সের সময় ওয়াসিংটন পিতার বাগানে প্রবেশ করিয়া বালসুলভ চপলতার উপরোধে পিতৃরোপিত চেরিবৃক্ষ হস্তস্থিত নবনির্ম্মিত কর্ত্তরিকা দ্বারা ছেদন করেন ও অকপটে পিতার নিকটে আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া সত্যনিষ্ঠ পিতাকে পরিতুষ্ট করেন। লিঙ্কলনের সত্যনিষ্ঠার তাঁহার শিক্ষকও সম্ভবত বিশেষ তুষ্টি লাভ করেন।

লিঙ্কলন শুদ্ধরূপে বর্ণবিন্যাস করিতে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কেহই কখনও মনে করিত না যে, তিনি বানানাদি সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইবেন। এই বিষয়ে অতি কৌতুকাবহ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একদা শিক্ষক ক্রফোর্ড বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে "de-fied শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ fide, কেহ fyd, কেহ fyde এবং কেহ fyed বলিয়া বানান করিল। কেহই শব্দটী শুদ্ধরূপে বানান করিতে পারিল না দেখিয়া, শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তাহাদিগকে সারাদিন কয়েদ থাকিবার আদেশ করিলেন। সেই শ্রেণীতে রাবি নাম্নী বালিকা অধ্যয়ন করিত। লিঙ্কলন তাহার প্রতি একটু অনুরক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া ছাত্রদের দুর্গতি দেখিয়া হাসিতেছিলেন। রাবির দিকে চাহিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া শিক্ষকের অজ্ঞাতসারে আপনার একটী চক্ষুতে (eye) অঙ্গুলী রাখাতে চতুরা বালিকা বুঝিতে পারিল যে, শেষোক্ত defyed শব্দের y অক্ষরের স্থলে i হইবে। লিঙ্কলনের ইঙ্গিত অনুসারে বালিকা শব্দটী শুদ্ধরূপে বানান করিয়া শিক্ষক ও সহাধ্যায়ী বালকগণকে কয়েদ-মুক্ত করেন।

এইরূপ অল্প কালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে লিঙ্কলনের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। আপনার মধুর উপদেশ, বচন বিন্যাস ও অন্যান্য নানা উপায়ে তিনি সহচর ছাত্রদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতেন। তাহাদের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে আপোষে তাহা মিটাইয়া দিতেন। এই জন্য ছাত্রগণ 'শান্তি-সংস্থাপক বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিত ও সবিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিত। তাঁহার রাজপদ প্রাপ্তির অনতি-বিলম্বে যুক্তরাজ্য যে ঘোরতর গৃহবিবাদে দাসত্ব প্রথা লইয়া (১৮৬১-৬৪ খৃঃ) দগ্ধীভূত হয়, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণে সমর্থ হন নাই এবং আপনার 'শান্তিসংস্থাপক' নামের সার্থকতা বিধান করিয়া বিনা রক্তপাতে স্বদেশের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হন নাই। কারণ স্বাধীনতার চিরকলঙ্ক দাসত্ব প্রথা প্রচলিত রাখিয়া আমেরিকাকে নরকের গভীর অন্ধকারে চির কালের জন্য নিমজ্জিত করিতে, দক্ষিণ দিগস্থিত কেরোলিনাদি প্রদেশ সকল বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিল। তিনি উত্তরস্থ দাসত্ব প্রথার চির-বিরোধী প্রদেশ সমূহের পৃষ্ঠ-পোষকতায় আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে সমূলে দাসত্ব উন্মুলিত করিয়া ৬০ লক্ষ কৃষ্ণ-বর্ণ দাসকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক বর্ণ-ভেদের বৈষম্য দূরীভূত করেন, এবং সর্ব্ব-তোভাবে সাম্য মৈত্রী ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমেরিকাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার লীলাভূমিতে পরিণত করেন।

চারি বৎসর ঘোরতর যুদ্ধের পর দক্ষিণস্থ প্রদেশ সকল পরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র ন্যায় ও সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ক্রোধ ও জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হইল না। যে দেবোপম মহাপুরুষ আমেরিকাকে ন্যায় ও সাম্যের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দাসত্ব প্রথার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হইতে চিরকালের জন্য স্বদেশের উদ্ধার সাধন করেন, অবশেষে তাঁহার অমূল্য হৃদয়শোণিত পান না করিয়া সেই পাশবিক জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট ব্যতীত এমন মহাপুরুষ আর কয়জন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পদরেণুতে পৃথিবীকে পবিত্রীকৃত করিয়াছেন এবং চিরদুঃখী ও দরিদ্রের উদ্ধারার্থ আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা জানি না।

লিঙ্কলন ক্রফোর্ডের নিকট ভদ্র সমাজে রীতি নীতি শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় গমনের অল্পকাল পরেই তিনি ত্রৈরাশিক ব্যতীত পাটীগণিতের সমুদায় বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। শিক্ষকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি ত্রৈরাশিক ও সমানুপাত আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ডেভিড টার্নহাম লিখিয়াছেন যে, "শিক্ষকদিগের যতটুকু বিদ্যা থাকিত তাহা শিক্ষা না করিয়া আব্রাহাম কখনও কোন স্কুল পরিত্যাগ করেন নাই।"

ক্রফোর্ডের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্কলন তিন বৎসর পর্য্যন্ত গৃহে বসিয়াই অতি যত্নের সহিত, দৈবাৎ যখন যে পুস্তক পাইতেন, তাহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে ৫ মাইল দূরে ছোয়ানী নামক একজন শিক্ষক একটী বিদ্যালয় খুলিলে তিনি তাহাতে কয়েক দিন পাঠ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে ছাত্রজীবন সমাপন করেন। ক্রমে ক্রমে ৫টী পাঠশালায় লিঙ্কলন মোটে এক বৎসরেরও ন্যূন সময় অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!। আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেণ্টকে এইরূপ সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারবি।

বাল্মীকি, ব্যাস, জগতের আদর্শ কবি। তাঁহাদের পরে নাম করিতে হইলে, কালিদাসই প্রথম চিন্তাপথে উপস্থিত হন; তার পর ভারবি। ভারবির অন্য কাব্য ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় অতি উচ্চ দরের মহাকাব্য। ইহার কবিতা গুলি যেমন মাধুর্য্যময়, তেমনই ভাবপূর্ণ। বৃথা অতিশয়োক্তি দ্বারা তিনি স্বকীয় কাব্যকে দূষিত করেন নাই। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় যেমন কুশলী, মানবের চিত্তবৃত্তি পরিজ্ঞানেও ততোধিক কৃতী! তাঁহার নির্দ্দোষ কবিতার নানা গুণ সত্বেও পূর্ব্বতন সমাজে যে তিনি তত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই; তাহা মন্তব্য দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে! প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

তাবদ্ভাভারবের্ভাতি, যাবন্মাঘস্তনোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ কচ ভারবিঃ॥

ইহা বোধ হয়, যমক ও অনুপ্রাসপ্রিয়

পাঠকদিগের উক্তি হইবে; নতুবা ভাবের পক্ষপাতী পণ্ডিতসমাজ, কদাচ তাঁহাকে মাঘ ও শ্রীহর্ষের নিম্নে আসন প্রদান করিবেন না। তাঁহার গভীরার্থ কবিতা গুলি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হয়। তাঁহার লেখনী কখনও বীর-রসে প্রমত্ত হইয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে, কোন স্থানে বা আদিরসের কুসুম-সৌরভ বিতরণ করিয়া যুবজনের চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন করিয়াছে, কোথাও শান্তি-সলিল প্রক্ষেপ দ্বারা বীর-হৃদয়েও বৈরাগ্য জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছে। মানবহৃদয়ের মনস্বিতা, তেজ, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ গুলি যেন তাহার সুপরীক্ষিত ছিল, তাই যেখানে যে ভাবটী সুসঙ্গত, সেখানে সেইটী বিন্যাস করিয়াছেন।

তাঁহার কাব্যের নায়ক নায়িকার গুণ সমূহ চর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে ইতিবৃত্তটা প্রকটিত করা উচিত। পাণ্ডবগণ পাশক ক্রীড়ায় পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, বনে আসিয়াছেন। সর্ব্বদা বিপক্ষদিগের কথা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরুক। শত্রুরা কিরূপ রাজ্য-শাসন করিতেছে, জানিবার জন্য দ্বৈতবনে অবস্থান কালে একজন বনেচর পাঠাইয়াছিলেন। সে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সুযোধনের প্রজাপালনের অতি সুশৃঙ্খলা বর্ণন করিল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-গৃহে গিয়া, ভ্রাতাদের নিকট সমুদয় বলিলে, প্রথম যাজ্ঞসেনী, পরে বৃকোদর অতি ওজস্বিভাবে নিজ দুঃখ জ্ঞাপন পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজও নীতিযুক্ত বাক্য দ্বারা যখন প্রোক্ত বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সেখানে উপনীত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া তপস্যার আদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশে, ব্যাস-নির্দ্দিষ্ট বনেচরের সহিত হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিরাত, ইন্দ্রকিল পর্ব্বত প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। অর্জ্জুন সেখানে তপস্যা আরম্ভ করিলে, পর্ব্বতবাসীরা দেবরাজকে সংবাদ প্রদান করিল। দেবরাজ, অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ পরীক্ষার জন্য অপ্সরাদিগকে পাঠাইলেন। কিন্নরীগণ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেল। তখন স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া অর্জ্জুনকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু পার্থ, বৈরশোধন না করিয়া মুক্তিও শ্রেয়স্কর নহে, বোধ করিয়া ইন্দ্রের বাক্যে সম্মত হইলেন না। ইন্দ্র আত্ম-পরিচয় দিয়া মহাদেবকে আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। অর্জ্জুন পুনরায় কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। মুনিগণ মহাদেবকে অর্জ্জুনের তপঃপ্রভাবের বিষয় বলিলেন। পরে কিরাতরূপী মহাদেবের সহ অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং মহাদেবকে জানিতে পারিয়া অর্জ্জুন স্তব করেন এবং মহাদেবের প্রসাদ স্বরূপ পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়া প্রত্যাগত হন।

এই মহা কাব্যের নায়ক, অর্জ্জুন। আলঙ্কারিকেরা নায়কের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে অর্জ্জুনকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলা যাইতে পারে, কারণ শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, উদারতা প্রভৃতি নায়কের যে সকল সাধারণ গুণ উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ধীরো-

দান্ত নায়ক, আরও কতক গুলি গুণে মণ্ডিত, সে সকল এই যথাঃ— ত্যাগশীলতা, কৌলীন্য, দক্ষতা, তেজস্বিতা, পাণ্ডিত্য, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি। অর্জ্জুনে এই সকল গুণের কোনটী কিরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত কবিতা গুলি দ্বারা তাহা যতকটা বঝা যাইতে পারে। বনেচরেরা দেবরাজের নিকট গিয়া অর্জ্জুনের প্রকৃতি বর্ণন করিতেছে। যথাঃ—

উরুসত্ত্বমাহ বিপর্য্যয়নতা,
পবনং বপুঃ প্রণয়তীব জগৎ,
শমিনোঽপি তস্য নবসঙ্গমনে
বিভুতানুসঙ্গিভয়মেতি জনঃ। ৩৫। ষষ্ঠ সর্গ।

আয়াস করিতেও শ্রমবোধ নাই, ইহাতেই তাঁহার মহাসত্ত্বতা প্রকটিত হইতেছে, আর আকার দেখিলেই জগৎশালী বলিয়া বোধ হয়। যদিও শান্তিপ্রিয় তপস্বী, কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম সমাগমে, লোক একটা ভয় প্রাপ্ত হয়, উহা প্রভুত্বের স্বাভাবিক সহচর।

প্রভবতি ন মনঃ কদম্ববায়ৌ,
মদমধুরেচ শিখণ্ডিনাং নিনাদে।
জনইব নধৃতেশ্চ চাল জিষ্ণুঃ,
নহি মহতাং সুকরঃ সমাধিভঙ্গঃ॥ ২৩।
দশম সর্গ।

কদম্ব সংসর্গী বায়ু প্রবাহিত হইলে এবং মদমত্ত ময়ূরের মধুর নিনাদে, অর্জ্জুনের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল না, সামান্য জনের ন্যায় তিনি ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হয়েন নাই। যেহেতু মহান্ ব্যক্তিদের সমাধিভঙ্গ, সুসাধ্য নহে। আবার অপ্সরাগণ অর্জ্জুনকে নানারূপে প্রলোভিত করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলনা, তখন বলিতেছে,—

যদি মনসি শমঃ কিমঙ্গচাপং,
শঠ বিষয়াস্তব বল্লভা ন মুক্তিঃ।
ভবতু দিশতি নান্য কামিনীভ্যঃ,
তব হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরাবকাশং॥৫৫। ১০ম সর্গ।

তোমার মনে যদি শান্তিই থাকিবে, ওহে তবে ধনু কি জন্য? হে শঠ। বিষয়ই তোমার প্রিয়, মুক্তি তোমার স্পৃহণীয় নহে। তাহা হউক, তোমার কোন হৃদয়েশ্বরী তোমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, সেই অন্য কামিনীদের অবকাশ প্রদান করিতেছেনা। আবার তাপসরূপী সহস্রলোচনের উপদেশে সম্মত না হইয়া স্থির অধ্যবসায় অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

বিচ্ছিন্নাভ্রবিলায়ং বা বিলীয়ে নগমূর্দ্ধনি।
আরাধ্য বা সহস্রাক্ষমযশঃ শল্যমুদ্ধরে॥ ৭৯।
১১শ সর্গ।

বায়ুতাড়িত অভ্র যে প্রকার আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই পর্ব্বতে লয় পাইব, অথবা সহস্র-লোচনকে আরাধনা করিয়া, অযশশল্য উদ্ধার করিব।

আবার যে সময় বিদ্ধ বরাহের অঙ্গ হইতে, শর লইয়া অর্জ্জুন প্রত্যাগত হইতেছেন, সে সময় ছদ্মরূপী মহাদেবের দূত কিরাত আসিয়া, এই বান আমার প্রভুর, এই কথা বলায় অনেকক্ষণ উভয়ে বাদানুবাদ হইল, তার পর অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

অসিঃ শরা বর্ম্ম ধনুশ্চ নোচ্চকৈঃ,
বিবিচ্য কিং প্রার্থিতমীশ্বরেণতে।
অথাস্তি শক্তিঃ কৃতামবযাচ্ঞয়া,
নদূষিতঃ শক্তিমতাং স্বয়ং গ্রহঃ॥২০।১৪শ সর্গ।

"খড়্গ, বান, কবচ, উৎকৃষ্ট ধনু, ইহার মধ্যে কোন বস্তু তোমার প্রভু বিবেচনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। অথবা যদি শক্তি থাকে, যাজ্ঞা করিবা প্রয়োজন

কি? বীরদিগের স্বয়ং গ্রহণ, নিন্দনীয় নহে।” ইহা কি অল্প বিক্রমের পরিচয় দিতেছে। কোথায় সুন্দর হিমালয় শিখর, কোথায়ইবা সহচর পর্যন্ত শূন্য, নিসহায়, একাকী অর্জুন। কোন্ ব্যক্তি শত্রু-বেষ্টিতস্থানে এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে?

নায়কের বিষয় যাহা কিছু উদ্ধৃত হইল, ইহাতেই নায়কোচিত গুণের উৎকর্ষতা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। এখন এই কাব্যের নায়িকা দ্রৌপদী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির মালতী কি সীতা, বাণভট্টের মহাশ্বেতা অথবা কাদম্বরী, হর্ষদেবের সাগরিকা, কিংবা শ্রীহর্ষের দময়ন্তী যে ধাতু দ্বারা নিম্মিত, দ্রৌপদী সে উপাদানে গঠিতা নহেন। প্রোক্ত নায়িকারা, কেবল কোম লতারই আধার, কিন্তু ভারবির দ্রৌপদীতে কর্ত্তব্যবুদ্ধির কঠোরতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ মান। তিনি বীরের উপযুক্ত ভার্য্যা, রাজ্যের উপযুক্ত রাজ্ঞী, প্রেমিকেরও উপযুক্ত প্রণয়িণী। যখন বনেচর দুর্য্যোধনের রাজ্য শাসনের চরমোৎকর্ষ বর্ণন করিয়া গেল, তখন দ্রৌপদী বলিতেছেন,—

ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোচিতং,
ভবত্যধিক্ষেপ ইবানু শাসনং।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়যন্তিমাং
নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ॥২৮। প্রথম সর্গ।

যদিও ভবাদৃশ বীরগণের প্রতি স্ত্রীজন কর্ত্তৃক উপদেশ অনুচিত এবং তিরস্কার তুল্য, তথাপি প্রমদাজনের লজ্জাভঙ্গ জন্য যে মানসিক ব্যথা, তাহাই আমাকে বলিবার জন্য প্রবৃত্ত করিতেছে।

অবন্তি মে তর্হি মনস্বি গর্হিতে,
বিবর্ত্তমানং নরদেব বর্ত্মনি।
কথং ন মন্যুর্জ্বলয়ত্যুদীরিতঃ,
শমীতরুং শুষ্কমিবাগ্নিরুচ্ছিখঃ॥৩২। ১ম সর্গ।

হে নরদেব। আপনি মনস্বিজন কর্ত্তৃক বিগর্হিত পথের অনুসরণ করিয়াছেন। উদ্ধ-শিখা বহ্নি বিশুষ্ক শমীতরুর ন্যায়, প্রদীপ্ত ক্রোধানল আপনাকে কেন দগ্ধ করিতেছে না।

অবন্ধ্যকোপস্য বিহন্তুরাপদাং
ভবন্তি বশ্যাঃ স্বয়মেব দেহিনঃ।
অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা
ন জাতহার্দ্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ॥৩৩। ১ম সর্গ।

যাহার কোপ বন্ধ্যা প্রাপ্ত হয় না, প্রাণিগণ আপনা হইতেই সেই আপদ নিবারণক্ষম ব্যক্তির বশতাপন্ন হয়। ক্রোধ-শূন্য হইলে, কি শত্রু কি মিত্র কেহই আদরও করে না।

বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ,
সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ
পরৈরপর্য্যাসিতবীর্য্যসম্পদাং,
পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাং॥৪১।১ম সর্গ।

যেহেতু শত্রু কর্ত্তৃক আপনার এই দশা হইয়াছে, তজ্জন্যই আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত। বিপক্ষ দ্বারা যাঁহাদের বলবীর্য্য বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাদৃশ অভিমানী ব্যক্তিদের (যুদ্ধ করিয়া) পরাভবও উৎসব বলিতে হইবে।

পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ,
সুদুঃসহম্প্রাপ্য নিকারমীদৃশং।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিং,
নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা॥ ৪৩।

তেজস্বীদিগের অগ্রগণ্য, আপনাদের ন্যায় যশোধন ব্যক্তিরাও যদি এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ অবলম্বন করেন, তবে দেখিলাম, মনস্বিতা আশ্রয়-শূন্য হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিল।

এই মহাকাব্য বীররস প্রধান, আদি ও শান্তিরস অপ্রধানরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ঋতু, শৈল, বন, যদ্ধপ্রযান, মন্ত্রণা প্রভৃতি যাহা আবশ্যক, কবি সে সমুদয়ই অতি সুচারুরূপে ইহাতে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের সময় হইতে যে যমক অনুপ্রাস ও চিত্রময় কবিতা লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভারবি, যমক ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে তত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই, এ বিষয়ে মাঘভট্ট অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। চিত্রময় শ্লোক রচনায় মাঘ ও ভারবি উভয়েই সমানধর্ম্মা। নিম্নে ভারবিকৃত একটী চিত্রময় কবিতা উদ্ধৃত হইল। এই শ্লোকটী যে দিক হইতে পাঠ করা যাইবে, তাহাতে তুল্য আকার ও তুল্য অর্থ প্রকটিত হইবে।

[সর্ব্বতোভদ্র।]

দে বা কা নি কা বা দে
বা হি কা স্ব কা হি বা
কা কা রে ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ভ স্ব নি

১৫ শ সর্গ-৩৫ শ্লোক।

এ সকল গেল পুরাতন সংস্কার, কিন্তু একটী বিষয়ে ভারবি আধুনিক পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত অভিযুক্ত। তিনি অনুচিত আদিরস বর্ণনা দ্বারা যে কয়েকটী সর্গ কলুষিত করিয়াছেন, উহা না করিলে তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য হইত। তাঁহার ন্যায় আর একজন মনস্বী কবি ভবভূতি উত্তর চরিতাদি নাটকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলেও অতি সাবধানে আদিরসের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনবগুণ্ঠন আদিরস বর্ণনা করা প্রাচীন কবিদিগের একটী মহাদোষ। মাঘভট্ট ও ভারবির অনুকরণ করিতে বসিয়া নিতান্ত অশ্লীল বর্ণনা দ্বারা শিশুপাল বধের ৪টী সর্গ নিতান্ত অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক, এই দুই একটী সামান্য দোষ মহাকবি ভারবির পক্ষে তত কলঙ্কের বিষয় নহে। ইহা পাঠকগণ উপেক্ষাও করিতে পারেন। কারণ তাঁহার এই নারিকেল ফলসদৃশ কবিতা যদি আমরা অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাদ্বারা বহু উপকারের সম্ভাবনা, কিন্তু উপরে উপরে পাঠ করিলে অর্থাৎ আর্থর গভীরতারূপ ত্বক্ ভেদ না করিতে পারিলে ভারবির রসে একান্তই বঞ্চিত হইতে হয়। ভারবির জীবনবৃত্ত জানিবার জন্য অনেকের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। কিন্তু তাঁহার ইতিবৃত্ত অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমরা সেই তিমির ভেদ করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, বারান্তরে উহা প্রকটিত করা যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার। *

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ যেরূপ পরাক্রান্ত ও দিগন্তব্যাপী, তাহাতে বোধ হয়, অদূরদর্শী লোকেরা মনে করিবে, পরিশেষে খ্রীষ্টধর্ম্মই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে পরাভূত

* নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাবের পর হইতে আরম্ভ।

করিবে; বস্তুতঃ পৃথিবীর মহাখণ্ড চতুষ্টয়ে খ্রীষ্টীয় প্রচারক দ্বারা তাঁহাদিগের মণ্ডলী সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং অসংখ্য নর নারী তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া উক্ত ধর্ম্মেরই জয় বিঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীর এ অভিনয়, সভ্যতা ও জ্ঞানোন্নতির বিরোধী কি না, জানি না, ধর্ম্ম জানেন, আর সমাজতত্ত্বদর্শী লোকেরা বলিতে পারেন। ঈশ্বর স্রষ্ট সকলেই, কে তাহা অস্বীকার করিবে? কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ইহুদি কি আর্য্যজাতীয় ধর্ম্ম, তন্নিরূপণ কেহই করেন নাই। আমি তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু ইহা কতদূর প্রতিপন্ন করিতে পারিব, বলিতে পারি না।

খ্রীষ্টীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের পরম বিড়ম্বন বাইবল; বাইবল বিজাতীয় শাস্ত্র। ইহাতে খ্রীষ্টোপাসকগণের যেরূপ সত্যদৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, আমার সে চক্ষু নাই, সে জ্ঞান বুদ্ধি নাই, সেই হেতু ইহুদি শাস্ত্রকে ঈশ্বরাদিষ্ট বলিতে প্রাণে আঘাত লাগে। খ্রীষ্ট কে? তিনি গোলকের ঈশ্বর, অথবা যিরুশালমের মেসায়া? তিনি আর্য্য কি ইহুদি? মুনি কি যিহুদা দেশীয় যাজক? তিনি কে? হিন্দুস্থানী স্থিত বাক্য প্রসিদ্ধ আছে যে, "আগে দর্শন চালি, পিছে গুণ বিচারি", মথি লিখিত পুস্তকের একবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, যিশু যিরুশালম্ নগরীস্থ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ পোদ্দারদিগের মুদ্রার আসন এবং কপোত-ব্যবসায়ীগণের আসন উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আমার পিতার প্রার্থনা-গৃহ দস্যুর গহ্বর করিও না।" বাইবলে খ্রীষ্টের এরূপ অসৌম্য ভাব আর কদাপি দৃষ্ট হয় না; তাঁহার এই ভাব দৃষ্টে আপাততঃ তাঁহাকে যিহুদীয় রাব্বুনি বলিয়া ধরিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ। সমুদ্র-তরঙ্গমালা-বেষ্টিত দ্বীপে, মহা অরণ্যানি মধ্যে, সুবিশাল পর্ব্বতময় স্থানে, সুদীর্ঘ জনপদে অথবা রাজবর্ত্মে যে খ্রীষ্টের নাম প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাঁহার পরিচয় স্থল বাইবল। অপর স্থল পালিষ্টিন্ দেশ। তিনি পিতা মাতার সহিত সেই দেশে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নব ধর্ম্ম ও নব দীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর পাপ ও সন্তাপ হরণ করেন। সেই পালিষ্টিনের বৃত্তান্ত মধ্যে খ্রীষ্টের কার্য্য কলাপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত ভুবন ব্যাপিয়া যাঁহার বিপুল মাহাত্ম্য সুবিস্তৃত আছে, তিনি যেই হউন, ভূমণ্ডলের এক জন অদ্বিতীয় মহাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি পালিষ্টিন কি ভারতবর্ষ, পুরাকালিক আঁধার-স্তর ভেদ করিয়া তাহা নিরূপণ করিতে না পারিলে জগতের অন্ধকার কোন ক্রমেই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সমালোচকগণ তৎসম্বন্ধে নানা রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া বিহিত অনুসন্ধানে অনুরক্ত হইয়াছি, কিন্তু মনুষ্য ভ্রমাদি পরিশূন্য কখনই নহে, এই হেতু আমার সে ভ্রম বিজ্ঞ লোকেরা উপেক্ষা করিবেন, কোন বিষয় সত্য হইলে তাহা ইতিবৃত্তেরই মহা মঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। কিন্তু আমার সে আশা অতি অল্প, কারণ পুরাকালিক বিশ্বাসের কথা মনে উদয় হইলে আমি একেবারে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়ি; বাইবলের মতে মনুষ্য ও ঈশ্বরে এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, ঈশ্বর মনুষ্যের সহিত কথা কন, মনোগত ভাব তাহাদিগকে জ্ঞাপন করেন,

এই বিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণরূপেই বাইবল গঠিত হইয়াছে। এপ্রকার বিশ্বাস পাশ্চাত্যে যেরূপ সাধারণ, ভারতে তত নহে, এতদ্দেশীয় দর্শন শাস্ত্রই তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে।

"ইচ্ছায় আপন, করিলেন সৃজন,
আপনি গোপন তা।"

ইউরোপের দর্শন শাস্ত্র নাই, পূর্ব্বে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি, এতদ্দেশীয় দর্শন লইয়া ইউরোপ দার্শনিক, নবজীবনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী পাঠে সম্যক বুঝিতে পারিবেন। হিব্রু জাতির দর্শন শাস্ত্র ছিল না, দর্শনের মূল পদার্থ গুলিও বাইবলে বিচারিত হয় নাই। এক ঈশ্বর মূল পদার্থ বলিলে দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না। যাহাই হউক, পাশ্চাত্যগণ বাইবল্-বিশ্বাস বশত, স্বর্গীয় বিশ্বাস অপেক্ষা শাস্ত্রীয় বিশ্বাসকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই জন্য তদ্বিরুদ্ধে কোন লোকেই তর্ক করিতে ইচ্ছা করেন না। আমি অগ্রে বলিয়াছি যে, খ্রীষ্টোপাশকেরা যে চক্ষে বাইবলের সত্য সন্দর্শন করেন, আমার সে চক্ষু নাই। এ পাপ চক্ষে যাজকগণের ভ্রম-কল্পিত কথা দৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় বিশ্বাসে ভ্রম আছে, শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে ভ্রম নাই, এ কথা যদি আমি বলি, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টা বিশ্বস্ত এবং কোন্‌টা অবিশ্বাস্য, বাইবলের সম্যক আলোচনা ভিন্ন কি হটাৎ বলা যাইতে পারে? আমি এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নির্দ্ধারিত মতে উপনীত হইতে পারিলাম না। আমার সামান্য বিবেচনায় এই মাত্র বোধ হয় যে, বাইবল-ভক্ত লোকেরা শাস্ত্রীয় বিশ্বাস স্বর্গীয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরে প্রভেদ আছে কি? এস্থলে শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের আর একটি তেজের কথা হইল, সুতরাং শাস্ত্রানুমোদিত বিশ্বাসের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের জন্মভূমি অর্থাৎ তাহার কার্য্যের পরিচয় স্থল পালিষ্টিনের বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে অবতারণা করিতেছি। খ্রীষ্টের মৃত্যুর ষাইট বৎসর মধ্যে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিপি সমাপ্ত হইয়াছিল, এই ষাইট বৎসরের ভিতর তাঁহার গোরস্থানের, ক্রুশের, জন্মস্থানের ও হত্যাস্থানের কোন বিবরণ ইবাঞ্জিলিষ্টগণ নিউটেষ্টমেণ্টে প্রকাশ করেন নাই। লোকে কি তখন খ্রীষ্টজীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা-স্থানের কোন তত্ত্বই রাখিত না, অথবা জীবনচরিত-লেখকদিগের ঐ সকলের উপর মোটেই ভক্তি ছিল না? দাউদের মৃত্যু বিষয়ে পিতর ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ মৃত্তিকাগত হইয়াছে, কিন্তু তিনি অদ্যাপি আমাদের প্রাণে কবরস্থ আছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যু বিষয়ে পিতরের শোকর্দ্রহৃদয় হইতে একটিবার ঐরূপ শোকোচ্ছ্বাস উদ্ভূত হয় নাই। পৌল খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং স্বর্গারোহণ বিষয়েই প্রায় ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যু বা স্বর্গারোহণ-স্থানের বিশেষ বৃত্তান্ত একেবারে উল্লেখ করেন নাই। ইঁহারা কি তবে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ ঘটনাস্থান গুলিকে ভক্তি করিতেন না? অথবা তৎকালে লোকের ঐ সকল স্থানের প্রতি ভক্তি ছিল না? অথবা পালিষ্টিনে মোটেই খ্রীষ্টের কবর ছিল না? এই সকল প্রমাণ দ্বারা যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, উপরোক্ত-

সময়ে উহাদের প্রতি লোকের কোন আনুগত্য ছিল না, তখন উহাদের সত্যত বিষয়ে কি প্রতিপাদন হইতে পারে? গল গথা অটলাণ্টিক মহাসাগরে কিম্বা ভুটানে, এ পাপ প্রশ্নের মীমাংসা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা কখনই প্রতিপন্ন হইবে না। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র এ সম্বন্ধে নীরব।

আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিয়াছিলেন? বাইবেলে কেবল আস্তাবলে জন্মের উল্লেখ আছে। অগষ্ট কৈশরের অনুমতিক্রমে সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের মনুষ্য গণনা হইয়াছিল, সিরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা সাইরিনিয়াস্ সেই হেতু লোক দিগকে আপন আপন নগরে যাইতে আদেশ করেন, মেরী ঐ জন্য বেথ্লেহেমে নীত হইয়াছিলেন, কিন্তু পান্থাবাসে স্থানাভাব জন্য মেরি আস্তাবলেই সন্তান প্রসব করেন। বাইবলের এ ব্রহ্ম-বাক্য খ্রীষ্টোপাসক মাত্রেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু পরে প্রদর্শিত হইবে, এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টোপাসকগণের কেমন মতভেদ আছে। সেই হেতু বলিতেছি, খ্রীষ্ট জীবদ্দশায় পালিষ্টিনের কোথায় কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। বাইবলের মধ্যে যাহার নিদর্শন নাই, পালিষ্টিনে আবহমান কাল খ্রীষ্টোপাসকদিগের তাহাতেই পরম বিশ্বাস আবদ্ধ রহিয়াছে। খ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন, তাঁহার কবর ইহুদিদিগের স্বদেশে বর্ত্তমান আছে, ইহা আপনিও জানেন, আমিও শুনিয়াছি, কিন্তু তিনি যে স্থানে ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, বাইবেলে সে স্থানের নির্দ্দেশ কি আছে? এ সমস্ত স্থান বিদেশীয় যাজকেরাই নিরূপণ করিতে জানেন। এক্ষণে ঐ দেশ মুসলমানদিগের হস্তগত। খ্রীষ্ট-কবরের প্রতি লোকের অসীম ভক্তি জন্য বহুদূরবর্ত্তী দেশ হইতে অসংখ্য তীর্থযাত্রী এবং ভ্রমণকারী ঐ দেশে উক্ত কবরের উপর প্রার্থনা করিতে আইসে। কিন্তু প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেতিহাসে এ সকল স্থানের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই (১) এই হেতু যোধিয়া দেশ অযোধ্যা কি জুডিয়া? ইহা আণ্ডামান দ্বীপে, কি ভারতবর্ষে, নিশ্চয় কিরূপে বলিব?

এক হাজার পাঁচ শত বৎসর যিরুশালেম মূর্খতা, কুসংস্কার ও প্রতারণার বাস্তভূমি হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রীষ্টীয় শতাব্দে খ্রীষ্টোপাসকগণের পালিষ্টিনে কোন প্রতিপত্তি ছিল না। উপাসনা গৃহাদি যে ছিল না, ইহা অসম্ভব কথা নহে। (২)

চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দে রোমের সম্রাট কনষ্টান্টাইন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিপোষক হইয়া ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন, এই সূত্রে জানা যায় যে, উক্ত সময়ে ইউরোপের মধ্যে একটা নূতন ধর্ম্মতন্ত্রের পত্তন হইয়াছিল, এবং রোমীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর যাজকগণের অপরিসীম প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রোমে কোন্ সময়ে বা কাহা কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পেটৌ (Petou) নামা জনৈক লেখক রোমীয় বিসপগণের কাল-নিরূপক একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। রোমীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিবৃত্তেও লিখিত

(1) "That they erected their churches on places consecrated by miracles, and especially on Calvary and over our Lord's *Sepulchre*, is a *more questionable* position. There is at least no trace of it in the New Testament, nor in the history of the primitive church." Osborn's Holy Land, VII.

(2) "That for the lapse of more than fifteen centuries, Jerusalum has been the abode not only of mistaken piety, but also of credulous superstition, not unmingled with pious fraud." Ibid VIII.

হইয়াছে যে, পিতর রোমের প্রথম বিশপ ছিলেন। সাতাম্ন খ্রীষ্টাব্দে শত্রুদ্বারা তিনি নিহত হইলে ইটুরিয়াস্থ লিনিয়স্ তৎপদে নিয়োজিত হন। তৎপরে ক্লেমেন্স রোমান্ রোমের বিশপ হন। যাজকদিগের এ ইতিবৃত্তের মূল নিরাকৃত হওয়া অতি অসম্ভব।

৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তাইনের মাতা হেলেনা সর্ব্বাদৌ খ্রীষ্টের প্রসিদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধীয় স্থান নিরূপণে সচেষ্টিতা হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে নানা বিদেশীয় যাজকগণ পালিষ্টিনে আসিয়া ঐ কার্য্যে যোগ দেন। ঐ সময়ে উক্ত বিদেশীয় যাজকগণ অধিকাংশ মূর্খ ছিল। বিশেষতঃ তাহারা ঐ দেশ প্রচলিত "অরমিয়" ভাষা জ্ঞাত ছিল না। পালিষ্টিনের অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাহারা সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ বলিয়া অপরিচিত দেশীয় লোকের নিকট ও তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশপগণের নিকট যাহা অবগত ছিল, তাহাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছে। ঐ বর্ণনা অত্যন্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর। (৩)

চতুর্থ শতাব্দ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দ কেবল জনপ্রবাদ বৃদ্ধি এবং পালিষ্টিনের প্রসিদ্ধ ঘটনা-স্থান নিরূপণ কার্য্যেই পরিসমাপ্ত হয়। সপ্তম খ্রীষ্টীয় শতাব্দে মুসলমানগণের যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হওয়ায় পালিষ্টিনের অধিবাসীদের কষ্টের আর সীমা ছিল না। যাজকগণ উক্ত স্থানের এই বিপন্ন দশা দর্শন করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও সসব্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই স্থানেই পালিষ্টিনের যাজকদিগের উৎপাত-বহ্নি নির্ব্বাণ হইল। যে সকল কল্পিত স্থানাবিষ্কার অগ্রে হইয়াছিল, তাহাই চির প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পূজ্য হইয়া গেল।

নিউইয়র্ক-নিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার রবিন্সন সাহেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পালিষ্টিনের ইতিহাস এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত সম্যক আলোচনা দ্বারা আমার এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, তথায় এক্ষণে খ্রীষ্টের কবর, মৃত্যু ও জন্ম স্থানাদি সম্বন্ধে যে সকল স্থল প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীগণ যে যে স্থানের বর্ণন করেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা স্থান নহে। উহা যাজকগণের প্রতারণার কৌশলমাত্র। রোমের রাজমহিষী বৃদ্ধা হেলেনার ক্রুশাবিষ্কার যেরূপ, খ্রীষ্টের কবর ও মৃত্যু স্থানাদি নির্ণয়ও সেই রূপ ভণ্ডামী মাত্র। ত্রাণকর্ত্তা যিশুর কবর বা মৃত্যুস্থান নিরূপণ করা, সকল চেষ্টার অতীত হইয়া পড়িয়াছে (৪)। খ্রীষ্টের জন্মস্থান আরও

(3) "So all the reports and accounts we have of the Holy City and its Sacred places have come to us from the same impure source. The fathers of the Church in Palestine, and their imitators, the monks, were themselves for the most part not natives of the country. With few exceptions, they knew little of its topography, and were mostly unacquaintad with the Aramæan, the vernacular language of the common people. They have related only what was transmitted to them by their predecessors, also foreigners; or have given opinions of their own, adopted without critical inquiry, and usually without much knowledge. In this way and from all these causes, there has been grapted upon Jerusalem and the Holy Land a vast mass of tradition, foreign in its source, and doubtful in its character, which has flourished luxuriantly aud spread itself out widely over the western world. * * * * That all ecclesiastical tradition respecting the ancient places in and around Jerusalem and throughout Palestine is of no value, except * * * " *Ibid VIII.*

(4) "In every view which I have been able to take of the question, both topographical and historical, whether on the spot or in the closet, and in spite of all my previous prepossessions, I am led irresistibly to the conclusion that the Golgotha and the Tomb now shown in the church of the Holy Sepulclre are not upon the real places of the crucifixion and resurrection of our Lord. The alleged discovery of them by the aged and credulous Helena, like her discovery of the cross, may not improbably have been the work of pious fraud. * * * If it

দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার। পালিষ্টিনে খ্রীষ্টের জন্মস্থান সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত আছে, তাহা পর্ব্বতগুহা, আস্তাবল নহে। তত্রত্য খ্রীষ্টোপাসকগণের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, খ্রীষ্ট পর্ব্বত-গুহায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দের মধ্য সময়ে যষ্টিন মার্টর স্পষ্ট রূপেই বলিয়াছেন, খ্রীষ্টের পর্ব্বত-গুহায় জন্ম হইয়াছিল। বেথ্লেহমের নিকট ঐ পর্ব্বতগুহা অবস্থিত। তৃতীয় শতাব্দেও ঐ রূপ জনপ্রবাদ ছিল, কারণ ওরিগেন্ বলিতেছেন যে, খ্রীষ্টের পর্ব্বতগুহায় জন্ম, ইহা সর্ব্বসাধারণে অবগত ছিল, যাহারা খ্রীষ্টের শিষ্য নহে, তাহারাও উহা স্বীকার করিতেছে। চতুর্থ শতাব্দের প্রারম্ভে ইউসিবিয়স্ লিখিয়াছেন, হেলেনের পালিষ্টীনে যাইবার অগ্রে তিনি খ্রীষ্টের জন্মস্থানের উপর একটী গির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সব বড় বড় মাতব্বর যাজক কি মিথ্যা বলিতে পারেন? কিন্তু ইবাঞ্জিলিষ্টগণ ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত, বাইবলে আস্তাবলের উল্লেখ তাঁহারাই করিয়াছেন। খ্রীষ্টের জন্মস্থান সম্বন্ধে বাইবেল এবং পরবর্ত্তী যাজকগণের মতের বিরোধ দেখা যায়। বিষয়টী সম্পূর্ণই অন্ধকারাবৃত, সন্দেহ নাই। দেশস্থ লোক সকলে স্থান প্রাপ্ত হইল কিন্তু মেরীর স্থানাভাব হইয়াছিল; অতি আশ্চর্য্য কথা! ইহাতে ঈশ্বরের নিগূঢ় মর্ম্ম কিছু থাকিতে পারে।

কোথা হইতে রোমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আসিয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। কনস্তান্তাইনের হস্তেই ইহার নানা রূপ গঠিত হইয়াছিল। কনস্তান্তাইন খ্রীষ্টধর্ম্মের নিয়ন্তা বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাঁহার ঐ ধর্ম্ম রোমে সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্বে জ্ঞস্তিক ধর্ম্মাবলম্বীগণ রোমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞস্তিক ধর্ম্মের অসাধারণ প্রাধান্য খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অসাধারণ প্রাধান্য জ্ঞস্তিক ধর্ম্মে আছে, এ কথা শুনিতে পাই না। জ্ঞস্তিক ধর্ম্মই বা কি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মই বা কি? দুইটী পৃথক ধর্ম্ম, কিন্তু একের উপর অন্যের অসাধারণ প্রাধান্য লাভের হেতু কি? বুঝিতে পারিলাম না।

পালিষ্টিনের প্রাচীন পর্ব্বতভেদী পুরী সকল দৃষ্টে জানা যায়, অতি দূরবর্ত্তী কালে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল অক্ষয় বৌদ্ধকীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিতে বৌদ্ধধর্ম্মের কথনই বিনাশ নাই। পালিষ্টিনের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে মহারাজা অশোকের ধর্ম্মানুশাসন লিপি আর একটী অদ্বিতীয় প্রমাণ।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবভূতি ও প্রকৃতি।

ভবভূতির প্রকৃতি-উপাসনা প্রদর্শন করিতে হইলে, তাঁহার যাদৃশী বর্ণনায় উহা সম্যক্ প্রতিবিম্বিত, তাহার আংশিক সমালোচনা আবশ্যক; বিশেষতঃ রচনা শক্তি

---

be asked, where then are the true sites of *Golgotha* and the *Sepulchre* to be sought? I must reply, that probably all search can only be in vain." *Ibid.*

বর্ণনার প্রধান সহায় বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান অসঙ্গত নহে। অতএব আমরা প্রথমত তদীয় রচনা ও বর্ণনা শক্তির আভাস প্রদান করিব।

ভবভূতির রচনা শক্তি অতি বিস্ময়কর, তাঁহার ন্যায় ভাষানিপুণতা অন্য কোন কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না। অতি উৎকৃষ্ট পদ-সমন্বিত অতি দীর্ঘ সমাস তদীয় লেখনী হইতে অনায়াসে প্রসূত হইয়াছে, তদীয় কাব্যে লৌকিক ও বৈদিক শব্দ এবং প্রণালী অলক্ষিতভাবে অতি সহজে মিশ্রিত হইয়া বহুস্থলে অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নবজলধরের আমন্দ্র গর্জ্জনে মন যেরূপ পুলকিত হয়, ভবভূতির স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠনাদে চিত্ত তেমনই সন্তর্পিত ও পুলকিত হয়। এমন প্রগাঢ়, এমন গাম্ভীর্য্যময়, এমন তুঙ্গতরঙ্গময় রচনা সংস্কৃত ভাষাকে আর অলঙ্কৃত করে নাই। নবীন জলধর সংঘ দিগন্তপ্রসারিণী ভূধরশৃঙ্গসংহতি ও তদীয় রচনা মনকে তুল্যভাবে মোহিত করে। উক্তবিধ রচনা যখন পর্ব্বতাদি প্রকাণ্ড ও বিশাল বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যকোন পদার্থই সম্ভবে না।

"এতাশ্চন্দনাশ্বকর্ণ সরল পাটল প্রায়তরু গহনা; পরিণত মালূর সুরভয়ঃ স্মারয়ন্তি খলু তরুণকদম্বজম্বুবনারুদ্ধান্ধকার গুরু-নিকুঞ্জ গভীরগহ্বরোদগার গোদাবরীরব মুখরিত বিশাল মেখলাভুবো দক্ষিণারণ্য ভূধরান্।"

চন্দন অশ্বকর্ণ সরল ও পাটলাভূমিষ্ঠ বৃক্ষ দ্বারা গহন ও পরিপক্ক মালূর ফল দ্বারা সুরভিত এই সকল অরণ্য গিরি ভূমি, তরুণ কদম্ব ও জম্বুবন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অন্ধকারাবৃত বিশাল নিকুঞ্জস্থ গভীর-গহ্বর হইতে উদ্গীর্ণ গোদাবরী জল-প্রবাহে প্রতিধ্বনিত বিশাল মেখলাভূমি শোভিত দক্ষিণারণ্যস্থ ভূধর সমূহকে স্মারিত করিতেছে।

বর্ণনা শক্তি পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, সম্প্রতি আমরা রচনা-কৌশল পদর্শন জন্য নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

গুঞ্জৎ কুঞ্জ কুটীর কৌশিক ঘটা
ঘূৎকার সংবল্গিত ক্রন্দৎ-ফেরব
চণ্ডতাংকৃতিভৃত প্রাগ্‌ভারভীমৈস্তটৈঃ।
অন্তঃশীর্ণ করঙ্ককর্পর পয়ঃ সংরোধ কূলঙ্কষ।
স্রোতোনির্গম ঘোরঘর্ঘর ররা পারে শ্মশানং
সরিৎ॥

মাধব মালতীর প্রণয়ে নিরাশ হইয়া আত্মবিসর্জ্জনার্থে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলেন। তিনি খড়্গহস্তে পিশাচ ও বেতালাদির ভয়াবহ বিভীষিকা দর্শন করিতে করিতে শ্মশান-পার্শ্বস্থ নদীতটে উপস্থিত হওয়ামাত্র সমস্ত বিভীষিকা সহসা অন্তর্হিত হইল, তখন সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে মানব-সঞ্চার রহিত শ্মশান-প্রান্তে পেচকের ঘূৎকার, শিবাগণের অশুভ ও দীর্ঘতাংকৃতধ্বনি এবং শবকঙ্কালে প্রতিহত প্রবাহা শৈবলিনীর ঘোর ঘর্ঘররব আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। উক্ত শ্লোকে কবি এই ভাব প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার পর্য্যালোচনায় এলফিনষ্টন্ বলিয়াছিলেন * "ভবভূতির বিস্ময়কারী বর্ণ-

* "Among his most impressive descriptions is one, where his hero repairs at midnight to a field of tombs, scarcely lighted by the flames of the funeral pyres and evokes the demons of the place, whose appearance, filling the air with shrill cries and unearthly forms, is painted in dark and powerful

নার মধ্যে শ্মশান বর্ণনাও একটী প্রধান। নিশীথ সময়ে নায়কের শ্মশান ঘাটে গমন, চিতাগ্নি দ্বারা কথঞ্চিৎ আলোকিত অন্ধকারময় শ্মশান, ক্ষীণালোকে প্রকটিত পিশাচগণের অমানুষ আকৃতি, গগনব্যাপী কর্কশনাদ, অতি প্রগাঢ় ও অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে; পরন্তু পিশাচগণের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের পরেই নির্জ্জনতা, সমীরণের সোঁ সোঁ নাদ, নদী স্রোতের কর্কশধ্বনি, পেচকের উদাসকারী রব এবং শৃগালের অতি দীর্ঘ শব্দ, ভূতসঙ্গ-প্রসূত ভয় হইতেও যেন অধিকতর ভয়াবহ।”

উক্ত শ্লোকস্থ দীর্ঘ সমাস সংবলিত, ঘুৎকার, চণ্ড, তাৎকৃত, হৃত, প্রাগ্‌ভার, ভীম, ঘর্ঘর এবং শ্মশান এই কয়েকটী পদ ভীতি সঞ্চারের প্রধান সহায়; এই কয়েকটী পদবন্ধনের কৌশল আরও বিস্ময়জনক। এই কয়েকটী শব্দই প্রায় মহাপ্রাণ বর্ণময়, পরন্তু সেই মহাপ্রাণ বর্ণময় শব্দ শ্লোকের মহাপ্রাণ স্থান ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেরূপ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ, শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডকেও তদ্রূপ অল্পপ্রাণ বর্ণময় করতঃ কবি পদবিন্যাসের চরম কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষত শ্লোকের ধ্বনিও শবাস্থি-প্রতিহত প্রবাহা প্রবন্তীর কর্কশনাদানুকারী।

প্রতিকূলবর্ণতা দোষ প্রদর্শন সময়েও কাব্য প্রকাশকার “প্রাগপ্রাপ্তনিশুম্ভ” এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, “রৌদ্ররসে বিকটবর্ণত্বও দীর্ঘসমাসত্ব অনুকূল, সুতরাং ভবভূতি উক্ত শ্লোকে ক্রোধব্যঞ্জক তিন পদেই বিকটবর্ণ ও দীর্ঘসমাস যুক্ত করিয়াছেন, অথচ চতুর্থ পদে ক্রোধ বর্ত্তমান নাই বলিয়া সেই স্থানে সেই পদেই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।”*

কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি “বশ্যবাক” “দেবীভারতী তাঁহাকে বশগা কামিনীর ন্যায় সেবা করিয়া থাকেন,‡ সুতরাং ভাষাধিপত্য ও রচনাকৌশল বর্ণনা শক্তির সহায় হইয়া ভবভূতি-কাব্যের পরমোৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছে। বর্ণনাশক্তি কবিমাত্রেরই পরীক্ষার স্থল, কিন্তু ভবভূতির যে বর্ণনায় প্রকৃতির বিপ্রলম্ভময় ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতি-প্রেমিক সহৃদয়গণের অতিশয় প্রীতিপ্রদ ও অনুমোদিত। উক্ত সহৃদয়গণ বলেন,—অরণ্য, ভূধর প্রভৃতি সঞ্চারের বর্ণনা করিতে হইলে মনুষ্যের অবতারণা না হইয়া প্রকৃতির সন্তান, বনবিহারী ও বনবাসী বিহঙ্গ, বিটপী ও মৃগাদির আনুষঙ্গিক বর্ণনাই প্রশস্ত। মনুষ্য স্বভাবের সন্তান হইলেও সে অতি বিকৃত, তাহার শরীর স্পৃষ্ট সমীরণ স্পর্শেও কাননের বিজনতা জীবনা দেবতা সন্ত্রস্তচিত্তে বহু-

colours; while the solitude, the moaning of the winds, the hoarse sound of the brook, the wailing owl, and the longdrawn howl of the jackal, which succeed on the sudden disappearance of the spirits, almost surpass in effect, the presence of their supernatural terrors."

Elphinstone's History of India.

* রৌদ্রে বিকটবর্ণত্বং দীর্ঘ সমাসত্বঞ্চ উচিতং। যথা (ভবভূতি)

১। “প্রাগপ্রাপ্তনিশুম্ভ শাম্ভবধনুর্দ্বৈধাবিধাবির্ভবৎ—

২। যেনানেন জগৎসুখণ্ডপরশুঃ।—

যত্রতুন ক্রোধস্তত্র চতুর্থপদাবিধানে তথৈব শব্দপ্রয়োগঃ।

কাব্যপ্রকাশ।

‡ বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং সাচ রামাশ্রয়া কথা॥

“যং ব্রহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ত্ততে।„

উত্তরচরিত।

দূরে পলায়ন করিয়া থাকেন। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জে মানবসঞ্চার অতি দূর হইতেই বর্জ্জনীয়। উক্ত সহৃদয়গণের মতে, কবির দিব্য কাননে, প্রতি লতা, প্রতি পল্লব ও প্রতি নিঝরের প্রতি কণে প্রকৃতির জ্বলন্ত জীবন উদ্‌ভাসিত হইবে, প্রভাতে নীহার বিন্দুচ্ছলে প্রতি পত্রে অনিলাস্বন-প্রলীনা প্রকৃতির অশ্রুবিন্দু বিলম্বিত হইবে, নব-কিসলয়-রক্তিমায় অধররাগ ও নবকুসুম সমৃদ্ধিতে তাঁহার হৃদয়ানন্দন বিভ্রম বিকীর্ণ হইবে; এবং প্রবিতত বনগাম্ভীর্য্যে প্রকৃতির অগাধ প্রেমের তরঙ্গ অবিরত প্রতিহত হইবে। চঞ্চল কুরঙ্গশাবক, প্রকৃতির দুর্ল্ললিত শিশু ও জলধরের ন্যায় আনন্দ গর্জ্জনকারী বলদৃপ্ত পশুরাজই রক্ষক [illegible] হইবে। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতির বর্ণনা যেন তাহাকে পদার্থান্তরের অধীন না করিয়া ফেলে, প্রকৃতির অস্তিত্ব যেন অন্যের জন্য কল্পিত না হয়, প্রকৃতি যেন নায়ক নায়িকার বিলাস নিকুঞ্জ, অথবা অবলম্বিত প্রেম উদাসীনের চিরদাসী না হইয়া পড়েন; প্রকৃতি যেন চরিতার্থ প্রেমিকের উদ্দীপন ও নিরস্ত [illegible] জীবনালম্বন না হন। প্রকৃতির পুলকবিধায়িনী বসন্তবিভা, শোণিত-শোষণ শিশির স[illegible]তি ও বর্ষার মেঘ ভীতি-সঞ্চারিণী জলধর হুঙ্কৃতি যেন তুচ্ছজীব মনুষ্যকে লক্ষ্য করতঃ প্রস্তুত না হয়; প্রকৃতির স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি দ্রব্যান্তরের অগ্রজলে উচ্ছ্বলিত না হইয়া, কবির লেখনী স্পর্শে যতদূর বিচিত্র হইতে পারে, তাহাই হউক; কবির লেখনী স্পর্শে দোষ গুণরূপে প্রতিভাত হউক, কিন্তু উহাতে যেন কৃত্রিম অলঙ্কার আসঞ্জিত না হয়।

উক্তবিধমত ইংরাজী কি বাঙ্গালা কোন ভাষায় স্পষ্টরূপে প্রচারিত না হইলেও কাব্যালাপী ব্যক্তিগণের ভাবানুসারে সম্যক্ লক্ষিত হয়। উক্তবিধ বর্ণনা অতি বিশুদ্ধ ও পুলকাবহ। এতন্মতে বিশ্বব্যাপিনী প্রকৃতির হর্ষ, বিষাদ ও দুঃখময় বিকার সমূহের হেতু ও অভিপ্রায় চিরকাল মানব প্রতিভাকে অভিভূত রাখিবে; কবির কর্ত্তব্য, তিনি যেসকল বিকার লক্ষ্য করিতে পারেন, বিশ্বস্ত চিত্রকারের ন্যায় তাহারই অবিকল প্রতিবিম্ব কাব্যে প্রতিফলিত করেন; ইহা হইতে যাহা কিছু অল্প বা অধিক, তাহাই তাহার ত্রুটী ও অনধিকার চর্চ্চা।

উক্তবিধ সহৃদয়গণ ভবভূতি-কাব্যকে উক্তবিধ বর্ণনার আদর্শ স্থান মনে করিতে পারেন। ভবভূতি বর্ণনায় নির্জ্জন প্রকৃতির নিভৃত গম্ভীর মাধুর্য্য যত বিকীর্ণ, অন্য কোন কবির বর্ণনায় তাহা লক্ষিত হয় না। তদীয় বর্ণনায় কিরূপ ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। তদীয় বর্ণনা প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যময় ভাবসমূহের অবিকল প্রতিবিম্ব। উহাতে মনুষ্যের সমাগম নাই, দেবকন্যার বিভ্রম নাই, নায়ক নায়িকার নিকুঞ্জবন চিত্রিত নাই; উহাতে যাহা প্রকৃতি, তাহাতেই চিন্তোন্মাদিরূপে জ্যোৎস্নায়িত। ভবভূতির গিরি, নদ, নদী প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে, হৃদয়ে অকলিত গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্ত ভাবের আবির্ভাব হয়। দিগন্তব্যাপিনী মেঘমালা হইতে প্রসৃত গম্ভীর গর্জ্জন যেরূপ শ্রুতিসুখাবহ, "গভীর গিরিগহ্বরাণি জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘারণ্যাণির" মধ্য হইতে নিনাদিত কবির স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠনাদ ততোধিক পুলকাবহ। তাঁহার প্রকৃতি আদ্যন্তই প্রশান্ত বৈভব পরিপ্লুত। তিনি যে স্থানে ভূধরাবলীর চিত্র অঙ্কিত

করিতে বসিয়াছেন, সে স্থানে অভ্রঙ্কষ শৃঙ্গ-লহরী, গাঢ়নীলিম মেঘরাজি, ভীষণ পরিসরারণ্য, গুহাগত নির্ঝরের ঝঙ্কৃত ও শিখণ্ডির প্রমত্ত নৃত্য স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আমরা উক্তবিধ বর্ণনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ অনুবাদ করত উদ্ধৃত করিতেছি।

"বেতসলতার কুসুম দ্বারা নিকুঞ্জনদী সুরভিত ও তটান্তভাগ উচ্ছ্বসিত যূথিকা কুসুম দ্বারা অলঙ্কৃত; এবং প্রস্ফুটিত কুটজ কুসুম দ্বারা হাস্যযুক্ত গিরিসানু সমূহকে অবলম্বন করত শিখণ্ডিগণের তাণ্ডবহেতু মেঘরাশি উর্দ্ধদিকে বিতানের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।" (১)

"পর্ব্বতের আভোগ ভূমি, জম্বুরশত জর্জ্জরবিটপ ও ঘন শ্রীমান্ কদম্বদ্রুম সমূহে শোভিত; দিক সকল কাদম্বিনী দ্বারা শ্যামলীভূত, তটিনী বৃন্দের কচ্ছদেশ প্রকট কন্দল, কোমল কেতক কুসুম পূর্ণ, এবং বন সন্ততি আবির্ভূত শালিক ও লোধ কুসুম দ্বারা সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে।" (২)

"সম্প্রতি অরণ্যভূমিতে সেই সকল দিন উপনীত হইয়াছে, যখন উৎফুল্ল অর্জ্জুন ও সর্জ্জ কুসুমবাসিত পৌরস্ত্য ঝঞ্ঝানিলের বেগবশত, সমলিত ইন্দ্রনীলমণি খণ্ড সকলের ন্যায় স্নিগ্ধ অমবুদশ্রেণী গগনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়, এবং ধারা-বসুন্ধরা যোগে সুরভিত, ও ঘর্ম্মজলের উদসমাগমে দিবস রমণীয় শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।„ (৩)

"এই সেই সর্ব্বভূত লোমহর্ষণ উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল গিরিগহ্বর যুক্ত জনস্থান পর্য্যন্ত প্রসৃত অরণ্য দক্ষিণাভিমুখে অভিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার কোনস্থান নিঃশব্দ ও নিস্কম্প কোনস্থান প্রচণ্ড সিংহগর্জ্জন সমাকুল, কোনস্থান স্বেচ্ছাসুপ্ত প্রসুপ্ত অজগরের শব্দায়মান গভীর শ্বাস দ্বারা দাবানল প্রজ্বলিত, কোন কোনস্থানে গর্ত্তাভ্যন্তর অল্পজলবিশিষ্ট, ঐস্থানে তৃষিত কৃকলাসগণ অজগরের ঘর্ম্মজল পান করিতেছে।" (৪)

"এই পর্ব্বত নয়নের অতিশয় প্রীতি সঞ্চার করিতেছে। ইহার উত্তুঙ্গ সানু অভিনব মেঘের ন্যায় শ্যামল; ইহার সর্ব্বস্থান ময়ূর ময়ূরীগণের মুখরিত কেকাধ্বনি সমাকুল। প্রান্তভাগ শকুনির শবল নীড়পূর্ণ দ্রুমরাজি দ্বারা আবৃত এবং প্রকাণ্ড উপল সমূহে বন্ধুর। (৫)

আমরা পশ্চাৎ ভবভূতির বর্ণনাশক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিব, আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সম্প্রতি উহাই যথেষ্ট। উক্তবিধ পুলকবিধায়িনী পরিশুদ্ধ প্রগাঢ় বর্ণনায় ভবভূতির কাব্য সম্যক অলঙ্কৃত। তাহার ধরাধর মন্দাকিনীর লীলাস্থল; সম্মুখে কেবল মেঘ গর্জ্জন, বারিধারা, নির্ঝরের ঝঙ্কার ও প্রগাঢ় নীলিমা; অধোদেশে ঘনসন্নিবিষ্ট বর্ণপাদপ সিংহের গর্জ্জন, ভল্লুকের চীৎকার ও নগনিম্নগার নিস্যন্দ; তথায় গন্ধর্ব্ব বা অপ্সরার চিহ্নও বর্ত্তমান নাই, দেবতার নিভৃত নিকুঞ্জ নাই। তদীয় অরণ্য দৃশ্যে মেঘ গর্জ্জন ও সিংহনাদই গম্ভীর মুরজধ্বনি, প্রতিধ্বনিত কন্দরই নবঘনস্তম্ভ মেঘরাগ, বিদ্যুত দামই চপলা অপ্সরা, ভীম প্রভঞ্জনই মন্দ মলয় মারুত, প্রগাঢ় নীলিমাই অনঙ্গ লেখ-মসী, নিঝরিণীই আনন্দাশ্রুধারা, " ফল ভরপরিণাম শ্যামজম্বুনিকুঞ্জই

বিলাস কানন, কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম কানন-বীথি ব্যাপ্ত।

[illegible] স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কবি নির্জ্জন বনে, গভীর নিকুঞ্জে প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গ সম্ভাষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার দিব্য নয়নে, নির্জ্জন আরণ্য ভূমিতে প্রকৃতির দিব্য মধুরিমা অতি স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইত। প্রকৃতি নিভৃত গিরিভূমিতে, নির্ধূম অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে অত্যল্প শিখা বিস্তার করত কবির চিত্ত হরণ করিত। কবি প্রীতিসানুতে প্রকৃতির উন্মাদকারী জ্যোৎস্না অবলোকন করত কৃতার্থ হইতেন। তিনি প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যে বিলীন হইয়াই স্বভাব বর্ণনায় কুলঙ্কষ প্রবাহ অভিস্যন্দিত করিয়াছেন। কবি প্রকৃতির গম্ভীর ভাবেই প্রমত্ত ছিলেন। স্বভাবের কি এক বিশ্বব্যাপক ভাব তাঁহার অন্তঃকরণ নির্জ্জিত করিয়াছিল, কবি ঐ ভাবের উপাসনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি যেন বিশাল অরণ্য মধ্যে, গাঢ়নীল শৈল মালায় উপবেশন করত শিশুর ন্যায় উদ্বেল চিত্তে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। তিনি স্বকীয় কাব্যে প্রকৃতির প্রশান্ত, বিষাদ ও বিপ্রলম্ভময় কোন ভাবের উপাসনা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি আদ্যন্তই প্রশান্ত। ক্রমশঃ—

শ্রীবসন্ত কুমার রায়।

সাহিত্য এবং সমাজ।

সাহিত্যের দুই অবস্থা। প্রথমাবস্থায় সাহিত্য মানুষের কণ্ঠাগ্রে বাস করে, দ্বিতীয়াবস্থায় সাহিত্য লিখিত হয়। ঋগ্বেদ পৃথিবীর সর্ব্বাদিম গ্রন্থ। ইহা বহু শতাব্দী বা যুগযুগান্ত মানবকণ্ঠে নিহিত ছিল। বেদ-মন্ত্র সকল গীতিময়। মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই আদিম সাহিত্য সকল গীতাকারে রচিত হয়। জেন্দ ভাষার আদিম গ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তা গীতিময়। ইহা বয়সে ঋগ্বেদের প্রায় সমতুল্য। মোজেসের অপূর্ব্ব উপদেশ-মালা ও প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি দেশ-ভ্রষ্ট ইহুদীগণ যত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ঈশার উপদেশ সমূহ হিব্রু ভাষায় গীতাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশা নিজ হস্তে এক অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশার প্রাথমিক শিষ্যগণ প্রায়ই নিরক্ষর ছিলেন। ঈশার অমূল্য উপদেশ সকল শিষ্যকণ্ঠ হইতে হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়।

আদিমাবস্থায় সাহিত্য সুধু মানুষের মুখের সম্পত্তি ছিল বলিয়াই পৌরোহিত্য-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশ সমূহ মুখস্থ করিতে প্রায়ই জন সাধারণের সুযোগ ও সুবিধা হয় না। কাজেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সেই সকল সম্পত্তি যত্নে কণ্ঠাগ্রে সঞ্চিত করিতে হয়। এই বিশেষ ব্যক্তি সকল বা তাঁহাদের পরবর্ত্তী শিষ্যগণ কালক্রমে পুরোহিতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। সময়ে পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক হয়। পুরাকালে মিসরদেশে এবং আধুনিক

ইয়ুরোপ পৌরহিত্যের প্রাধান্য থাকিলেও ভারতবর্ষের ন্যায় কুত্রাপি ইহার প্রবলাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারীর প্রথা পৌরহিত্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফল। দুই কারণে এই ফল উৎপন্ন হয়। অসুবিধা, অমনোযোগ ও অনভ্যাস বশত সাধারণ জনগণ আপনা হইতেই শাস্ত্রাধিকার উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছুক হয়। সেই উপযুক্ত পাত্র চিরন্তন পৌরহিত্য ব্যবসায়িগণই মনোনীত হন। অপর দিকে পুরোহিতগণ চিরাবলম্বিত ব্যবসায় সম্পূর্ণ রূপে হস্তগত রাখিতে এবং জন-সাধারণের উপরে আধিপত্য স্থাপন জন্য স্বার্থান্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শাস্ত্রাধিকার অপরের অপ্রাপ্য করিতে চেষ্টা করেন। জগতে যে খানেই বিশেষ ব্যক্তি সাধারণের দত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার হইয়াছে। রাজত্ব সাধারণ-দত্ত ক্ষমতা মাত্র। কিন্তু রাজা এখন প্রভু সাধারণ-জনগণ অধীনস্থ ভৃত্যের অধম। ভারতের ব্রাহ্মণ জ্ঞানে ধর্ম্মে অলস্কৃত হইয়াও মানবপ্রকৃতির এ নীচ ভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

নেতা যাহা করেন, অল্পজ্ঞান নীতব্যক্তি তাহার অনুকরণ করে, ইহা মনুষ্যপ্রকৃতির একরূপ সাধারণ সূত্র। পুরাকালে ব্রাহ্মণজাতি সমাজ মধ্যে যে অধিকারভেদ ও জাত্যভিমানের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই জাতিভেদপ্রথা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়া ভারতসমাজকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

লিখিবার সঙ্কেত বা বর্ণ মালার আবিষ্কারের পরে সাহিত্য লিখিত ভাষায় পরিগণিত হয়। তখনও পূর্ব্বের অভ্যাস এবং সাধারণ রুচি বশত লেখক বা রচনা-কারকের হৃদয়ে মন্ত্রাদির রচনা গীতাকারে স্ফূরিত হয়। বিশেষত লেখা সৃষ্টির প্রথম যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের গীতিময় মন্ত্রাদি মনুষ্য কণ্ঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ-বদ্ধ করাই তৎকালীন লেখকদিগের বিশেষ কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য লেখা সৃষ্টির পরেও বহুকাল সাহিত্য গীতিময় অবস্থায় থাকে।

মানব-হৃদয়ের সহজাবস্থার উচ্ছ্বাসই গীতি। এইজন্য শিশুর প্রথম স্ফূরিত আধ আধ ভাষা মধুর গীতিময়, আদিম বৈদিক ঋষিগণের অলঙ্কার পরিচ্ছদ-হীন উলঙ্গ ভাষা মহাদেব বা তানসিবানের সঙ্গীত নিপুণতাকে চিরতরে হেয় করিয়াছে। শিশু বলে, "দিন নিবিল, রাত ঢাকিল, আকাশে পাখী ভাসিয়া গেল।" আদিম ঋষি বলিতেন, "সুবর্ণ-ভূষিতা ঊষা দেবীকে ধরিতে তরুণ তপন অরুণ রথে ধাবমান হইয়াছেন।" মানুষের হৃদয় সহজ অবস্থা ছাড়িয়া যখন পাষাণ হয়, তখন গীতি ভোলে। প্রাচীন গ্রীস্ দেশে প্রবাদ ছিল, প্রেমের দেবতা অন্ধ শিশু। তিনি দিবসে বিমান-বক্ষে রঙ্গিল মেঘের শয্যায় শুইয়া ঘুমান এবং রাত্রিতে চন্দ্রের কিরণ ধরিয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। একদা কোন বড় মানুষের চিত্র-শালিকায় ছবি দেখিতে গিয়াছিলাম। ইতালি দেশীয় খ্যাতনামা চিত্রকরদিগের অনেক মনোমোহন চিত্র দেখিয়া যুগপৎ নয়ন মন চরিতার্থ করিলাম। তাহার এক খানি ছবিতে দেখিলাম, এক পরম রূপসী রমণীর গোলাপস্তূপ-বিনিন্দিত গ্রীবার উপরিদেশে একটী পক্ষধারী মনোহর পরী শিশু

বসিয়া দুই খানি ক্ষুদ্র করে রমণীর দুইটী চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছে। এই শিশু, প্রেমের দেবতা। প্রেমের দেবতা যাহার স্কন্ধে চাপিয়াছেন, তাহাকে দৃষ্টিহীন অর্থাৎ অন্ধ করিয়াছেন। প্রেম অন্ধকার, প্রেমিক অন্ধ।

প্রেম বা অনুরক্তিই মানব হৃদয়ের সহজ অবস্থা। প্রেমিকের হৃদয় মীনাহত প্রশান্ত হ্রদ বক্ষের ন্যায় স্থির এবং মনোহর। হিংসা কলহাদি আসুরিক ভাব এ অসীম-প্রসার স্বর্গ ধামে অসম্ভবনীয়। গীতি প্রেম পূর্ণ হৃদয়ের স্বতঃনিঃসারিণী ভাষা মাত্র। সুতরাং গীতি অন্ধকার, গায়ক অন্ধ।

অনেকে বলেন, অনুষ্টুব ছন্দই সংস্কৃতের গদ্য ভাষা। বস্তুত কাদম্বরী, বাসবদত্তা, দশকুমারচরিত, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ ব্যতীত সংস্কৃতে বিশুদ্ধ গদ্য রচনার পুস্তক দুর্লভ। সংস্কৃত নাটকে দিতে সহজ কথা বার্ত্তা থাকিলেও তৎসমুদয়কে বিশুদ্ধ গদ্যময় গ্রন্থ বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ সকলই ছন্দ বন্ধে বিরচিত। ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালী বোধ হয় ইহার অন্যতম কারণ। অলিখিত বেদের সময়ে ঋষিগণ যেমন বেদ মুখাগ্রে রাখিতেন, ভাষা লিখিত হইলেও সেই প্রথার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। স্বর ও উচ্চারণ বিষয়ে আর্য্য-ঋষিদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকাতেই তাঁহারা শিষ্যদিগকে প্রথমে গ্রন্থের আবৃত্তি উত্তম রূপে শিক্ষা দিতেন এবং মুখস্থ না হইলে আবৃত্তি অনর্গল ও তাহাতে শিষ্যগণের উত্তম অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই দর্শনাদি সূত্রাকারে ও সাহিত্য সকল ছন্দ বন্ধে রচিত হইত।

• গীতি ভাবজগতের রাজা হইলেও, সত্য বিবরণ প্রকাশের অনুপযোগী। ঘটনার অতিকুল বসন-ভূষণ হীন উলঙ্গ মূর্ত্তি অঙ্কনে কবির তুলিকা সুনিপুণ নয়, এ কথা বলিলে বোধ হয় কবিগণের অগৌরব প্রচার করা হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, ছন্দ বা সূত্র মাত্রই কি গীতি? সূত্রের সঙ্গে কবিত্বের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। ছন্দ গীতির দেহ, ভাব প্রাণ। ভাবহীন ছন্দ কবিত্বের মৃত দেহ মাত্র। ছন্দের বিশেষ বাঁধা বাঁধিতে অনেক সময়ই কবিদিগকে উদ্বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে হয়। কবিবর শ্রীমধুসূদন দত্ত তৎকাল-প্রচলিত অন্নদামঙ্গলি মিত্রাক্ষর ছন্দকে মাতৃভাষার পায়ের নিগড় বলিয়াছেন। ভাবের অন্ধকারময় উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে, সুধু ছন্দ ভাষাকে "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"র ন্যায় নীরস ও কঠিন করিয়া ফেলে। এই জন্য সংস্কৃত ভাষার কবিগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে নায়কের অশ্বক্ষুরোত্থিত রজোরাশিতে সিন্ধু গর্ভকে স্থলে পরিণত করিয়াছেন, ভট্ট নারায়ণ প্রস্তর কঠিন ভাষায় কাব্যকলঙ্ক ভট্টি লিখিয়াছেন, এই কারণেই বানভট্টের অতুলনীয় প্রতিভা লৌহবর্ম্মে আবৃত হইয়া সাধারণ জনগণের দুষ্প্রাপ্য হইয়া রহিয়াছে। গৌতম কপিল উভয়ই প্রতিভা এবং জ্ঞানে অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহাদের মনীষা যে বজ্র নির্ম্মিত পেটকে নিবদ্ধ রহিয়াছে, সাধারণ জনমণ্ডলী দূরের কথা, অসাধারণ ধীমানের পক্ষেও তাহা উন্মোচন করিয়া রত্নোদ্ধার করা সাতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রের আদেশ অসংখ্যার্থক, উপপুরাণ, পুরাণ, মহাপুরাণ সকল পল্লী, মানব এবং দেবলোকের স্বপ্নময়

ভাষায় লিখিত। ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই পথের সংখ্যা অগণ্য। কেনই বা এ সমাজকে স্বেচ্ছাচার এবং অধোগতি দ্রুতবেগে আলিঙ্গন করিবে না? কেন ভারত অনাচারে, কুসংস্কারে, পাপে প্রোথিত হইবে না? শাস্ত্রের কূটার্থ সাহায্যে পাপ এবং অনাচারকে সৎকাজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, কয় জন এই আপাত-মধুর আস্বাদনে আপনাকে বঞ্চিত রাখিতে ইচ্ছুক হয়? লোকনিন্দা ও গ্লানির হাত এড়াইতে পারিলে, জগতের কয় জন মানুষ স্বেচ্ছাচারকে মাথার মুকুট না করিয়া থাকিতে পারে? সংস্কৃত সাহিত্যের ফল ভারতসমাজের উপরে যেরূপ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে, তাহার সামান্য আংশিক আভাস দিতে হইলেও এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। বেদ উপনিষদের কথা তো অতি দূরের, অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাভারত এক খানি মহাকাব্যমাত্র হইয়াও সমাজকে যেরূপ তোল পাড় করিয়াছে, তাহা ভাবিলে শুধু অবাক হইয়া থাকিতে হয়। মহাভারত একটী নূতন সমাজ গঠন করিয়া ভারতে সামাজিক যুগান্তর ঘটাইয়াছে, ইহা বলিলেও কিছুই হইল না। পূর্ব্বোক্ত যৎসামান্য কথা কয়টী দ্বারা সেই মহা ব্যাপার, সেই যুগ যুগব্যাপী সুফল কুফল বুঝাইবার চেষ্টা করাও অতি ধৃষ্টতা।

ভারতবর্ষের মধ্যে আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রসর। প্রচলিত দেশীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাই এখন উন্নতিশীল। বাঙ্গলা ভাষাই কালে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা হইবে, কাহাকে কাহাকে এইরূপ আশা করিতেও দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, যদি ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীকে কেহ কোন বিষয়ে আজ কাল শ্রেষ্ঠত্ব দিতে প্রস্তুত হয়, তবে সে শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ, বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন। সাহিত্যে বা লেখার মধ্যেই জাতীয় চরিত্র অঙ্কিত থাকে। কোন জাতির চিন্তাশীলতা, ধীমত্তা, স্বাধীনচিত্ততা, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ সেই জাতির লিখিত গ্রন্থ পাঠে যেমন সহজে জানা যায়, অন্য উপায়ে তদ্রূপ অবগত হওয়া যায় না। যে জাতির ভাষা মূল্যবান্ গ্রন্থ রাজিতে পরিশোভমান, সে জাতি যে একটা বড় জাতি, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গালী মাতৃভাষায় ও ভাষান্তরের পত্রিকাদিতে প্রাচীন তত্ত্ব বিষয়ের যেরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন ও অনেক দিন হইতে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে এ জাতিকে ভারতীয় অপরাপর জাতির অপেক্ষা কতকগুলি বিষয়ে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠতর আসন প্রদান করিতে প্রায় কেহই কুণ্ঠিত নন। বিশেষতঃ ইতি মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রশংসা পাইবার কথঞ্চিৎ অধিকারও জন্মিয়াছে।

জাতীয় ভাষা জাতির সাধারণের সম্পত্তি। পরকীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া বহু আয়াস-সাধ্য। এইজন্য তাহা চিরদিনই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের অধিকারাধীন থাকে। মানুষ শৈশব হইতেই জাতীয় ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে শিখে। জাতির প্রয়োজন ও প্রকৃতির অনুসারে জাতীয় ভাষা রচিত হয়। দেশ-ভেদে মানব-প্রকৃতির প্রভেদ স্বীকার করিলে, ভাষাভেদও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এক প্রকৃতির মানুষের ভাষায় অপর প্রকৃতির

মানুষ কখনও প্রকৃত হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে জাতীয় ভাষার উচ্চ ভাব সকলও জাতির অজ্ঞব্যক্তিগণ অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারে। জাতীয় ভাষায় অতি উন্নত বিষয় সকলের আলোচনা করিলেও জাতির আপামর সাধারণে তাহাতে কিছু না কিছু পরিমাণে যোগ দিতে পারে। পরকীয় ভাষায় অতি সহজ ও সরল বিষয়ের অবতারণা করিলেও জাতির অনেকের পক্ষেই তাহা সম্পূর্ণ অবোধ্য হয়। সুতরাং সেই আলোচনার ফল জাতির সর্ব্বাংশে বিস্তৃত হইতে পারে না। পরকীয় ভাষা আয়াস-কর-শিক্ষা-সাপেক্ষ বলিয়া যখনই সেই ভাষার শিক্ষা বন্ধ হয়, তখনই তাহা দেশ হইতে উঠিয়া যায়। এইজন্য পরকীয় ভাষায় কোন গ্রন্থাদি লিখিলে যুগযুগান্ত তাহা জাতির সম্পত্তি থাকে না। অবশ্য জাতীয় ভাষা যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহা জাতির সম্পত্তি থাকে। পারস্য ও আরব্য ভাষা যেমন ইতিমধ্যেই হিন্দু জাতির নিকট এক প্রকার চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, ঋগ্বেদের সংস্কৃত বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইলেও তাহার তদ্রূপ দশা ঘটে নাই। আর এক যুগের জাতীয় ভাষার অস্থিমাংস দ্বারাই পরবর্ত্তী যুগের জাতীয় ভাষার দেহ গঠিত হয়। বস্তুত আধুনিক যুগের জাতীয় ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের জাতীয় ভাষার সন্তান সন্ততিমাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভাষাগত বিধি ব্যবস্থা ও ভাব সকল আপনা হইতেই পরবর্ত্তী যুগের ভাষায় অনুবাদিত হয়। কথায় কথায় পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষার মজ্জাগত সত্য সকলের উদাহরণ আসিয়া পড়ে। সুতরাং এক যুগের জাতীয় ভাষার স্রোত পরবর্ত্তী কোন যুগেই একবারে বিলুপ্ত হয় না। পরকীয় ভাষায় ও জাতীয় ভাষায় তদ্রূপ কোন সম্বন্ধ না থাকাতেই সচরাচর এক জাতির ভাষা অপর জাতির মধ্যে চিরস্থায়ী হয়না। এই জন্যই পরকীয় ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া সময় ক্ষয় করিলে জাতির বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। এই সকল কারণে জাতীয় ভাষার চর্চ্চায় ও উন্নতি সাধনে জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। "হেমিল্টন কোম্পানি" আমাদের দেশে দোকান করিয়াছেন। সেই দোকানে বহুসংখ্যক বহুমূল্য মণি মুক্তা আছে। অথচ তাহা আমাদের দেশের সম্পত্তি নয়। কারণ আজই যদি প্রয়োজন বশত "হেমিল্টন কোম্পানি" দোকান তুলিয়া দেশে চলিয়া যান, তাহার মণিমুক্তা তাঁহারই সঙ্গে স্বদেশে চলিয়া যাইবে। তদ্রূপই ইংরেজের যে সকল সাহিত্য-রত্ন আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে রহিয়াছে, দেশীয় লোকের মস্তক হইতে যে সকল ইংরেজি সাহিত্য বাহির হইতেছে, তৎ সমুদয়ও ইংরেজের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে হইতে অন্তহিত হইবে। তখন তাহার প্রসূত ফল কিছু দিনের জন্য এদেশে থাকিবে বটে, কিন্তু জাতীয় প্রকৃতির বহিভূত বলিয়া তাহাও বহুদিন তিষ্ঠিতে পারিবে না, আমরা পুন-মূর্ষিক হইব। সকল বিদেশীয় ভাষার সঙ্গেই আমাদের এই রূপ সম্বন্ধ। কেবল বিদেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে আপনাদের দেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত করা যায়, তাহার সুফল কখনো বিনষ্ট হয় না। আবার পরকীয় ভাষায় প্রকৃত মৌলিকতা প্রকাশ করাও সুসাধ্য নয়। এক কবি অপর কবির

হৃদয়ের ভাষায় কথনই কবিতা লিখিতে পারেন না, এক জন ধর্ম্মপিপাসু অপর ধর্ম্ম-পিপাসুর প্রাণের ভাষায় প্রার্থনা করিতে পারেন না। এই দুইটী দৃষ্টান্তের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত কথাটীর সুযুক্তি নিহিত আছে। মৌলিকতাই লেখকের প্রতিভার পরিমাপক, ইহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। পরন্তু স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক ভাব-সম্পন্ন গ্রন্থ দ্বারাই ভাষা উন্নত হয়। কোন জাতির জাতীয় ভাষা উন্নত বলিলে যেমন জাতি-টাকেও উন্নত বুঝা যায়, তেমনই, কোন জাতি জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করি-তেছে, ইহা শুনিলেও, সেই জাতি উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিতেছে, বুঝা যায়। বাঙ্গালী জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন জন্য কি করিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন, এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক্।

বাঙ্গলা সাহিত্যের জীবন-কালকে কয়েকটী অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জয়দেবের পর-বর্ত্তী সময় হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবলাধিপত্যের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগ গণনা করা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের আবেগপূর্ণ উচ্ছাস-ময় লেখনী বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাথমিক অবতারণা যেরূপ মধুর সঙ্গীত ধ্বনিতে সমাধান করিয়াছে, তাহা অতি মনোমোহন। বোধহয়, পৃথিবীর কোন ভাষার সাহিত্যই এইরূপ মনোজ্ঞ বেশে রঙ্গক্ষেত্রে প্রথম অবতরণ করে নাই। অবতারণার পরেই বীণা বংশী শিঙ্গারবে বৈষ্ণব কবিগণ মাতৃ-ভাষার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সে সম্বর্দ্ধনাও অপূর্ব্ব। গোবিন্দ দাস প্রমুখ অসংখ্য বৈষ্ণব কবি বহুকাল ব্যাপিয়া মাতৃ ভাষার মঙ্গল-গীতি গাইয়া জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিশ্বোন্মাদিনী প্রেম-গীতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব জীবন পরিপূর্ণ? এমন প্রেমের মহোচ্ছাস, মহাভাবের প্রবল স্রোত অপরের যৌবনেও দুর্লভ। সাত্বিক বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব জীবনে যে অমৃতের মহাসিন্ধু রচনা করিয়াছিলেন, পাপভারাক্রান্ত বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশত চৈতন্যধর্ম্মের মন্দীভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই শেষে গরলে পরিণত হইয়াছে। অনেকে বলেন, নিত্যানন্দের প্রচারই গৌরাঙ্গের মহাভাব পূর্ণচন্দ্রকে মেঘাবৃত করিয়াছে, তাঁহারই প্রচারে বাঙ্গালী বৈষ্ণব, "মাছের ঝোল, কামিনীর কোল, হরি হরি বোল" সার করিয়াছে, ব্যভিচার ও নেড়া নেড়ীতে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্রাভিজ্ঞ, তাঁহারাই এ প্রবাদের সত্যতা বা অমূলকতা নির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, আমরা শুনা কথামাত্র লিখিলাম। কিন্তু মহা-প্রভু যখন পুরুষোত্তমে বাস করিতেছিলেন, তখন বঙ্গদেশ হইতে অদ্বৈত প্রভু দুঃখ করিয়া তাঁহাকে যে তর্জ্জাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল,
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল,
বাউলকে কহিও দেশ হইল বাউল,
বাউলকে একথা কহিল বাউল।"

এই তর্জ্জা পাঠে বুঝা যায় যে, চৈতন্য জীবিত থাকিতেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিকৃতি লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ ইহাও অনুমান করেন যে, অদ্বৈতের এই পত্র পাইবার পরে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি শ্রীক্ষেত্রের গোপীনাথের মন্দির

হইতে অন্তর্দ্ধান হন। মহাপ্রভু নীলাচলে বাসকালে নিত্যানন্দের প্রতি বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে নিতাই গৌরাঙ্গের দক্ষিণ বাহু ছিলেন, যে নিতাই এক সময়ে ভাবোন্মত্ত গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে ও দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যে নিত্যানন্দ জগাই মাধাইর উদ্ধারকল্পে মহাপাপাবে অসীম প্রেম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহা হইতে কেন যে দুর্ভাগা বঙ্গে বিপদ-পাত হইল, তাহা ভাবিলেও হৃদয় বজ্রাহত হয়, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। যাহা হউক্ বৈষ্ণব সাহিত্যের উচ্চ মর্ম্ম সাধারণ বৈষ্ণবগণের অবোধ্য হওয়াতে দেশের ও বৈষ্ণব সমাজের চরমদুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাব উচ্চ ও আধ্যাত্মিক হইলেও তাহা রূপকাকারে লিখিত। নরনারীর প্রেমবিলাস ও হাবভাবে শরীর গঠন করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ সেই অনিত্য দেহে পরম আধ্যাত্মিকতার মহাপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবোধ বৈষ্ণবগণ সত্যের ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে না পারিয়া সুধু অসত্য অনিত্য বস্তু লইয়া পাপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে, আপনারাও ডুবিয়াছে, দেশকেও ডুবাইয়াছে, এই সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের একরূপ মৃতদশা উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গের অনেক সুসন্তান এই মহারত্ন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টাকে সাধুবাদ। কিন্তু দুর্ব্বলচরিত্র বাঙ্গালী-কর্ত্তৃক এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে কি না, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।

বৈষ্ণব সাহিত্য বা বাঙ্গলা ভাষার প্রথম যুগের সাহিত্যের সমালোচনাতে আমরা একটী সুন্দর উপদেশ পাইতেছি। প্রথম কথা সত্যকে রূপকাবরণে আবৃত করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নীরস মোহান্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণের চক্ষুতে উলঙ্গমূর্ত্তি সবল সত্যের প্রখর জ্যোতি অনেক সময়ই অসহনীয় হয়। এইজন্য তাহাদিগকে সত্যের পানে আকৃষ্ট করিতে অনেক মহাপুরুষ রূপকের আশ্রয় লইয়া থাকেন। বিশেষত, অতি সহজে পাইলে সাধারণ জনগণের নিকট সত্যের মূল্য এবং আদর যেন কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। এইজন্য অনেকে সত্যকে রূপকের কঠিন আবরণে আবৃত করেন। কিন্তু অনেক সময়ই জনসমাজের উপরে তাহার বিপরীত ফল ফলে। সাধারণত, মানুষ রূপকের গর্ভস্থ মূল তত্ত্ব অবধারণ করিতে না পারিয়া সহজার্থই গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে মূল সত্য কালে বিকৃত আকারে পরিণত হয়। বিকৃত সত্য মানব-সমাজের উপরে অতি বিষময় ফল প্রসব করে। সত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, অতি ধীরে ধীরে কার্য্যকর হইলেও সেই সৌন্দর্য্যের মানসাকর্ষণী শক্তি আছে, সত্য প্রচারকের এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। সৌন্দর্য্যের ন্যায় সত্যের মহামূল্যতাও অতি স্বাভাবিক। কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টাতে সত্যের স্বাভাবিক মূল্যবত্তায় অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ, তাহাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জনসমাজের নিকট উপস্থিত কর, তাহা যদি প্রকৃত সত্য হয়— প্রকৃত স্বর্গীয় আলোক হয়, তবে তাহার জয়ের জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে

না। সত্যের জয়-পতাকা সত্যের সেনাপতি স্বয়ং ভগবান স্বহস্তে ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে ধাবিত হন। সত্যের জয় মানবীয় চেষ্টার অতীত, সম্পূর্ণ নৈসর্গিক।

দ্বিতীয় কথা, অতি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবকেও সাধারণ মানবীয় বাসনার কুৎসিৎ বর্ণে রঞ্জিত করিলে, তাহা হইতে সাধারণত জন-সমাজের মহদপকার সংঘটিত হয়। প্রথমত, এক দল মানুষ স্বভাবতই স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন। কখনো অল্প শিক্ষা, কখনো বা স্বভাব ইহার কারণ হয়। তাহারা ঐন্দ্রিক লালসার নিয়ে অবরুদ্ধ পূর্ব্বক গূঢ় ভাব গ্রহণ না করিয়া আপাতে-বোধ্য সহজ ভাবই গ্রহণ করে। এই জন্য সাধারণ বৈষ্ণবগণ রাসাদির স্থূল ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছে, দেশের অপামর সাধারণের চক্ষে রাধা কৃষ্ণের প্রেম সামান্য মানবীয় অবৈধ প্রেমমাত্রে পরিগণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানে উচ্চাসন লাভ করিলেই অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় না। এই জন্য, এক দল লোক রূপকের মর্ম্মার্থ বুঝিলেও উপরে উপরে ভাসিতে থাকে। রূপকে বাহ্যাকর্ষণ বা লালসার উদ্দীপনা থাকিলে তাহা তাহাদিগকে সহজে চরিত্রের অধোদেশে লইয়া যায়, লালসার উদ্দীপক শব্দ শুনিলেই তাহাদের ইন্দ্রিয়-বাসনা জাগরিত হয়। এইরূপ জ্ঞানীর পক্ষে রূপকের জটিলতা অজ্ঞানীকে ভুলাইয়া বাসনা চরিতার্থ করিবার দ্বার স্বরূপ হয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারী গোস্বামীদিগের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ অনেক সময়ই এ কথার সমর্থন করে।

আবার যাঁহারা লালসার অতীত হইয়াছেন, চরিত্রে অটল হইয়াছেন, জ্ঞানে প্রাজ্ঞ হইয়াছেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষা সত্যকে কেহই না পারিব সাজে সাজাইয়া মনোমোহন করিতে হইবে।

যাহা হউক, বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরবর্ত্তী কোন যুগেই তাহা দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণব কবিগণই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ব প্রথমে জীবনচরিত, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, কাব্য ও সঙ্গীত লিখিয়াছেন। বৈষ্ণবগণই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবর্ত্তক, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ...র্গি ও চণ্ডীদাস চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক জন বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভাগবতানুমোদিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই তাঁহার বর্ণনার বিষয় ছিল। এই জন্য তাঁহাকেও আমরা বৈষ্ণব লেখকগণের মধ্যেই পরিগণিত করিলাম।

বাঙ্গলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ বৈষ্ণব যুগের পরবর্ত্তী যুগে পাঁচজন বিখ্যাত অবৈষ্ণব কবি বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে জীবন যাপন করিয়াছেন। কীর্ত্তিবাস, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ, মুকুন্দ নারায়ণ ও ভারতচন্দ্র। এই পাঁচ জনই দ্বিতীয়যুগের প্রধান বাঙ্গালা সাহিত্য সেবক। কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের প্রস্তাব সম্বন্ধীয় মৌলিকতা না থাকিলেও রচনার সারল্য ও পারিপাট্য অতি মনোজ্ঞ। সামান্য মুদী হইতে ভদ্র সন্তান পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকলেই কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামের প্রসাদে আজ বাল্মীকি এবং ব্যাসের সুধা-নিঃস্রাবিণী লেখনীর অপূর্ব্ব ফল অতি সহজে উপভোগ করিতেছে। তাহারই ফলে বাঙ্গালার সামান্য স্ত্রীলোকও দুই চারিটা শাস্ত্রের কথা

বলিতে পারে। বস্তুত কীর্ত্তিবাস ও কাশী-রাম বাঙ্গালী হৃদয়ে চিরদিন রাজত্ব করি-বেন। কথক ও গায়কের মুখ হইতে শুনিয়া সামান্য সংগ্রহ-পুস্তক লিখিয়াও তাঁহারা একটী বিস্তীর্ণ জনসমাজের পরিচালন কার্য্যে যেরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, জগতে অসাধারণ প্রতিভা এবং মৌলিকতার পরিচয় দিয়াও অল্পসংখ্যক গ্রন্থকারই এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকে একখানি উপা-দেয় মহাকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি ইহাতে যেমন রচনাচাতুর্য্য, তেমনই কবিপ্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা একখানি মৌলিকতাপূর্ণ সামাজিক কাব্য-গ্রন্থ—তৎকালীন বঙ্গসমাজের আচার ব্যবহারের একখানি অপূর্ব্ব দর্পণ বা আলেখ্য। চণ্ডী এক সময়ে গৃহে গৃহে গীত হইত। এখন আর সে দিন নাই। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির জগতে যেমন আমরা ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, পদ-ধূলি লেহন করি, সাহিত্যজগতেও আমরা সেইরূপ ইংরেজের উদ্বমিত পদার্থরাশির প্রসাদ পাইয়া কৃত কৃতার্থ হই। চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের এবং মুকুন্দরামের সম্পূর্ণ মৌলিক ও কবি-প্রতিভা-পূর্ণ দোষোৎপন্ন ভাবামৃত আমাদের মত নর পিশাচের নিকট কখনই সমাদৃত হইতে পারে না। উচ্ছিষ্ট কণ্টক-ভোজী কুক্কুরের নিকট দেবভোগ্য নৈবিদ্যের আদর কখনই সম্ভবে না। আমাদের শরীরের প্রতিরক্তবিন্দু অধীনতার পূতিগন্ধ-দূষিত। আমাদের স্ত্রী পুত্র দেশ অপরে রক্ষা করিবে, আমরা সুখে ঘর বাঁধিয়া নিদ্রা দিব, আমাদের সামাজিক কুনীতি দুর্নীতি অপরে শোধন করিবে, আমরা পরমপূজ্য আর্য্য-সন্তান বলিয়া বারবার চীৎকার তুলিব, আমাদের বস্ত্রাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপরে সংগ্রহ করিবে, আমরা ব্যবহার করিয়া জগতের ভার বৃদ্ধি করিব, অপরে পড়াবে, আমরা পরকীয় ভাষায় ময়না ও টিয়াপাখীর মত কথা কহিব, বক্তৃতার কোলাহল তুলিব, এই আমাদের জীবনের ব্রত। "শেলি" করে হাসিয়াছিলেন, "ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ" কেমন করিয়া কাসিতেন, "টেনিসন্‌" কেমন করিয়া পা ফেলেন, ইহাই মুখস্থ করিবার আমরা সময় পাই না, কখন আর দেশের কবিবৃন্দের কথা ভাবিব? দেশের ভাষা, স্বাধীন চিন্তা, আমাদের কেন ভাল লাগিবে? "ট্রাফাল্‌গারে" নৌযুদ্ধে "নেল্‌সন" কেমন করিয়া মরিয়াছিলেন, "ওয়াটার্লু্র" মহাযুদ্ধে "নেপোলিয়ন" কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন, "ওয়েলিংটন" কিপ্রকার বৃাহ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তো আমরা অতি যত্নে কণ্ঠাগ্রে সঞ্চিত করিয়াছি, তবে আর দেশে কখন কে ছিল না ছিল, কে কি করিয়াছিল কি না, তাহা জিজ্ঞাসা কর কেন? বাঙ্গালার যদি কখন দিন ফেরে, তবে একদিন এই সকল পূজ্যপাদ দেশীয় কবিবৃন্দের সমাদর বাড়িবে, নতুবা আজি-কার মত চিরদিনই তাঁহাদের কথা পাড়িয়া অরণ্যে রোদন করিতে হইবে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ একখানি বিদ্যা-সুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। ভক্ত রাম-প্রসাদের মালসী বাঙ্গলা ভাষার একখানি অপূর্ব্ব অলিখিত সাহিত্য। বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা এবং ভক্ত রাম প্রসাদ একই ব্যক্তি কিনা, নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। রাম-প্রসাদের মালসী এখন প্রসাদসঙ্গীত নামে

গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। রাম প্রসাদের সঙ্গীতাবলী ধর্ম্ম রাজ্যের অপূর্ব্ব রত্ন। ইহা শুনিলে পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়, নাস্তিক বিশ্বাসী হয়। ইহার রচনাও অতি সরল এবং আপামর সাধারণের বোধ্য। রাম প্রসাদও বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাম প্রসাদের মালসীতে অনুকরণের লেশও নাই।

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, আরো কত কি হিজি বিজি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের লিখিত। ভারতচন্দ্র ছন্দ বন্ধ এবং লিপি চাতুর্য্যের জন্য যদি গুণাকর উপাধি পাইয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। মুকুন্দ রামের চণ্ডী পড়িয়া অন্নদামঙ্গল হাতে করিলে নূতন কল্পনার জগতে ভারতচন্দ্রকে অতি হীন বোধ হয়। কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের প্রস্তাব লইয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যা সুন্দর লিখিত। ভারত বিদ্যাসুন্দরে আদিরস রূপ হলাহল সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন। ইংরেজ কলঙ্ক "রেনল্ডস্কে" বিদ্যাসুন্দর লেখক ভারতচন্দ্র অশ্লীল ভাবের অবতারণায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। তিনি হলাহল সমুদ্র মন্থন করিয়া মহাপাপ পিশাচের এক ভীষণ মূর্ত্তি উত্তোলিত করিয়াছেন, যে বিদ্যাসুন্দর হাতে করিয়াছে, তাঁহারই ঘাড়ে সে দানব চিরতরে চাপিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ একভাবে সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র আর এক ভাবে বাঙ্গালীর স্মরণীয় হয়েছেন। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কত নর নারী পাপের অতল সমুদ্রে ডুবিয়াছে, কে জানে? সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গরমণীগণ লেখাপড়ায় সাধারণত অনভিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের উপরে এ বিষময় ফল অধিক পরিমাণে ফলিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যভিচারদোষ যে বাঙ্গালী পুরুষের নিকট দোষ বলিয়াই গণ্য নয়, বরং পুরুষোচিত কাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরেরই গুণে। মলমূত্রে মেতরের ঘৃণা কম কেন? অভ্যাসের গুণে। শত কণ্ঠ পাপের গুণ গাইবে, পাপের ছবি তাম-দগ্ধ লৌহশলাকায় হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঁকিবে আর পাপ তোমার অভ্যাস পাইবে না, কে বলিল? সংগ্রন্থ যেমনই জন সমাজকে উন্নত করে, অসদ্গ্রন্থ তেমনই মানব সমাজকে অধঃপাতে লইয়া যায়। কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দরের কুৎসিত ভাবের নিম্নেও আধ্যাত্মিকতা দেখিতে পান। আমরা এরূপ নরকনিহিত আধ্যাত্মিকতাকে দূর হইতে শত সহস্র প্রণিপাত করি। অনেকে হীরামালিনীর হাব ভাব চকমকে ঝকমকে চরিত্রকে ভারতের প্রতিভার অদ্ভুত ফল বলেন, আমরা বলি, এমন প্রতিভার মুখে আগুন। রুচির বিদ্রূপকারী, জগতের সকল লোকের ম্লেচ্ছ-সংশোধনকারী, সনাতন ধর্ম্মের নিশান ধারী "বঙ্গবাসী" পত্রিকার দলবল ভারতের গুপ্তপ্রায় হলাহল নবীন চিত্রবিচিত্র গম্ভ পাত্রপূর্ণ করিয়া বিদ্যালয়ের অবোধ ছাত্রদিগকে পর্য্যন্ত অমৃত বলিয়া পান করাইতেছেন, আর কিছু কিছু পয়সা আদায় করিতেছেন। ইঁহারা বঙ্গের সুসন্তানই বটে! বলি, এত পাপে দেশ প্লাবিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়াও কি তোমাদের পাপের পিপাসা, অর্থের লালসা দূর হইবেনা? রুচি বেচারি পৃথিবীত জন্মিয়া তোমাদের চরণে যে শত অপরাধ করিয়াছে, ইহাতে আর ভুল কি? বটতলার অস্পষ্ট ছাপায়, যাত্রায়, নাটকে বিদ্যাসুন্দর বহুকাল হইতেই দেশের সর্ব্বত্র বিস্তারিত রহিয়াছে। ইহার

পরে আবার তাহার নূতন বাহনের কি প্রয়োজন হইয়াছিল, জানিনা।

কবিওয়ালাগণের কবি বঙ্গীয় সাহিত্যের সাময়িক কলেবর বৃদ্ধি সম্বন্ধে দ্বিতীয়, তৃতীয় উভয় যুগেই বিশেষ কার্য্য করিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে সময় সময় উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সে সকলের অধিকাংশই গ্রন্থবদ্ধ না হওয়াতে সময়ের সঙ্গে লোপ পাইতেছে। নিধুর টপ্পা এবং দাশরথির পাঁচালী এক সময়ে অতি আদরের জিনিষ ছিল, এখনও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। কিন্তু কবিওয়ালাগণ লাল ছড়া এবং অশ্লীল তর্জ্জায় এক সময়ে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ভারতচন্দ্রই তাহা অশ্লীল ভাবের দ্বার খুলিয়া দিয়া দেশের লোকের এই কুৎসিত রুচি বাড়াইয়া দিয়াছেন। কবিওয়ালার ছড়া ও তর্জ্জাদি তাঁহারই কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। কি পরিতাপের কথা! এক সময়ে বারোয়ারি ও দুর্গোৎসবাদিতে এ দেশের পুরুষ রমণী একত্র হইয়া কবিওয়ালার কুৎসিত গালিগালাজ শুনিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না, এখনও এ প্রথা একবারে নির্ম্মূল হয় নাই। যে কথার আভাসে কাণে হাত দিতে হয়, আর সেই কুৎসিত কথা একটী ভদ্রলোক মাতা ভগ্নী স্ত্রী পুত্র কন্যা শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে লইয়া অকাতরে শুনিতেছেন এবং বাহবা দিতেছেন! হায়! ইহার অপেক্ষাও কি অমানুষিক কার্য্য আছে? এই দেশের লোক কি চরিত্র এবং সুরুচির দাবি করিতে পারে? যাহা হউক, এইরূপে বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ ভারতের অশ্লীল ভাষা এবং কবিওয়ালার কুৎসিত গালিগালাজ রাশির নিম্নে সমাহিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর চরিত্র রূপ প্রাসাদ ভগ্ন এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলাসাৎ হইয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের তৃতীয় যুগের দ্বার ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি কর্তৃক প্রথম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই দ্বার দিয়া বঙ্গমাতার অনেক সুসন্তান রঙ্গ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এই যুগের প্রথম হইতেই বঙ্গের রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম নীতি, রুচি ও ব্যবহার সমস্তই ইংরেজি ভাবের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মুসলমান বিজেতাগণ ভারতের শস্য শ্যামল ভূভাগে আধিপত্য স্থাপন করিয়াই কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন, ভারতের মানসিক জগৎ একরূপ অস্পৃষ্টই ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইংরেজগণ এদেশের মৃত্তিকার সঙ্গে দেশবাসীর মন প্রাণ হৃদয় সকলই অধিকৃত করিয়াছেন। সামান্য আহারে, পরিচ্ছদে, এমন কি শুদ্ধ নিশিথিনী গর্ভস্থ প্রণয়ী প্রণয়িনীর মধুর বিশ্রমালাপে পর্য্যন্ত ইংরেজের লোহিতাভ শুভ্র মূর্ত্তির ছায়া পতিত হইয়াছে। সাহিত্য আর কোন ছার। যে ব্যক্তি ইংরেজের ভাষায় কল্পনা করে, ইংরেজের মাথায় চিন্তা করে, ইংরেজের মুখে কথা বলে, তাহার লিখিত সাহিত্য যে ইংরেজ-সাহিত্য-কারের বমিত উদ্বমিত পদার্থ মাত্র হইবে, তাহা অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করাই মূঢ়তা। এই যুগে বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে অনেক প্রতিভা-ভাস্বর জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সমুদয়ই চন্দ্রের ন্যায় উপগ্রহ মাত্র, তন্মধ্যে একটীও সূর্য্য বা মূল নক্ষত্র নাই। বস্তুত, যিনিই যত লিখুন, যিনিই যত প্রতিভার পরিচয় দিউন, কিছুই যেন ইংরেজির ছায়া কলঙ্কিত না হইয়া আপন পায়ে

ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারেনা। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সময়কে পশ্চাতে রাখিয়া অক্ষয়-কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি অনেকেই আসরে নামিয়াছেন, অনেকেরই গান খুব জমিয়াছে। কিন্তু চণ্ডী-দাস, গোবিন্দ দাস, মুকুন্দ রামের প্রতিভার ছায়াও কেহ মাড়াইতে পারেন নাই। সতীর প্রেম এবং কুলটার প্রেমে যত তফাত্, এ উভয় দলের কাব্যরসেও তত তফাৎ তফাৎ ভাব। যাহাহউক্, এ বিষয় আমাদের ঠিক সমালোচ্য নয়।

তৃতীয় যুগের সাহিত্যে খুব মৌলিকতা না থাকিলেও, তাহা বঙ্গ সমাজকে এক নূতন ভাবে আলোড়িত এবং আন্দোলিত করিয়াছে। এই আলোড়ন কার্য্যে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা এবং স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের গ্রন্থাবলীই সর্ব্ব প্রধান। স্বর্গগত মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা এবং উপদেশ প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্বাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত, পরে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের উচ্চ নৈতিক ভাব উচ্চ শিক্ষিতদিগের চরিত্রেই প্রতিফলিত হইতে পারে। অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত-দিগের চরিত্রের উপরে দেশীয় সাহিত্যের প্রভাবই কার্য্যকারী হয়। এদেশে কয়টী নীতিমান উচ্চ শিক্ষিত লোক এতৎ পূর্ব্বে দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেন, তাহা আমরা ভাল রূপে জানিনা। কিন্তু অক্ষয় কুমারের গ্রন্থ পড়িয়া এদেশের সহস্র সহস্র নরনারী যে সুনীতি ও সুসংস্কারের মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, ইহাতে ভুল নাই। আজ কাল অনেক বাঙ্গালীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে শুনা যায়, ইয়ুরোপের সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক অসভ্যোচিত কুসংস্কার আছে। সংস্কারের এত তীক্ষ্ণ জ্ঞান কি অক্ষয় কুমারের যত্নের ফলেই আমরা লাভ করি নাই? অশ্লীল কবির ছড়া, এনর্জিবাহের গান, বাই খেমটার নাচ গান যে অতি জঘন্য রুচির কার্য্য, ইহা কি অক্ষয় কুমার দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে অঙ্কিত করেন নাই? মদ্য মাংসের প্রতি অশ্রদ্ধা, অকপট বন্ধুতা ও পবিত্র আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের প্রতি অনুরাগ কি অক্ষয় কুমারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে হৃদয়ে সঞ্চয় করেন নাই? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাষায় যেমন যুগান্তর ঘটাইয়াছেন, বিধবা বিবাহ প্রতি-পোষক ও বহু বিবাহের প্রতিরোধক গ্রন্থাদি লিখিয়া সামাজিক কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিতেও তদ্রূপ ভূয়োসী চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ও তৎ সহযোগীদের লেখনী বঙ্গ সমাজের যে উপকার করিয়াছে, তাহা বহু শতাব্দীর পরে বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাস-লেখক গম্ভীর সমাহিত চিত্তে ভাবিয়া লিখিবেন, এ হাসি ভাষায়, এ বিদ্রূপের দিনে আমরা তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিয়া তাহার গৌরব নষ্ট করিব না। অতি নীরবে সমাজ হইতে বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ অন্তর্হিত হইতেছে, জাতি-ভেদের কঠোর নিয়মের মূল বন্ধন শিথিল হইয়াছে, মান-বের ধর্ম্ম বিশ্বাস অতি সূক্ষ্মরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সমাজ সংস্কারে ও উদার ধর্ম্ম মতে সমাজ প্রতি দশ বৎসরে উন্নতির এক একটী ধাপ অতিক্রম করিতেছে, দিন দিনই আবার বাঙ্গালীর মনে সত্যনিষ্ঠা এবং স্ত্রী পুরুষ অভেদে চরিত্রবত্তার আদর বাড়িতেছে, জ্ঞানানুশীলন এবং যৌক্তিকতার প্রতি

অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, ন্যায় বিচার এবং সত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, আত্ম মর্য্যাদা এ ং বিবেকের স্বাধীনতা মানব মনকে জাগরিত করিতেছে, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান উন্নতির ইতিহাস-লেখককে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই যে সুলক্ষণ সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার মূল কারণ কি? ইংরেজের জ্ঞান বিজ্ঞান পাঠে ও তাঁহাদের সংশ্রবে দেশীয় শিক্ষিত লোকের এ বিষয়ে অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ একটা ঘটনা মাত্রই ইহার মূল কারণ নয়। ইতি পূর্ব্বে যে মহাত্মাদিগের কার্য্য কলাপের অতি সামান্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল, তাঁহাদের মহতী চেষ্টার ফলেই যে বঙ্গ সমাজে এই সকল উন্নতির সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গের সুলেখক এবং সুসন্তান বঙ্কিমচন্দ্রও বর্ত্তমান জীবনে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহার "বঙ্গদর্শন" মাতৃভাষার প্রতি দেশবাসীর প্রাণে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার করিয়াছে, ইঁহার "আনন্দ মঠ" ও "সীতারাম" দেশের লোককে অনেক সৎশিক্ষা প্রদান করিতেছে, ইঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব" ধর্ম্মের দিকে দেশবাসীর চিত্তাকর্ষণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীত এবং কবিতার রাজ্যে রবীন্দ্র নাথ এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রচুর সুরুচি ও সদ্ভাব আনয়ন করিয়াছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ধনে মানে যেমন দেশবিখ্যাত, মাতৃভাষার উন্নতি সাধনেও বঙ্গবাসীর নিকট বাঙ্গালার ইতিহাসে তেমনই চিরস্মরণীয়তা লাভ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনন্ত গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ গ্রন্থ এবং স্বনাম খ্যাত দ্বিজেন্দ্রনাথের "তত্ত্ববিদ্যা" প্রভৃতি বঙ্গভাষার অমূল্য অলঙ্কার। ঠাকুর-সাহিত্য-ভাণ্ডার সুরুচি, সদ্ভাব, চিন্তা ও কবিত্বের সমাবেশ ক্ষেত্র। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, কয়েক বৎসর হইতে যেন দেশের ভাল দিকে গতি কিছু মন্দীভূত হইয়াছে। সমাজের সুসংস্কার এবং ভাল কাজে এত বিদ্রূপ ও শিথিলতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দিন দিনই যেন সমাজের সর্ব্বাঙ্গে এই রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে কিছু দিন পূর্ব্বে দেশের লোক অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এ শ্রদ্ধার মূলে যে ভ্রম ছিল, তাহা নহে। বস্তুতই তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র অনেক পরিমাণে নির্ম্মল স্বভাব ছিলেন। মিথ্যা, ব্যভিচার ও অন্যায়াচারের উপরে সত্য সত্যই তাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল। দেশের যে কোন সৎকাজে ও সুসংস্কারে তখন ইঁহারাই প্রধান অস্ত্র স্বরূপ হইতেন। আর যেন সে দিন নাই।

সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলির এমন দুর্গতি হইয়াছে যে, তাহারা যেন সময়ের স্রোতের সহিত চলিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইবার উপক্রম করিয়াছে। আবার "সঞ্জিবনী", "বঙ্গবাসী" ও "সময়" প্রভৃতিতে সেই ঈশ্বর গুপ্ত এবং গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মেয়েলি কোঁদল উপস্থিত। "সোমপ্রকাশ", "সাধারণী", "নববিভাকর" প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় ভাষার সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে হীনতেজ ও অন্তর্হিত হইতেছে। বঙ্গদর্শনের সময়ানুপাতে উন্নত সাময়িক পত্রিকারও প্রায়

অভাব। কয়েক বৎসর হইতে সময়োপযোগী উচ্চ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট সাহিত্যও অল্পই বাহির হইতেছে। বরং তৎপরিবর্ত্তে চিনিবাসচরিত, পাঁচুঠাকুর, মণ্ডলভগ্নী, বেশ্যাচরিত, কলিকাতারহস্য প্রভৃতির ন্যায় অতি জঘন্য রুচির চিন্তাবিহীন, নিম্নশ্রেণীর পুস্তকেরই আদর বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন হইল, বঙ্গের একজন প্রধান লেখকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, দাম না উঠিলে বই লিখিয়া লাভ কি? বস্তুত কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, সমাজে অদ্যাবধি তাহার কিছুমাত্র যথোপযুক্ত আদর হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য দ্বারাই সহজে সমাজের গতি নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি বড় মন্দ দিকে গড়াইয়াছে। উপহারের জোরে অরুচি, কুরুচি সকলই বিকাইয়া যাইতেছে। কুলোক এবং কুলেখকেরই পসার বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভাল লোক এবং ভাল লেখকেরা উপহাররূপ ঘুষ দিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের লেখারও আদর বাড়িতেছে না। এই জন্য খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে অনেকেই কাগজ কলম তুলিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু সাহিত্যের এইরূপ দুর্গতিতে দেশের সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর নীতিজ্ঞান এবং রুচির অপকৃষ্টতা প্রমাণিত হইতেছে। সমাজের এ অবস্থা যে অধোগতির, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অধোগতির মূল কারণ কি এবং কি উপায়ে ইহা দূরীভূত হইতে পারে, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অনেকে বলেন, বঙ্গবাসী প্রভৃতির ন্যায় পত্রিকার প্রভাব বৃদ্ধিই এইরূপ ঘটিবার একটী প্রধান কারণ। এই কথার মূলে প্রচুর সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী কথা ভাবিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও হয়। ঐ সকল পত্রিকা যাঁহাদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, তাঁহারা কোনরূপেই দেশের গণ্য, মান্য বা বিখ্যাত লোক নহেন। ঐ দলের অধিকাংশ লোকই অৰ্দ্ধশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত এবং নগণ্য। ইঁহাদেরই কথায় যে সমাজের গতি ফিরিয়া দাঁড়ায়, সে সমাজ কতদূর উন্নত, তাহা এক কথাতেই বুঝা যাইতে পারে। তবে যদি বল, উপহারের জোরে তাঁহাদের কথা তাঁহারা লোকের কাণে তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং লোক তাহা শুনিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। প্রথম কথা, দুসের লোভে যে জনসমাজ সদসদ্বিবেচনাহীন হইতে পারে, তাঁহারা নিজেরাই দুর্ব্বল। দ্বিতীয় কথা উপহারের পূর্ব্বেও বঙ্গবাসী দেশে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আমাদের মনপ্রাণের অপকৃষ্টতা আরো প্রমাণিত হইতেছে। আমরা দুর্ব্বল, আমাদের রুচি ও আশয় বিষয় অতি অপকৃষ্ট, তজ্জন্যই মন্দ সাহিত্য প্রচারিত ও আদৃত হয়। সুতরাং বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকাই আমাদের অধোগতির প্রধান কারণ নয়, বরং তাহা আমাদের অধোগতির লক্ষণ-প্রকাশক।

অনেকে বলেন, উপর্য্যুপরি দেশের অনেক বড় লোকের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। কৃষ্ণদাসাদির ন্যায় বড়লোকদিগকে হারাইয়া বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার কিছুমাত্র ক্ষতি হইয়াছে, বলা যায় না। বাবু রাজকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মত লোকের মৃত্যুতে বঙ্গভাষা সত্য সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্য দুইই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে মহাত্মার মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবীর ক্ষতি হইয়াছে, সেই গৌরবান্বিত কেশবচন্দ্রকে হারাইয়া বঙ্গমাতা যে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে আর ভুল কি? পরন্তু রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাসাদির মত লোকের হানিতেও যে আমাদের সমাজের বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটী লোকের হাতের উপরে যে সমাজ দাঁড়াইয়া থাকে তাঁহার নিজের হাড়ে বল নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। লোকের ত মরণ আছেই, সুতরাং বড়লোকের আশ্রিত সমাজেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। এই পতনেও সমাজের বা দেশের দুর্ব্বলতা প্রমাণিত হয়।

বস্তুত, আমরা শিশুর মত পরের হাত ধরিয়া 'হাঁটি হাঁটি পা পা'' করিয়া, এক পা, দুই পা উন্নতির পথে চলিতেছি মাত্র। আমাদের আভ্যন্তরীণ এবং স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা প্রচুর। যে যাহা বলে, আমরা তাহাই শুনিয়া হুজুগে মাতিয়া গড্ডালিকা-প্রবাহে ছুটিতে, নাচিতে ও খেলিতে থাকি। গম্ভীর চিন্তা শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, হৃদয়ের প্রসারিতা হইতে আমরা অনেক দূরের জীব। এইজন্য আমাদের প্রকৃতি জলের মত। আমাদিগকে যে যেমন ঘটনা রূপ পাত্রে স্থাপিত করে, আমরা তাহারই আকার ধারণ করি, বস্তুত আমাদের জাতীয় একটী নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আকার নাই। কুলোকেরা এই মহা সুযোগ পাইয়া দিন দিন নূতন নূতন হুজুগ তুলিয়া অনায়াসে দুই পয়সার সঙ্গে সঙ্গে নাম ও পসার কিনিয়া লইতেছে। ভাল লোকেরা এই ঠগীর ঠকাম হাঁ করিয়া দেখিতেছেন।

আমরা অধঃপতিতই, আমাদের অধঃপতনের নূতন কোন কারণ নাই। বহুকাল হইতে অধোদিকে আহত হইয়া যে বেগ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে দিন দিন অধঃ হইতে অধোতে লইয়া যাইতেছে। শূন্যস্থিত ভাঁটার ন্যায় যে খুষি আমাদের গতি ফিরাইতেছে। আমরা কখনও উন্নতির স্বপ্ন দেখিতেছি, কখনও অধঃপতন কল্পনা করিয়া কাঁদিতেছি। এই অধঃপতিত জাতির উদ্ধার অবশ্যই ভগবানের হাতে, তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু ভগবানের ক্রিয়া মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়। সেই শক্তি কখন্ কোন্ মানবে অবতীর্ণ হইবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং মানবের কর্ত্তব্যেরও শেষ নাই।

মাতৃভাষার উন্নতি সাধন এবং মাতৃভাষায় ভাল ভাল সদুপদেশ ও উদ্দীপনাপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা যে জাতীয় চরিত্র উন্নত হয়, ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি না। অক্ষয় কুমার দত্ত-প্রমুখ দেশীয় গ্রন্থকার বঙ্গসমাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না বা অস্বীকার করিব না। সমাজগঠন ও সমাজের উন্নতি সাধনে সাহিত্যের অতুলনীয় শক্তি এ দেশে এবং অপর দেশে যুগে যুগে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্যই এই প্রবন্ধের প্রথমে নানা সময়ের সাহিত্যের কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি। বঙ্গসমাজের উন্নতিও যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজ কাল মাতৃভাষার সেবাব্রতে অনেকেই সময় ব্যয় করিতেছেন। এ অতি শুভ লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল প্রতিভা-সম্পন্ন সংলোক বাঙ্গালা সাহিত্যের আপাত উপস্থিত দুর্দ্দিন দেখিয়া লেখনী সংযত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বদ্ধপরিকর হইয়া রঙ্গক্ষেত্রে নামিতে আমরা সানুনয়ে আহ্বান করিতেছি। অনেক সুপণ্ডিত বাঙ্গালী বিদেশীয় ভাষার চর্চ্চায় যে পাণ্ডিত্য ও যে চিন্তা ক্ষয় করিতেছেন, তাহা কি মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিলে ফল কম হইবে? মাতৃভাষার উন্নতির গর্ভেই জাতীয় মহাসমিতির শক্তি এবং সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি নিহিত। দেশ কি সত্য সত্যই প্রতিভা-সম্পন্ন সাধু সজ্জন শূন্য হইয়াছে? বঙ্গবাসী ভদ্র সন্তান মণ্ডলীর ও পাঠকবৃন্দের কি রুচি ও মানসিক অবস্থা সত্য সত্যই হীন হইয়াছে? এ দেশে কি চিরদিনই কুরুচি, মিথ্যা ও অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইবে? বাঙ্গালা-সাহিত্য কি চিরতরে কতকগুলি দায়িত্বহীন গ্রন্থকারের অর্থ ও প্রশংসা লাভের যন্ত্র মাত্রই থাকিবে?

আমরা বলি, যতদিন দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুলোকের হাতে সাহিত্যের সমগ্র ভার না পড়িবে, ততদিন সমাজের কল্যাণ হইবে না। যেন তেন উপায়ে কিছু অর্থ বা পসার লাভের জন্য যাঁহারা গ্রন্থ লিখেন, তাঁহাদের মত সমাজশত্রু অল্পই আছে। সাহিত্য এক মহাযোগসাধনা, ইহার রচয়িতা নিন্দা, প্রশংসা এবং অর্থ-লালসার অতীত মহাযোগী হইবেন। অনেকে বই লেখাকে একটা ব্যবসায় মাত্র মনে করেন, অনেকে হাতের লেখা ছাপায় তুলিলেই কৃতার্থ হন। কিন্তু হাতের লেখা ছাপায় তুলিয়া শত সহস্র লোকের নিকট পাঠান যে কত দায়িত্বের কাজ, তাহা একবারও ভাবেন না। একটী কথা লিখিবার পূর্ব্বে তাহা মানব মনের উপরে কিরূপ কাজ করিবে, শতবার ভাবা উচিত। সাহিত্যই সমাজের সঞ্জীবনী মন্ত্র, সাহিত্য সত্য সত্যই মৃতপ্রাণে জীবনীশক্তি সঞ্চারে সমর্থ। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই আমাদের সাহিত্য কলোকের কুবাসনা সাধনের যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যে সাহিত্য-সমাজ-দেহের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত রঙ্গালয়ের নাট্যামোদ এবং প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব আনন্দের ভিতর দিয়া সমাজের অস্থি মজ্জা ও প্রতি রক্তবিন্দু গঠন করে, তাহার দুরবস্থাতে দেশের কি ক্ষতি হইতেছে, একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪০)

অতঃপর গৌরচন্দ্র যে সব তীর্থ দর্শন করিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা তাহার আনুক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই, সংক্ষিপ্ত রূপে ইতস্ততঃ উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তৎকালে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ সম্প্রদায়, শ্রীবৈষ্ণব মধ্বা-

চার্য্য মঠের তত্ত্ববাদী প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ছিল; তাঁহাদের সকলকেই শ্রীচৈতন্য তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন করিলেন। বিদ্যানগরের পর শ্রীচৈতন্য গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। গোদাবরীর নামান্তর গৌতমী। বোধ হয়, গোদাবরীর শাখান্তর বৈনগঙ্গাই এখানে গৌতমী গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আহোবালেম নগরে যাইয়া রামানুজ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করিয়া সিদ্ধবট নামক স্থানে রামসীতা দেখিলেন। সিদ্ধবটে একটী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতিথি সৎকার করিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ নিরন্তর রাম-নাম জপ করিত। এখান হইতে গৌরচন্দ্র স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমঠে যাইয়া বামনমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে তিনি পুনর্ব্বার সিদ্ধবটে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত রামজপী ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু এবারে এক আশ্চর্য্য দেখিলেন যে, ঐ বিপ্র তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত রাম নাম ছাড়িয়া এখন নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জপিতেছে। আহারান্তে চৈতন্যদেব তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিল "তোমার প্রথম দর্শন প্রভাবে আমার চিরদিনের অভ্যাস ঘুচিয়া এই নূতন অভ্যাস হইয়াছে। তোমাকে কৃষ্ণনাম করিতে দেখিয়া আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক একবার 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়াছিলাম। সেই হইতে রাম নামের পরিবর্ত্তে আমার জিহ্বা হইতে কেবল কৃষ্ণ নামই স্ফূরিত হইতেছে ও আমার চিরকালের স্বভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম বাচক রামনামের ও কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণনামের গৌরবাধিক্য বর্ণন করিল এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে 'আপনাকে কৃষ্ণ স্বরূপ মনে হইতেছে।' তখন শ্রীচৈতন্য তাহাকে কৃপা করিয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বৃদ্ধ কাশীতে আসিয়া শিব দর্শন করিলেন। এবং তথা হইতে নিকটবর্ত্তী কোন এক সম্ভ্রান্ত গ্রামে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই গ্রামে তৎকালে ব্রাহ্মণ সজ্জন বহুবিধ লোকের বাস ছিল। তার্কিক, মীমাংসক, দার্শনিক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক প্রভৃতি নানা পণ্ডিতগণ এখানে বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধদিগেরও এক আশ্রম ছিল। কথিত আছে, এই সকল পণ্ডিতদিগের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছিল, এবং তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তি প্রভাবে সকলকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গৌরের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ইহা শুনিয়া বৌদ্ধাচার্য্য বিচার-জিগীষু হইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে গৌরের নিকট আসিয়া নব প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার নব প্রশ্নের বিচার্য্য বিষয় এই :—

১। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্তু মাত্র। ২। জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহা অবিদ্যা সমুৎপন্ন। ৩। অহং তত্ত্ব কি? ৪। পরলোকের অস্তিত্ব সম্ভবে কি না? ৫। বুদ্ধ দৃষ্টি লাভের উপায় কি? ৬। নির্ব্বাণ-তত্ত্ব কি? ৭। বৌদ্ধ দর্শন। ৮। বেদাদি অপৌরুষেয় কি রূপে? ৯। সগুণ ও নির্গুণবাদের প্রকৃতি কি? লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য স্বীয় অসাধারণ

তর্কশক্তি প্রভাবে এই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বৌদ্ধ মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক হইয়া গেলেন এবং বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। গৌরের বিষ্ণুভক্তির কথা শুনিয়া কতকগুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে নিরক্ত করিয়া এক থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণ, হরিনাম উচ্চারণ করিতে বলিলে তাহারা ঐরূপ করিল। তখন বৌদ্ধাচার্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া গৌরকে বিনয় মিনতি করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই প্রস্তাবের মূলে কত টুকু সত্য আছে, জানি না। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এখানে উল্লিখিত হইল।

মহাপ্রভু উপরোক্ত স্থান হইতে ত্রিপদী ত্রিমল্লে যাইয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করতঃ ব্যঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপদী নগরে রাম সীতা দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে ত্রিপতির পর্ব্বত। ইহারই শৃঙ্গ বিশেষের নাম ব্যঙ্কটাদ্রি। ব্যঙ্কটগিরি মান্দ্রাজের ৩৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শকাব্দার একাদশ শতাব্দীতে এখানে রামানুজাচার্য্য শিবমন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত করেন। ত্রিপদী নগর ত্রিপতির পাহাড়ে অবস্থিত। এখানেও রামানুজ প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার পর গৌরচন্দ্র পানা নরসিংহ দর্শন করিয়া শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া শিব পার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্ত্তমান চেঙ্গল পট্টু জেলায় পেলার নদী তীরে কঞ্জীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ নগর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকেই বৈষ্ণব গ্রন্থে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম বর্ত্তমান চিঙ্গল পট্টু ও আর্কট জেলার স্থানে স্থানে এই সকল তীর্থ দর্শন করিলেন, যথাঃ;—ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, পক্ষ-তীর্থ, বৃদ্ধকাল পীতাম্বর ও শিয়ালী ভৈরবী

গুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে নিরক্ত করিয়া এক থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল, কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা! হঠাৎ এক বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া ঠোটে করিয়া সেই থালি উর্দ্ধে লইতে গেলে বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পড়িল। থালিখানি তেরছে পড়াতে আচার্য্যের মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; আচার্য্য ধরায় পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বৌদ্ধগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের কোপে ঐরূপ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাদের গুরুকে বাঁচাইতে বলিতে লাগিল। গৌর তাহাদিগকে আচার্য্যের কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্বে শিয়ালী নগর দৃষ্ট হয়, এখানে ভৈরবীর মূর্ত্তি আছে। অনন্তর শচীনন্দন কাবেরী নদীর তীরে মহাবন, দেবস্থান প্রভৃতি স্থানে মহাদেব দর্শন করিয়া শৈবদিগকে বৈষ্ণব করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুম্ভকর্ণ তীর্থ, পাপনাশন তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া

প্রেমে বিহ্বল হইলেন। মাছরার পূর্ব্বদিকে শ্রীগৌরঙ্গ দ্বীপ কাবেরী নদীর দুইটী শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কথিত আছে যে, রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক রঙ্গনাথ বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীবাসদ্বীপ রামানুজ বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থস্থান, রঙ্গনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন ও নৃত্যকরিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন দেখিয়া বেঙ্কট ভট্টনামে সেই স্থান বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ গৌরের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইলেন এবং কীর্ত্তনাবসানে যত্নের সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। বেঙ্কট ভট্ট শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক। তাঁহারা তিন সহোদর—ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। বেঙ্কটের পুত্র গোপাল ভট্ট তৎকালে বালক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম চেষ্টা দেখিয়া বেঙ্কট এতই মুগ্ধ হইলেন যে, ভোজনান্তে তাঁহাকে বলিলেন যে, সম্প্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত। এই চাতুর্ম্মাস্যে তীর্থ পর্য্যটন অসম্ভব। অতএব আমি নিবেদন করি যে, এই চারিমাস আপনি এখানে থাকিয়া সুখে সময়াতিপাত করুন্। শ্রীচৈতন্য তাঁহার হইলে বেঙ্কট ভট্ট নিজগৃহে তাঁহার বাস-স্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া অতিভক্তির সহিত গৌরের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভট্টগৃহে চারিমাস কাল সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে কাবেরীতে স্নান করিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করা, দুই সন্ধ্যার সেখানে হরিনাম সংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি বিলাস করা, ভট্টের সহিত ভগবদ্বিষয়ক কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করা, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিণত হইল। বেঙ্কট ভট্টের স্বগোষ্ঠি-বর্গ গৌরের অলৌকিক চরিত যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহাদের তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণসজ্জন ও অপরাপর লোক তাঁহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া কতই আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সকলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া গেল। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে নিমন্ত্রণ সংখ্যা এতই অধিক হইয়া পড়িল যে, চারি মাসকাল এক এক দিন করিয়া খাইয়াও গৌরচন্দ্র সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বালক গোপাল ভট্ট সর্ব্বদা গৌরের সঙ্গে কালযাপন করেন ও তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালনে তৎপর থাকেন। থাকিতে থাকিতে গৌরের অপরূপ রূপমাধুরী, অলৌকিক প্রেমভক্তি এবং সুমধুর ব্যবহার তাঁহার শৈশব অন্তঃকরণে চিরমুদ্রিত হইয়া গেল; আর অপনীত হইল না। ইহার পর ইনি পিতা মাতার স্বর্গারোহণে গৃহ পরিজন ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে গোপালভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

রঙ্গনাথের মন্দিরে এক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠ করিত। ব্রাহ্মণ মূর্খ, ব্যাকরণজ্ঞানে বঞ্চিত; যাহা উচ্চারণ করিত, সকলই অশুদ্ধ ও বিকৃত। তাহা শুনিয়া কতলোক তাহাকে পরিহাস করিত, কেহ

গালি দিত ও নিন্দা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ সে সব গ্রাহ্য না করিয়া আবিষ্টচিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা যতক্ষণ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ ছাড়িত না। আরও আশ্চর্য্য এই যে, সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ যাহা পড়িত, তাহার এক বর্ণও সে যে বুঝিতে পারিত, তাহার পাঠ শুনিয়া ইহা কেহই মনে করিতে পারিত না। অথচ অধ্যয়নকালে তাহার নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভিজিয়া যাইত, পুলকে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইত, কম্প, হুঙ্কার, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল দেখা যাইত। শ্রীচৈতন্য দেবালয়ে যাইয়া প্রতিদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন তাহার পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌর তাহাকে নিভৃত স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গীতা পাঠে এত সুখ হয়, ইহার কারণ? আপনি ইহার কি অর্থ আস্বাদন করিয়া থাকেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল 'আমি মূর্খ, শব্দার্থজ্ঞান আমার কিছুই নাই; অশুদ্ধ শুদ্ধ কিছুই জানি না। কিন্তু যতক্ষণ পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখি যেন অর্জ্জুনের রথে শ্যামল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়া মৃদু মধুর বাক্যে অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার আনন্দাবেগ হয়। এই জন্য লোকের উপহাস সহিয়াও আমি গীতা পাঠ ছাড়িতে পারি না।"

শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের এই সরল ও অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "গীতা পাঠ আপনারই সার্থক, ইহাতে আপনিই শ্রেষ্ঠ অধিকারী" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ব্রাহ্মণের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তাহার মন নির্ম্মল হইল এবং সে গৌরের মহিমা বুঝিতে পারিয়া চারি মাস কাল ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

বেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে গৌরের সখ্যভাব দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। বেঙ্কট এক জন সোজা লোক; লক্ষ্মীনারায়ণে অগাধ বিশ্বাসী। গৌরচন্দ্র তাহার সঙ্গে সময়ে সময়ে কত পরিহাসই করিলেন। এক দিন তিনি হাসিতে হাসিতে ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি হইয়াও গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণকে কেন ভজিতে চাহিয়াছিলেন? আর ইহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মই বা কিরূপে রক্ষা হইল?" ভট্ট গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "কৃষ্ণ ও নারায়ণ, একই তত্ত্ব। কেবল কৃষ্ণেতে লীলাধিক্য এই মাত্র। তাহাতে লক্ষ্মী নারায়ণের ভার্য্যা হইয়াও কৃষ্ণ ভজন করিতে চাহার তাহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের হানি হইতে পারে না। আমার মোটা বুদ্ধিতে তো এই বুঝি, ইহাতে পরিহাস করিতেছ কেন?"

শ্রীচৈতন্য ততোধিক পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন "আচ্ছা তা যেন হ'লো; কিন্তু শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, লক্ষ্মী কৃষ্ণ সঙ্গে রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। অথচ শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া ব্রজদেবীর দেহ লাভ করিয়া রাসে অধিকারিণী হইয়াছিলেন; ইহার কারণ কি?"

ভট্ট এবারে কিছু মুস্কিলে পড়িয়া দিশা না পাইয়া উত্তর করিলেন "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; ভগবানের অগাধ লীলার কি বুঝি? তুমি যদি বুঝাইয়া দাও, তবে কৃতার্থ হই।"

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মাধুর্য্য পূর্ণ ও সর্ব্ব চিত্তা-

কর্ষক। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে। অথচ মাধুর্য্য গুণে ব্রজবাসী জন কখন পুত্র জ্ঞানে তাঁহাকে উদুখলে বাঁধে, কখন সখা জ্ঞানে খেলায় হারাইয়া তাঁহার কাঁধে চড়ে, আবার কখন সামান্য নাচক জ্ঞানে তাঁহাতে আসক্ত হয়; অথচ কেহই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। ব্রজজন ভিন্ন এ লীলায় অন্যের অধিকার নাই। সেই জন্য শ্রুতিগণকেও ব্রজদেবীর শরীর লইয়া এই লীলা সুখের অধিকাব লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তোমাব লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা না করিয়া দেবীদেহে রাসবিলাস অভিলাষ করিয়াছিলেন; তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ আমার গোয়ালা, গোপীগণ, তাঁহার প্রিয়সী। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না। এখন বুঝ্‌লে তো, তোমাব লক্ষ্মী কেন রাস পান নাই।”

বেঙ্কট ভট্টের মনে এত দিনে এই অভিমান হইল যে, নারায়ণই স্বয়ং ভগবান এবং তাঁহার ভজনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে গৌরের মুখে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবাধিক্য শুনিয়া তিনি ম্লান মুখে নীরব হইয়া থাকিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া পরিহাসটীকে আরও গভীর করিবার জন্য বলিলেন "ভট্টজি! সন্দেহ করিও না। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান; নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ বিলসিত বিগ্রহ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই অসাধারণত্ব হেতু নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মীর কৃষ্ণের প্রতি এত তৃষ্ণা। অথচ নারায়ণ গোপীদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে একটুও সমর্থ নহেন। কোন সময়ে গোপীদিগকে কৌতুক করিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ ধরিয়াছিলেন; কিন্তু গোপীরা তাহা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন।

এই সব কথা শুনিয়া বেঙ্কট ভট্টের মুখ শুকাইয়া গেল এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা স্বীয় অভিষ্ট নারায়ণের অপকর্ষতা শুনিয়া তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্য তাঁহার দুঃখ নিবারণ জন্য পরিহাস রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বন্ধো! দুঃখ করিও না। আমি তোমাকে পরিহাস করিয়াছি। নারায়ণে তোমার অবিচলিত বিশ্বাস দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিক কথা এই যে, ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ বুদ্ধি করা মহা অপরাধের কথা। যেমন একই মণি আঁধারাদি ভেদে নীল, লোহিত, পীত, নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া পৃথকরূপে শোভা ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি উপাসনাভেদে একই ভগবান নানা ভক্তের চিত্তে বিশ্বাসানুরূপ নানা রূপে প্রতিভাত হইয়া দেখা দেন। ইহাতে লক্ষ্মী ও গোপী, কৃষ্ণ ও নারায়ণে ভেদ করিবার কোন কারণই নাই। পরিহাস করিয়া তোমাব প্রাণে যে ক্লেশ দিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।”

এই কথা শুনিয়া বেঙ্কট ভট্ট হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গৌরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ হইয়াও তাঁহার অসাধারণ ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "আমি অতি পামর জীব; ধন্য আমি যে লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপায় তোমার এখানে শুভাগমন হইয়াছে। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; তাই কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে।” ভট্ট এই বলিয়া গৌরের চরণে পড়িলেন ও গৌরও তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে সুখী করিলেন।

এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বেঙ্কট ভট্ট সগোষ্ঠিবর্গে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং নীলাদ্রির শৃঙ্গ বিশেষ ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া নারায়ণ দর্শন করিলেন। এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ও তাঁহার গুরু ঈশ্বর পুরীর অধ্যাত্ম ভ্রাতা পরমানন্দ পুরী তথায় চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতেছেন। গৌর অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং একত্র কৃষ্ণ কথা রঙ্গে তিন দিন পর্য্যন্ত যাপন করিলেন। পরমানন্দ পুরী বলিলেন "আমি সম্প্রতি পুরুষোত্তম দেখিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গা স্নানে যাইব।" গৌর বলিলেন "আপনার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে আমার ইচ্ছা; আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া বঙ্গদেশ হইতে যদি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে ভাল হয়; তাহা হইলে আমিও তত দিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারিব।" ইহার পর পুরী মহাশয় পুরুষোত্তমে চলিয়া গেলেন এবং গৌরচন্দ্র শ্রীশৈলে আসিয়া শিবদুর্গা দর্শন করিয়া কামকোষ্ঠি বা বর্ত্তমান কম্বুকোলম নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্ব একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহা প্রাচীন কোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। কামকোষ্ঠি হইতে গৌরচন্দ্র দক্ষিণমথুরা বা মাদুরা নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নদী ভিগে নদীর তীরে, কিন্তু বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন যে, মাদুরা নগরে গৌরচন্দ্র কৃতমালা নামক নদীতে স্নানাবগাহন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ভীগের নামই কৃতমালা হইবে। সে যাহা হউক, এই নগরে একটী রামভক্ত ব্রাহ্মণ গৌরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব ভবনে লইয়া গিয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাকাদির কোনই আয়োজন করিল না। তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, পাক হইল না কেন? ব্রাহ্মণ রামভাবে বিভোর ছিল, উত্তর করিল, কি করিব মহাশয়। আমার অরণ্যে বাস, বনের মধ্যে তো পাক সামগ্রী কিছু পাওয়া যায়না। লক্ষ্মণ বন্যশাক, ফল মূল আনিতে গিয়াছেন। তাহা আসিলে সীতা ঠাকুরাণী রন্ধন করিবেন। গৌরচন্দ্র তাহার উপাসনার ভাব দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ আস্তে ব্যস্তে পাক করিয়া অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে উপবাসী থাকিল। গৌর সুধাইলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল যে, জগদাত্মা জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছেন, একি প্রাণে সয়? আমার জীবনে কাজ নাই, জলে প্রবেশিয়া মরিব?" চৈতন্যদেব তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "আপনার বুঝিবার ভুল হয়েছে; সীতার মূর্ত্তি প্রকৃত নয়। উহা চিদানন্দময়ী। তাহা স্পর্শ করিবার শক্তি দূরে থাকুক, প্রকৃত চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ নহে। রাবণের সাধ্য কি সীতাকে হরণ করিতে? সে সীতাকে স্পর্শ করিতে গেলে সীতা অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। মায়াময়ী সীতাকৃতি রাবণ ছুইয়াছিলেন মাত্র। আমার এই ব্যাখ্যা ঠিক, আপনি বিশ্বাস করিয়া দুঃখ দূর করুন।"

ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলে গৌরচন্দ্র দুর্ব্বেসন নগরীতে রঘুনাথ, মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখিলা সেতুবন্ধে যাইয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। কৃতমালার সাগর সঙ্গমস্থানে সেতু-বন্ধ অবস্থিত। সেখানে নৌকায় উঠিয়া ধনু প্রণালী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে হয়। গৌরচন্দ্র রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া বিশ্রামান্তে বিপ্রসভায় কূর্ম্ম পুরাণ শুনিতে গেলেন। সেখানে পতিব্রতা উপাখ্যান মধ্যে রাবণ কর্তৃক মায়া সীতাহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজের ব্যাখ্যার [illegible] প্রমাণ পাইয়া তাঁহার পরিচিত রামভক্ত ব্রাহ্মণ দিগের [illegible] পুথি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। [illegible] পুনরায় দক্ষিণ মথুরায় আসিয়া সেই পুস্তক রামদাসকে দিলে সে অতি আনন্দিত হইল এবং নানা প্রকারে গৌরচন্দ্রের স্তব করিয়া সেদিন অতিথি সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল। শ্রীচৈতন্য এখন তাম্রপর্ণী নদীর তীরে তীরে পাণ্ড্য রাজ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান টীনিভেলী জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণ মথুরা উহার রাজধানী ছিল। এই স্থানে বহুতর হিন্দু কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎপরে গৌরচন্দ্র এই সব স্থানে দেখিলেন,—নয় ত্রিপদী, চিয়ড তালা, তিলতাঞ্চী, গজেন্দ্র মোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয় পর্ব্বতে অগস্ত্যাশ্রম, কন্যাকুমারী এবং আমলীতলা। তৎপরে গৌরচন্দ্র মালাবর উপকূলে মল্লার বা মালাবর দেশে আগমন করিলেন। এই দেশ এখন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা, প্রধান নগর কালীকট। এখানে আসিলে গৌরের একটী বিপদ উপস্থিত হইল। তৎকালে এ দেশে ভট্টমারী বা ভর্ত্তৃহরি নামে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী লোক ছিল। উহারা ভর্ত্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে এবং স্ত্রী পুত্র, পশ্বাদি পশু এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। ভট্টমারীগণ তাহাকে সুন্দরী স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ধন ঐশ্বর্য্য দিবে বলিয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল মধ্যে আনিয়া রাখিয়া দিল। শ্রীচৈতন্য জানিতে পারিয়া ভট্টমারীদিগের আড্ডায় গিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী। তবে আমার ব্রাহ্মণকে তোমরা আট্কাইয়া রাখ, এ কি ভাল হয়?" এই কথা শুনিয়া দস্যু প্রকৃতি ভট্টমারীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে আক্রমণ করিল। কিন্তু কে জানে কি আশ্চর্য্য, তাহাদের অস্ত্র সকল হাত হইতে পড়িয়া পরস্পরের গায়ে আঘাত লাগিল। ইহাতে ভট্টমারীগণ কে কোন্ দিকে পলাইতে লাগিল; তাহাদের স্ত্রী পুত্র কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল, একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সুযোগে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাসকে দেখিতে পাইয়া তাহার চুলে ধরিয়া বলে টানিয়া লইয়া দৌড়িতে লাগিলেন এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়া সেই দিনেই পয়স্বিনী বা পাপনাশিনী নদীর তীরস্থ কোন ভদ্র গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে আদি কেশব মন্দিরে শ্রীচৈতন্য নৃত্য কীর্ত্তন করাতে তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া বহু লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এখানে তিনি "ব্রহ্মসংহিতা" নামক ভক্তিপূর্ণ এক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাইয়া অতি যত্নের সহিত

লেখাইয়া লইলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই গ্রন্থ ও কৃষ্ণ কর্ণামৃত তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার পক্ষে অমোঘাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। ইহাতে গোবিন্দ মহিমা ও কৃষ্ণতত্ত্ব অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ" ইত্যাদি শ্লোক ব্রহ্মসংহিতার। দুঃখের বিষয় এই যে, এমন মূল্যবান গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায় ভিন্ন অবশিষ্টাংশ এখন পাওয়া যায় না। তৎপরে গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যের দীক্ষা স্থান অনন্ত পদ্মনাভে আসিয়া অনন্তেশ্বর শিব দেখিলেন এবং তথা হইতে শ্রীজনার্দ্দন দেখিয়া পয়োষ্ণি বা পুত্তি নামক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দেব স্থানে আসিলেন। তৎপরে তিনি শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গপুরে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিংহারী মঠে আসিলেন। এই স্থানে কোচিন দেশে তাঙ্গভদ্রা নদী তীরে অবস্থিত এবং এখানে শঙ্করাচার্য্য সরস্বতীর পাদ পীঠের নিকট ভারতী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ তুলব দেশে চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থান উদিপী নগরে আসিয়া-উড়ুপ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। এই স্থান সমুদ্র হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে স্থিত। উড়ুপ কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, কোন বণিকের অর্ণবপোত দ্বারিকা হইতে আসিতে তুলব দেশের উপকূলে সমুদ্র মধ্যে জলমগ্ন হয়। এই পোত মধ্যে গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে বাল গোপাল মূর্ত্তি লুকায়িত ছিল। মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি উহা আনিয়া উদিপী নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্বাচার্য্যের অনুবর্ত্তীগণকে তত্ত্ববাদী বলা যায়। তত্ত্ববাদীগণ গৌরকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে প্রথমে বড় একটা গ্রাহ্য করে নাই; পরে তাঁহার প্রেমভক্তি প্রভাব দেখিয়া সম্মান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বাচার্য্য কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।" গৌর তাঁহাদিগকে শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে কর্ম্ম ও মুক্তি দুইই পরিত্যাজ্য। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিযোগে প্রেম ও সেবা লাভই পরম সাধন। তখন তত্ত্ববাদীগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র নিম্নলিখিত তীর্থ স্থান দর্শন করিলেন;—ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়নি, সুর্পারক, কোলাপুরের দেবালয়াদি এবং পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর।" পাণ্ডারপুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভীম নদের তীরে অবস্থিত। ইহা বিঠল বা বিঠুল ভক্তদিগের প্রধান স্থান। এখানে বিঠল বা বিঠুল দেবের মন্দির আছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ মন্দিরে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। বিঠল-ভক্তগণ বিঠল দেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাদিগকে এক প্রকার বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। পুণ্ডলিক নামক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরী ঐ গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য এই শুভ বার্ত্তা পাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে যাইয়া পুরীকে দর্শন করিলেন এবং প্রেমাবেশে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী গৌরের প্রেম পুলক অশ্রু কম্প দেখিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ; তোমাকে দেখিয়া মনে

হইতেছে যে, আমার ইষ্টদেবের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে; নইলে এরূপ প্রেম লক্ষণ তো অন্যত্র সম্ভবে না।" শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাব ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিলে উভয়ে প্রেমানন্দে গলাগলি নৃত্য কীর্ত্তন ও ভাবাবেশে ক্রন্দন করিলেন। এক দিন শ্রীরঙ্গ পুরী তাঁহার জন্মস্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নবদ্বীপের নাম করিলেন। পুরী ইহাতে উত্তর করিলেন "আমি আমার গোসাঁইর সঙ্গে একবার নদীয়ায় গিয়াছিলাম এবং জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। জগন্নাথ পত্নী শচীদেবী রন্ধন কার্য্যে অদ্বিতীয়া; তিনি আমাদিগকে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন, তাহার আস্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। আর তাঁহাদের এক যোগ্য পুত্র অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করারণ্য নাম লইয়া দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে এই তীর্থে আসিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।" শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ আমার পিতা।" কৃষ্ণকথা আলাপনে ও এইরূপ প্রসঙ্গে পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেলে শ্রীরঙ্গ পুরী দ্বারকা তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অনুরোধে আরও চারি দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া পর্য্যটনার্থে বহির্গত হইলেন এবং বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্যে কৃষ্ণা নদীর তীরে তীরে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক গ্রামে আসিয়া ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মধুর গ্রন্থ অধীত হইতেছে, শুনিতে পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া গেলেন। এবং অনুসন্ধানে গ্রন্থকর্ত্তা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনের কথা শুনিতে পাইয়া আবিষ্ট হইলেন এবং অতি যত্নের সহিত তিনি ঐ গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সিদ্ধান্ত বিষয়ক ব্রহ্ম সংহিতা এবং লীলা বিষয়ক কৃষ্ণকর্ণামৃত, এই দুই গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্য দেব মহা আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তদিগকে উপহার দিবেন বলিয়া অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। তৎ পরে তিনি কৃষ্ণার তীর হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে নানা রাজ্য ভ্রমণ করিতে করিতে তাপী বা তাপ্তী নদীর তীরে মাহেশ্বতীপুর নামক গ্রামে আসিয়া নদীতে অবগাহন করিলেন। কৃষ্ণা হইতে তাপ্তী বহুদূরে অবস্থিত। মাহেশ্বতীপুরে আসিতে শ্রীচৈতন্য যে যে স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ নাই। বোধ হয় তিনি বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্য ভ্রমণ করতঃ বেরার ও নাগপুরের মধ্যদিয়া তাপ্তী তীরে আসিয়া থাকিবেন। ইহার পর নানা দেশ পরিদর্শন করিতে করিতে গৌরচন্দ্র নর্ম্মদা নদীধারে আগমন করিলেন এবং ধনুতীর্থ দর্শন করিয়া নির্ব্বিন্ধ্যা বা বর্ত্তমান কালী সিন্ধু নদীতে স্নানাবগাহন করিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি পৌরানিক ঋষ্যমুখ পর্ব্বত দেখিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানকার বনমধ্যে অতিবৃদ্ধ, অতিস্থূল ও অতিউচ্চ সপ্ত তাল বৃক্ষ ছিল; কথিত আছে শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে আলিঙ্গন করায় তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। এখান হইতে শ্রীচৈতন্য রামায়নোল্লিখিত পম্পাসরোবরে স্নান করিয়া পঞ্চবটীবনে গমন করিলেন এবং তথা হইতে বর্ত্তমান আহম্মাদাবাদ

নগরের উত্তর পশ্চিম নাসিক ত্র্যম্বক বা নাসিক নগরে গমন করিয়া ব্রহ্মগিরি হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান কুশাবর্ত্তে গমন করিলেন। এখানে গোদাবরীর সপ্ত শাখা মিলিত হইয়া গোদাবরী নামে প্রবাহিত হইতেছে। সপ্ত গোদাবরী দর্শন করিয়া গোদাবরীর ধারে ধারে নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে চৈতন্য প্রভু পুনরায় বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া রাজা রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্মিলনে উভয়েই মহা আনন্দিত হইলেন এবং গৌরচন্দ্র রামানন্দকে স্বীয় তীর্থ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত উপঢৌকন দিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, তুমি যে সব সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে আমাকে শুনাইয়াছ, এই দুই গ্রন্থ তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে। রামানন্দ রায় গৌরের সঙ্গে গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া সুখী হইলেন এবং নকল করিয়া লইয়া আসল গ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া দিলেন। পুনরায় দুই বন্ধুতে পাঁচ সাত দিন রাত্রিতে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। রামানন্দ বলিলেন, তোমার ইচ্ছানুসারে আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম, মহারাজ দয়া করিয়া আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, আমিও তো সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, আমার এখনও সব কাজ সারা হয় নাই। বিশেষতঃ আমার সঙ্গে হাতী ঘোঁড়া সৈন্য কোলাহল থাকিবে। তোমার তাহা ভাল লাগিবেনা। তুমি আগে যাত্রা কর, আমি দিন দশেকের মধ্যে সব সমাধান করিয়া তোমার অনুগমন করিতেছি। ইহার পর শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্ব পরিচিত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আলালনাথে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সঙ্গী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ দ্বারা নিত্যানন্দাদির নিকট আগে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া নিজে পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার দর্শন পাইয়া সুখ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা ও উৎকল রাজের ইষ্টদেব কাশী মিশ্র প্রভৃতি বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক সমুদ্র তীরে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং সকলে একত্র জগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন ও বন্ধুগণের নিকট তীর্থ যাত্রা বৃত্তান্ত বলিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে এই তীর্থ ভ্রমণ এক মহা ব্যাপার। যখন রেলওয়ে ছিল না, রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না, সে সময় একাকী পদব্রজে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পূর্ণ দুর্গম পথে এত দেশ ভ্রমণ করা কম পুরুষত্বের পরিচায়ক নহে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ।

(৩৮২ পৃষ্ঠার পর।)

বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণ বলেন, মহারাজ বল্লালসেন দেব বঙ্গজ কায়স্থদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা, কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র এবং অচলা। আমরা ঘটকদিগের এই বাক্য সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ "মধ্যল্য" শ্রেণী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার সহিত বল্লালের কোনরূপ সংশ্রব নাই। ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেন সপ্তবিংশ বংশীয় কায়স্থকে বিশেষরূপে সম্মানীত করিয়া তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কুলীন ও মহাপাত্র বা সন্মৌলিক। যাঁহারা নবগুণ সম্পন্ন তাঁহারা কুলীন, যাঁহারা সপ্তগুণ সমন্বিত, তাঁহারা সন্মৌলিক। তদ্ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক কায়স্থগণ অচলা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি দনুজমর্দ্দনের শ্রেণী বিভাগ কালে মৌদ্‌গল্য দত্তদিগকে মধ্যল্য শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বল্লালের সময় দত্তের কুল নষ্ট হয় নাই। এইজন্য অদ্যাপি বিক্রমপুর সমাজে কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্দ্ধ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। আদিশূর কিম্বা বল্লালের সময় দত্তদিগের কুল নষ্ট হইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না। পরবর্ত্তী ঘটকগণ নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় লিখিয়াছেন।

"দত্তবংশ সমুদ্ভূতো নারায়ণো মহাকৃতিঃ।
চকার স নৃপতিঃ তং নিষ্কুলং বিনয়াশ্রীনং॥

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন দেবের শাসনপত্রেও যে নারায়ণ দত্তের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে, সেই নারায়ণদত্ত আদিশূর কিম্বা বল্লাল কর্ত্তৃক নিষ্কুল হইয়াছিলেন। ইহা নিতান্তই অজ্ঞের প্রলাপ বলিতে হইবে। ভূগর্ভ হইতে তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপি সমূহ আবিষ্কৃত হইয়া কুলাচার্য্যদিগের সর্ব্বজ্ঞত্ব লোপ করিবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, বল্লালের সময়ে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত (মৌদ্‌গল্য) এই পঞ্চবংশীয় কায়স্থ কুলীন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত দশরথ বসুর দুই পুত্র পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু। পরম বঙ্গদেশে ও কৃষ্ণ বসু দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন। উত্তর কালে কৃষ্ণ বসুর বংশে আলঙ্কার নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঢ় দেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। তদনুসারে অলঙ্কারের সন্তান সন্ততীগণও বঙ্গজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কিন্তু বল্লাল কৃত মর্য্যাদা স্থাপন কালে পরম বসুর উত্তর পুরুষ লক্ষ্মণ ও পূষণ বঙ্গজ বসুদিগের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। *

* ঘটকদিগের কুলজীগ্রন্থে কান্যকুব্জাগত দশরথ বসুর পুত্র পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু। পরম বসুর পুত্র লক্ষ্মণ ও পূষণ। ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে (সেনরাজগণ ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আদিশূরের প্রায় তিন শতাব্দীর পর বল্লাল আবির্ভূত হন। এমত স্থলে আদিশূরের সমসাময়িক কৃষ-

কান্যকুব্জাগত মকরন্দ ঘোষের দুই পুত্র সুভাষিত ও পুরুষোত্তম। সুভাষিত ঘোষ বঙ্গে ও পুরুষোত্তম ঘোষ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন।‡ কুলাচার্য্যদিগের মতে সুভাসিতের দুই পুত্র, মহাকীর্ত্তি ও চতুর্ভুজ। মহারাজ বল্লাল সেন দেব ঘোষ বংশের শিরোভূষণ চতুর্ভুজকে কৌলিন্য প্রদান করেন। মহাকীর্ত্তি নিষ্কুল। এ স্থলে আদিশূরের সমসাময়িক মকরন্দের পৌত্র চতুর্ভুজকে বল্লালের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বংশাবলীও বিশুদ্ধ নহে।

কান্যকুব্জাগত বিরাটগুহের উত্তর পুরুষ দশরথ গুহ বল্লাল দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই দশরথের ও তাঁহার ভ্রাতাগণের উত্তর পুরুষগণ বহুকালান্তে রাঢ় দেশে গমন করিয়াছিলেন, এজন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন গুহ নাই। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বিরাট গুহের উত্তর পুরুষ—বল্লালের সমসাময়িক দশরথ গুহকেই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের অন্যতম অবধারণ করিয়াছেন। এবং আপনাদের অনভিজ্ঞতা গোপন করত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রচার করিবার মানসে লিখিয়াছেন যে, "গুহ" শব্দ শ্রবণে আদিশূরের সভাসদ্‌গণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই; এজন্যই "দশরথগুহ" আদিশূরের সভা পরিত্যাগ করিয়া এক বারে "বঙ্গদেশে" যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের উত্তর পুরুষ অশ্বপতি হইতে বঙ্গজ ও শ্রীধর হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্রদিগের উৎপত্তি। ইঁহারা উভয়ই বল্লালের সমসাময়িক।

কান্যকুব্জাগত মৌদ্‌গোল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্তের উত্তর পুরুষ নারায়ণ দত্ত বল্লালের সমসাময়িক, ইনি বল্লাল দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। খোদিত লিপি সমূহ পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই মহাত্মা লক্ষ্মণসেন দেবের সময়ে বাঙ্গালায় মহাসন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কুলজ মহাত্মা উমাপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, কায়স্থ-কুলভূষণ মহাত্মা নারায়ণ দত্ত রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্য দ্বিতীয় স্থানে সমারূঢ় ছিলেন। এরূপ একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী কৌলিন্য প্রাপ্ত হন নাই, ইহা আমরা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিনা। সেন রাজাদিগের শাসন কালে পুরুষোত্তমের বংশধর কোনও প্রধান ব্যক্তি দক্ষিণ রাঢ়ে ছিলেন না। উত্তর কালে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ ভরদ্বাজ গোত্রজ দত্তদিগকে পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া তাহাদিগকে সনমৌলিক শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন, এবং তদাবধি তাঁহারা "অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি" এই অপূর্ব্ব কথা দেশ মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মদ্‌গোল্য গোত্রজ পুরুষোত্তমের সহিত ভরদ্বাজ গোত্রজ বালির দত্তের কি সম্পর্ক হইতে পারে, তাহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে পারিলাম না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ

রথের পৌত্র কখনই বল্লালের সমসাময়িক হইতে পারে না। ঘটক মহাশয়গণ প্রাচীন বংশাবলী সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া কাহাকে যে কাহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন নির্ণয় নাই।

‡ বঙ্গজ ঘটকদিগের মতে মকরন্দ ঘোষের দুই পুত্র সুভাষিত ও ভবনাথ। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটকদিগের মতে মকরন্দের দুই পুত্র সুভাষিত ও পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম ভবনাথ।

যখন অবগত হইলেন যে, পুরুষোত্তম দত্তকে তাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রজ বলিয়া দত্তের আদিপুরুষ অবধারণ করিয়াছেন, ইনি প্রকৃত পক্ষে মদ্গৌল্য গোত্রজ ছিলেন। সুতরাং তখন তাঁহারা এক "কিন্তু" খাটাইয়া বলিয়েন "বঙ্গজ কুলাচার্য্য গ্রন্থে স এব মৌদ্গল্য গোত্রঃ।" কিন্তু বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণ পুরুষোত্তম দত্তকে মুক্তকণ্ঠে মৌদ্গল্য গোত্রজ লিখিয়াছেন। তাঁহারা রাঢ়ী ঘটকদিগের ন্যায় "কিন্তু" খাটাইয়া বলেন নাই যে, "দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগ্রন্থে স এব ভরদ্বাজ গোত্রঃ।" ইহার দ্বারা বঙ্গজ কায়স্থ কারিকা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকা অপেক্ষা প্রাচীন ও সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।*

রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কৃত শ্রেণীবিভাগ।

"চন্দ্রদ্বীপ শিবস্থানং যথা কুলীন মণ্ডলং।"

রাজা দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা। বিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস তবকত-ই-নাসিরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহম্মদ বখতিয়ার খিলুজী নবদ্বীপ অধিকার করিলে, রায় (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন দেব বঙ্গের রাজধানী সমতট নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত ইতিহাস-লেখক মিনহাজ সিরাজ বলেন, ৬৪০-৪২ হিঃ অব্দে রায় লক্ষ্মণসেন দেবের বংশধরগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। জইযে বারনি প্রণীত তারিখে ফিরোজসাহি নামক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৬৮০ হিঃ অব্দে গৌরের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা "সুলতান মখিসুদ্দিন তুগ্রল" সম্রাট বলবন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যৎকালে জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় সেন রাজবংশজ সুবর্ণগ্রামাধিপতি, বলবন বাদসাহকে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, এই দনুজরায়ই পশ্চাৎ পাঠানদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া সমুদ্র উপকূলে গমন করত চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা দনুজরায় "সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বল্লাল-নির্দ্ধারিত প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থদিগকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

১। কুলীন :—১ ঘোষ, ২ বসু, ৩ গুহ, ৪ মিত্র।

২। মধ্যল্য :—৫ দত্ত, ৬ নাগ, ৭ নাথ, ও ৮ দাস।* মধ্যল্য কুলীনদিগের আশ্রয় স্থান। ইহাদের সহিত আদানপ্রদান করিলে তাহাদের কুলের কোন হানি হয় না।

৩। মহাপাত্র :—(ক) ৯ সেন, ১০ সিংহ ১১ দেব, ১২ রাহা। এই চারি ঘর শ্রেষ্ঠ মহাপাত্র কুলীনের বিশ্রাম স্থান, ইহাঁদের সর্ব্বদা কুলকার্য্য হওয়া উচিত। ইহাঁদের সহিত আদানপ্রদান করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয় না।

মহাপাত্র :—(খ) ১৩ কর, ১৪ দাস, ১৫ পালিত, ১৬ চন্দ, ১৭ পাল, ১৮ ভদ্র, ১৯ ধর, ২০ নন্দী, ২১ কুণ্ড, ২২ সোম, ২৩ রক্ষিত, ২৪ কুরু, ২৫ বিষ্ণু, ২৬ আদ্য, ২৭ নন্দন। এই সকল মহাপাত্রগণ ৯,

* এস্থলে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ প্রবন্ধ-লেখককে বঙ্গজ কায়স্থ কুলজ বিবেচনা করিতে পারেন। এই জন্যই ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, প্রবন্ধ-লেখক দক্ষিণ রাঢ়ীয় চৌজা সমাজের সিংহ বংশজাত।

* কেবল মদ্গৌল্য দত্তই মধ্যল্য, অন্যান্য গোত্রজ দত্তগণ সর্ব্বদা কুলকার্য্য করিলে মহাপাত্র শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন।

১০, ১১, ১২ সংখ্যক মহাপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ নিম্ন হইলেও ইহারা উৎকৃষ্ট কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নিকৃষ্ট কায়স্থগণ "অচলা" আখ্যা প্রাপ্ত হন।

৪। অচলা:—হোড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শাল, ভঞ্জ, বিন্দু, গুই, বল, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড়, আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাকী, বন্ধু, শ্যাম, হেস, স্কন্দ, গণ্ড, বাণ, বাহুক, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, থাম, ক্ষেম, তোযক, বৈ, ঘর, বেদ, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষম, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বন্ধ, অঙ্গ, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পৃক্তি, গণ্ড, নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল দৃস, ইত্যাদি কায়স্থগণ অচলা বলিয়া খ্যাত। মতান্তরে ৬৪ ঘর কায়স্থ অচলা শ্রেণীতে গ্রথিত হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতিদিগের সামাজিক আধিপত্য সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উত্তরকালে যখন বসুবংশীয়গণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন ও সমাজপতির আসন অধিকার করেন, তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থগণ প্রধানত চারি সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন যথা—

চন্দ্রদ্বীপ শিবস্থান, যশোহর বাহুস্বরূপ,
উরুদ্বে বিক্রমপুরঃ পাদৌ ফথযাবাদকঃ॥
গুহ্যানি বাজবশ্চৈব অন্যস্থানঞ্চ পুরীবং।

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের শিবস্থান চন্দ্রদ্বীপ। যশোহর ইহার বাহু স্বরূপ। মহারাজ প্রতাপাদিত্য দ্বারা যশোহর সমাজ গঠিত হইয়াছিল। বিক্রমপুর এই সমাজের উরু; সুবিখ্যাত ভৌমিক চাঁদরায় ও কেদার রায় এই সমাজের সমাজপতি ছিলেন। ফতেয়াবাদ অর্থাৎ ভূষণা এই সমাজের পদস্বরূপ, বীরবর মুকুন্দরাম রায় ইহার সমাজপতি ছিলেন। বাজু (ঢাকা, ময়মনসিংহ) এই সমাজের গুহ্যদেশ ও অন্যান্য স্থান পুরীষ তুল্য। বঙ্গজ কায়স্থদিগের কুলবিধি কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

কুলকর্ম্ম কুলীনস্য কন্যানাঞ্চ সমন্বিতং।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপযো চ প্রশস্তকাঃ॥
নাতি দূরে সমীপেচ ঋণগ্রস্তে চ দুর্জ্জনে।
ব্যাধিযুক্তে চ মূর্খে চ যঠস্বকন্যা নদিয়তে॥
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুলত্যাগ স্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেচ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধং॥
স্বপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরম্পরং॥
কুলীনায় সুতং দদ্যাৎ কুলীনস্য সুতাং লভেৎ।
পর্য্যায় ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদায়কঃ॥
বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলং বংশপিণ্ডয়োঃ।
পোষ্য পুত্রে কুলং নাস্তি চেস্যেচ কুলক্ষয়ং॥
সম্বন্ধ মচলৈঃ সার্দ্ধং কুর্য্যাশ্চ যদি কুলীনাঃ।
কুলং নষ্টং তথা তেষাং দূষিতঞ্চ কুলং ভবেৎ॥
অচৈতন্য মোহভাবং প্রাপ্নুয়ন্তে কুলাঙ্গনাঃ।
তেষাং কুলস্য প্রমাদ মেব সঙ্কোমি বর্ণিতং॥
ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তে কুল দূষণৈঃ॥
কুর্য্যাচ্চেৎ কুল কর্ম্মানি তত্রকুলে ক্রমাগতঃ।
কুলজ্ঞশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ॥
ভ্রষ্টস্থান নিবাসীচ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
নৃপতিনাং পদং প্রাপ্য স্বস্থানেচ নিবাসিন॥
কুর্য্যাচ্চেত কুল কর্ম্মানি কায়স্থ স্বান্নভোজিনঃ।
কুলজাশ্চ ইতিখ্যাতাঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥
যদি পোষ্য পুত্রে কন্যা কুলীনঃ প্রদদেৎ কচিৎ।
ভ্রষ্ট কুষ্ঠ কুলং ভবেৎসহি মহাপাত্র সমোভবেৎ॥

প্রমাদং তস্য কুলস্য নৈব শক্নোমি বর্ণিতং।
নহি প্রজায়তে সিদ্ধিঃ সহস্র কুলকর্ম্মভিঃ॥
কুলীনায় সুতাং দদ্যাৎ যো গৃহ্ণাং কুলীনাৎ সুতাং।
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকর্ম্মাণি তত্র কুলে যথাক্রমং॥
দানাদিগ্রহণদোষাৎ বর্জ্জয়েৎ বিধি পূর্ব্বকং।
গঙ্গাশ্রিত কুলং তস্য কথ্যতে কুলভূষণেঃ॥
কুলীনস্য সুতাভাবাৎ পুত্র পর্য্যায় নির্বৃতেঃ।
প্রশস্তান্যপকর্ম্মানি ক্ষমান্যানি তথৈবচ॥
কুলীনস্যাশ্রয় স্থানং বিবতে স্থানমেবচ।
কুলজশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রশ্চ সংবেৎ
তৈঃ সার্দ্ধং যদি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীন কচিৎ।
তদা ন কুলহীনঃ সকুনকর্ম্মাচরেদযদি॥
কুলকর্ম্ম যদি ভবেৎতস্য ত্রিপুরুষাবধি।
তদাকুলস্য রক্ষস্যাদন্যথা চ কুলক্ষয়ং।
আম্নোচিত গৃহ করি চতুর্ভাগানি প্রপ্লুয়াৎ।
ক্রমশশ্চাপি কুলীনো বিবিধিঃ কুলকর্ম্মভিঃ॥
কুলজেন সহকর্ম্মঃ কুর্য্যাচ্চেৎ কুলীন যদা।
তদাপ্নুয়াৎ চোপ ভাবং তদ্বংক্তেদ্রপকর্ম্ম চ॥
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেন চাপকং।
প্রাপ্নুয়াচ্চ কুলীনোয়ং তদ্বংবংশানুসারতঃ॥
কুলীন শ্রেষ্ঠবংশেন ইতর কুলীনো যদা।
দানাদি কুলকর্ম্মাণি কুর্য্যাচ্চ বিধি পূর্ব্বকং।
তদেতর কুলীনশ্চ সদ্ভাব প্রাপ্নুয়াৎ তথা।
তৎকর্ম্ম সৎকর্ম্ম ভবেৎ তৎ পক্ষেচ মহাযশঃ॥
কুলজোবা মধ্যল্যো বা মহাপাত্রশ্চ বা তথা।
সম্বন্ধঞ্চ যথা কুর্য্যা কুলীনেন সমংকিল॥
সদ্ভাব প্রাপ্নুয়ুস্তে চ বিবিধিঃ কুলকর্ম্মভিঃ।
ভাবযুক্তানি কর্ম্মানি সৎকর্ম্মাণি তথা কিল॥
ত্যক্ত্বাচ কুলসম্বন্ধং লোভাচ্চ যদি কুলীনাঃ।
মধ্যে ত্রিপুরুষাণস্তু ন কুর্য্যুশ্চ কুলক্রিয়া॥
পুরুষানুক্রমাদেবং রতাস্যুরপকর্ম্মণি।
ভবেয়ুস্তে কুলচ্যুতাঃ অচলানাং সমাভবেৎ॥
এতৈঃ সহাপি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীনো যদি।
প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্ম ভাবেন অপভাবং তথাত্যপং॥
মধ্যে ত্রিপুরুষানস্তু দৌহিত্রো দোষমাবহেৎ।
কুলীনস্য কুলং নষ্টং দূষিতঞ্চ কুলংভবেৎ॥

বঙ্গজ কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত। স্বপার্য্যায় * আদান প্রদান প্রশস্ত। অতিদূরে, অতিনিকটে, ঋণগ্রস্থে, দুর্জ্জনে, ব্যাধিযুক্তে, মূর্খে কন্যাদান করিবে না। আদান, প্রদান, কুশত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, এই চারি প্রকারে কুলীনের সম্বন্ধ স্থির হইবে। স্বপর্য্যায়ে দান ও গ্রহণ উত্তম। কন্যাভাবে কুশত্যাগ অথবা পরস্পরের প্রতিজ্ঞা দ্বারা সম্বন্ধ স্থির রাখিবে। যিনি পর্য্যায়ক্রমে কুলীনে কন্যাদান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিবেন, তিনি কুলদীপক বলিয়া গণ্য হইবেন। বিপর্য্যায়, বণ্ডাকন্যা ও পোষ্যপুত্রের কিম্বা ডেঙ্গরের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল নষ্ট হইবে। অচলের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল নষ্ট ও দূষিত হয়। তদ্দ্বারা কুলীন অচৈতন্য ও মোহ ভাব প্রাপ্ত হইবেন। সেই দোষ বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সদ্বংশজাত ভ্রষ্টস্থানে বাস করিলে কৌলিন্য হইতে চ্যুত হইবে, কিন্তু তদ্বংশীয়গণ ক্রমাগত কুলকার্য্য করিলে কুলজ বলিয়া গণ্য হইবেন। স্বস্থানবাসী রাজপদ বিশিষ্ট ব্যক্তি ভ্রষ্টস্থানে বাস করিয়া স্বপাকী হইলে ক্রমাগত কুলকর্ম্ম দ্বারা কুলজ বলিয়া গণ্য হইবেন। পোষ্যপুত্রে কন্যাদান করিলে কুল নষ্ট হইবে এবং দাতা মাহাপাত্রভাবাপন্ন হইবেন এবং সহস্র কুলকর্ম্মের দ্বারাও সেই দোষ খণ্ডন হইবে

* দক্ষিণ রাঢী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ পর্য্যায় লইয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, অথচ পর্য্যায়ের বিচমলায় গলদ দেখা যাইতেছে। বংশাবলীর প্রথমভাগ বিশুদ্ধ নহে সুতরাং এক্ষণ পর্য্যায় গণনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

না। যে কুলীন বংশ পরম্পরায় দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বদোষ পরিহার করত কুলীনে আদান প্রদান করিবেন, তাঁহার কুল গঙ্গাশ্রুত বলিয়া কথিত হইবে। পর্য্যায় অনুসারে পুত্র ও কন্যার অভাব হইলে উপ, ক্ষম ও অপকর্ম্ম প্রশস্ত হইবে। কুলীনের আশ্রয় ও বিরাম স্থল কুলজ, মধ্যাল্য ও মহাপাত্র। কুলীন তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া যদি তিন পুরুষে কুলক্রিয়া করেন, তাহার কুল নষ্ট হইবে না। কিন্তু তিন পুরুষের মধ্যে কুলকার্য্য না করিলে কুলক্ষয় হইবে। কুলীনগণ কুলকর্ম্মদ্বারা অংশ, উচিৎ, গ্রহ ও কবি এই চারি ভাব প্রাপ্ত হইবেন। কুলজের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীন উপভাব প্রাপ্ত হন এবং ঐ কর্ম্ম উপ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। মধ্যাল্যের সহিত ক্রিয়া করিয়া ক্ষম ভাব ও মহাপাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া কুলীন অপভাব প্রাপ্ত হইবেন। কুলজ, মধ্যাল্য ও মহাপাত্র কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিলে তাহা তাহাদের পক্ষে সং সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহারা সংভাব প্রাপ্ত হইবেন। লোভ বশত কুলীন তিন পুরুষ মধ্যে কুলক্রিয়া না করিয়া পুরুষানুক্রমে অপক্রিয়ায় রত হইলে, তিনি কুলচ্যুত এবং অচল তুল্য হইবেন। এই কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীন ক্রিয়ার ভাবানুসারে অপভাব ও মহাপভাব প্রাপ্ত হইবেন। তিন পুরুষের মধ্যে দৌহিত্র দোষ বর্ত্তিলে কুলীনের কুল নষ্ট ও দূষিত হইবে।

বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের মধ্যে মিত্রদিগের কুল নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে চারি ঘরের পরিবর্ত্তে তিন ঘর কুলীন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্দ্ধকুলীন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

আসক্তি ও অনুরাগ।

মাতাল না হইয়া যে মদ খাইতে পারে, সেই মদ খাইতে জানে। নেশায় প্রকৃতি বিপর্য্যয় ঘটায়। অনুরাগের সহিত যার আসক্তি নাই, সেই ভালবাসিতে জানে। দর্পণে প্রতিকৃতি প্রতিভাত হয়, দর্পণের স্বচ্ছতা গুণে। যদি প্রতিকৃতি দর্পণে লাগিয়া যাইত, দর্পণের স্বচ্ছতা থাকিত না। প্রতিকৃতি প্রতিফলিত আর হইত না।

আসক্তি অনুরাগকে সীমাবদ্ধ করে। স্থান কাল পাত্রের গণ্ডিতে ঘেরিয়া ফেলে। সসীম অনুরাগ কলঙ্কিত, আসক্তি অনুরাগের কলঙ্ক। আসক্তি কর্ম্মের প্রাণ, কিন্তু জ্ঞানের বিষ। গৃহস্থ কর্ম্মী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী। কর্ম্মেতে অনুরাগ, জ্ঞানেও অনুরাগ; কর্ম্মে আসক্তি-কলঙ্কিত অনুরাগ, জ্ঞানের অনুরাগে আসক্তি নাই।

আসক্তি-শূন্য অনুরাগ ব্যভিচারী নহে। ব্যভিচার আসক্তির অতিমাত্রা জনিত, অভাব জনিত নহে। দর্পণে অনেক প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয, তজ্জন্য দর্পণকে কেহ

ব্যভিচারী বলেনা। একটীকে ধরিয়া যে আর একটীর জন্য হাত বাড়ায়, সেই ব্যভিচারী। যে কাহারই জন্য হাত বাড়ায় না, যাহার গৃহে অতিথি অনেক, কুটুম্ব কেহ নাই, সে ব্যভিচারী নহে, সে গৃহস্থ নহে, সে সন্ন্যাসী।

নেশা না হইলে মদ খাইয়া সুখ কি? আসক্তিহীন অনুরাগ নপুংসক। সে অনুরাগে—অনুরাগীরও সুখ নাই, অনুরক্তিতেরও সুখ নাই। সুখ দুঃখ মৃৎসমুদ্রের পাকা ফল। এই কষ্টিপাষাণে সকলেই পরীক্ষিত। অসার কল্পনা, শূন্যে শূন্যের পরীক্ষা, প্রলাপীর উদ্গার। সুখ নাই, অনুমানেও নাই।

যখন অহঙ্কারে আপনাকে জগতের কেন্দ্র করি, তখন আমার সুখ দ্বারা জগতের পরিমাণ করি। যখন আমার সুখ জগতের মানদণ্ড হয়, তখন অসুখে সুখ ভ্রম হইলেও তাহারই দ্বারা পরিমাণ পরিসমাপ্ত হয়। আবার সেই অহঙ্কারে নীতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অনীত কর্ম্ম কর্ত্তব্যে পরিগণিত হয়। নেশার সার—অহঙ্কার। স্থল জল আকাশ পাতাল ধর্ম্ম অধর্ম্মের পার্থক্য অপনোদনে ইহার তুল্য আর নাই।

তোমার সুখকেও মানদণ্ড করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যখন বালক ছিলে, পুতুল দিয়া ভুলাইয়াছি। দর্পণে চাঁদ দেখাইয়া চাঁদের অভাব মিটাইয়াছি। যৌবনে দুটা ফুল দিয়া, একটু হাসি দিয়া, একটু খোষামুদী করিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছি।

তোমার অহঙ্কার সন্তুষ্ট করিলেই তোমার সুখ হয়। অহঙ্কার প্রমত্ত সার অসার বুঝেনা। সুখের মানদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে। অন্য তুলায় ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে।

আর এক অসার কল্পনা বিবেক। গোবরে পদ্ম ফুল ফোটে, লোকে যখন জানিত, হস্তীর মাথায় গজমুক্তার জন্ম যখন বিশ্বাস করিত, তখন বিবেকের জন্ম। প্রাক্তন-লব্ধ বহুদর্শিতা বা জন্মগত জ্ঞান রাশি বিবেক নহে। বিবেক ভগবানের আদেশ কথা, ইসারা। পূতিগন্ধময় পয়োনালীজাত কীটের হৃদয়ে নাকি সে পরশমণির জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়? কেহ দেখে নাই, শুনে নাই, তবু ও নাকি হয়? শিক্ষা সাধনার আবশ্যক নাই, হেমন্তের শিশির, বর্ষার জল ও বসন্তের বায়ুর ন্যায় সকলেই তাহা অনায়াসে লাভ করে। অথচ কেহই স্বীকার করেনা সে পাইয়াছে, দেখিয়াছে, শুনিয়াছে। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ধর্ম্মে অধর্ম্মে আমিও কখন দেখি নাই, আর কেহ দেখিয়াছে, তাহার মুখেও শুনি নাই। কেহ কেহ বলেন, স্বাতি নক্ষত্রের জলের ন্যায় সেই কহিনুরের আলোক লগ্ন সাপেক্ষ, অসম সমবায়ে ঘটেনা। যাহা দেখি নাই, তাহা আছেও বলিতে পারি না, নাইও বলিতে পারিনা। কে বলিবে, ভূতপ্রেত আছে কি না? কিন্তু একটু বলিতে পারি, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার প্রয়োজন, সে এমন অস্পৃশ্যম্পশ্যা হইলে চলেনা ও আমার তাহাতে কাজ চলে না। নিত্য কার্য্যের জন্য, নিত্য ব্যবহারপযোগী অন্য কিছু আছে। সে কথা থাক্।

তোমার সুখ হইবে বলিয়া তোমাকে ভালবাসি নাই; যখন ভাল বাসিয়াছিলাম, জ্যামিতির স্বীকার্য্য স্বতঃসিদ্ধ স্মরণ হয় নাই। যে হেতু, অতএব ভাবিবার সময় পাই নাই। বলিও না, স্বার্থপরতা। নিজে সুখী হইব, একথা ভাবিবার অবসর পাই নাই

অন্য পদার্থের কেনা বেচার লাভ লোকসান হিসাবের সময় হয়, ভালবাসিতে যদি সে সময় পাইতাম, যদি ভালবাসিলে এত হয় জানিতাম, তবে হয়ত—কিন্তু তখন ভাবিবার সময় ছিল না, ক্ষমতা ছিল না, ইচ্ছা ছিল না। তোমার সুখও ভাবি নাই, আমার সুখও ভাবি নাই। ইচ্ছা করিয়াও ভালবাসি নাই। অনিচ্ছায়ও নহে।

প্রেম পবিত্র করে। অনুরঞ্জিতকে মনুষ্যত্বের অতীত করিয়া দেবত্বে পরিণত করে। অনুরাগী ব্রহ্মচারী। আসক্তি মনুষ্যোচিত, পশুদের অনেক উপরে। আসক্তি মনুষ্যকে উপরে উঠিতে দেয় না।

আসক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যে উপরে উঠিবে, তাহাকেই টানিয়া নীচে ফেলিবে। গার্হস্থ্য জীবন অ[illegible]তার প্রশ্রয় দেয় না। সকলই নিয়মিত ধারাবাহিক, অ[illegible] অতিমানুষী প্রবৃত্তি শান্ত সলিল রাশি উদ্বেলিত করে। চাঞ্চল্য স্থির জীবনের বিসম্বাদী। এজন্য সে গণ্ডির বাহিরে কাহাকেও যাইতে দেয়না। মাধ্যাকর্ষণে সকলকে বাঁধিয়া রাখে। আসক্তি গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী। সে গৃহস্থকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে, দুঃখ বিপদ বিসম্বাদের ঝটিকায় গৃহস্থকে রক্ষা করে। আসক্তি না থাকিলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হারাইত।

কিন্তু সে কীট জীবনের প্রয়োজন কি? যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই লইয়া চলিলাম। সে লতা পল্লব এত দিন দেহ সুশোভিত করিয়াছিল, একে একে সকলই বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় তলায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের বুকের উপর দিয়া চলিতে হইল। আশা, ভরসা, উৎসাহ, কোথায় অদৃশ্য হইল। পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণিত হইল। বিবাদ বিচ্ছেদ বিপদে সকলই বিসর্জ্জন দিয়া বিজনার অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছি। এ জীবন ছাড়িয়া যাইতে দুঃখ কি? ভাল-বাসিয়া যদি বরণ করিতে না পারিলাম, সে ভালবাসার লাভ কি?

আসক্তি নরকের দ্বার। অনু-রাগ [illegible]। নিরাসক্ত অনুরাগী কুজ্ঝটিকার উপরে [illegible] সৃষ্টি, অবদ্ধ বায়। তিনি অন[illegible]তের পরম প্রকাশী, তাহার অনুরাগ সার্থক, সফল ও সুখপ্রদ।

তিনি উপরে থাকিয়া [illegible] বিপদের সমাগম অনুভব করেন। অসীম বলে তাহা পদদলিত করিয়া আত্মীয়কে রক্ষা করেন। আসক্তি [illegible] ক্ষণ জ্যোতিঃ আচ্ছন্ন করে [illegible] দেয়। আত্মীয়ের বুক পিঠ হাতে তুলিয়া [illegible] করিবার [illegible] সামর্থ্য, সুবিধা কিছুই থাকে না। সে সকলকে বক্ষে চড়াইয়া, কাদার উপরে গড়াইতে থাকে। এইরূপে মনুষ্য জীবন অতীত হয়।

নিরাসক্ত অনুরাগী সংসারের উপরে, স্বর্গের দ্বারে দেবতার বলবান। ইন্দ্রিয় সীমার অতীত, নিরাকাঙ্ক্ষ, সর্ব্বব্যাধি হরণ-ক্ষম মহাপুরুষ। মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিলে উপরে উঠিতে নীচেও নামিবার ক্ষমতা থাকে।

হাসি কান্না জীবনের বৈচিত্র্য মূল। হাসি কান্না আসক্তি হেতু। নিরাসক্ত, এই বৈচিত্র্যময়ী কুয়াসার বাহিরে, নিরনুরাগ— জীবন্মৃত, অনাসক্ত অনুরাগ মোহের অতীত, শক্তির মূল, মোক্ষের নিদান।

জীবন অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবী পঙ্কে পূর্ণ। পৃথিবীর পাখী যতই উড়ুক না কেন, আকাশের উপরে উঠিতে পারে না। বিশ্রা-

মের জন্য, খাইবা বাঁচিবার জন্য আবার নীচে নামিয়া আসিতে হয়। স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি কলঙ্কিত। যাহাকে ভালবাসে, তাহার মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেনা। কে কবে বলিয়াছে, আমি ইহাকে ভালবাসি, এ আমাকে ভালবাসে, কিন্তু ইহার মঙ্গল অপরকে ভালবাসিলে, তারই দিকে ইহাকে ঘুরাইয়া দি।

প্রণয়িনী আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতেছে, তুমি আমাকে ছাড়িওনা। কে তাহাকে বুঝাইয়া অন্যের হাতে দিতে পারিয়াছে? স্বার্থ স্বার্থ পৃথিবীর ভিত্তি গরলে গঠিত। ধন জন মান অকিঞ্চিৎকর, আপাত মনোরম্যে সকলই মুগ্ধ। মাতাল ঘুরিতেছে, অসীম সমুদ্রের একটী বুদ্‌বুদে মানব প্রতারিত। আশা ভরসা, সুখ সম্পদ আপাত মনোহারী যে ছাড়াইতে পারিয়াছে, সেই অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। সেই এই সকল অধিকার করিয়াছে, যে হৃদয়কে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে। যে হৃদয় বিসর্জ্জন দিয়াছে, সেই হৃদয়বান। আসক্তি—অক্ষতা কুমারী জীবত্রাতার জন্মদায়িনী। অতি অপূর্ব্ব কল্পনা, অনাবিল সত্য, অন্ধকারে উষার জন্ম, মেঘে তড়িতের অভ্যুদয়। আসক্তি অক্ষত অনুরাগ-রঞ্জিত-জ্ঞান, এইত প্রেম।

এই প্রেম তোমাকে দিতে চাহি, কিন্তু পারি কৈ? মাধ্যাকর্ষণের টানে আমার প্রেম ভূতলে পড়িয়া ধূলায় গড়াইয়া কলঙ্কিত হইয়াছে। তাহা তোমাকে কি বলিয়া দিব? আমি শিষ্য হইয়া তোমার চরণতলে বসিলাম। আমাকে শাসিত কর; তোমার উপযোগী করিয়া লও। পূজা করিতে আমার জন্ম, ভালবাসিতে নহে।

মানে লজ্জা, স্নেহে ভয়, ভাবে দুঃখ। পুত্র কন্যার জন্য লোকে অমরত্ব পরিহার করে। মৃত্যুর দাসত্ব স্বীকার করে। পুরুষ রূপে তোমার ক্ষমতা অন্যকে হাসাইতে পিতা রূপে প্রার্থী তুমি অন্যের হাসি দেখিতে।

যখন ছেলেটী পাইযাছিলাম, বুকে তুলিয়া হাসিয়াছিলাম, যাঁহার ছেলে তাঁহাকে ফিরাইতে কাঁদিলাম কেন?

আসক্তি মনুষ্যকে স্বার্থ-পরায়ণ করে। ধন্য সে, যে সংসারে জড়ায় নাই। তাহার অটুট রাজত্ব। জ্ঞান ও অনুরাগ, উভয়কে ধূলী কুয়াসার উর্দ্ধে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

জন্মভূমি। *

"বঙ্গবাসীর রত্নপ্রসূ মুদ্রাযন্ত্র হইতে নিত্য নূতন রত্নরাজি প্রসূত হইতেছে। "বঙ্গবাসী" স্বয়ং সাহিত্য-সংসারে ক্ষুদ্র দেহ অবতীর্ণ হইয়া কাল সহকারে প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে 'দৈনিক' ও 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র উৎপত্তি দ্বারা সাহিত্যের সমুন্নতি সাধন করিয়াছে। তদ্ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত, বিংশতি স্মৃতিসংহিতা,

* মাসিক পত্র। প্রথম ভাগ—প্রথম সংখ্যা।

অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-পুরাণাদির সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে এবং কালাচাঁদ, মডেল ভগিনী প্রভৃতি উপন্যাসাদির প্রচার দ্বারা সুকুমার সাহিত্য-সেবী পাঠকগণেরও পাঠলিপ্সা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করিয়াছে। প্রত্যুত 'বঙ্গবাসী'র অধ্যক্ষগণ নানাবিধ উপায়ে বঙ্গ সাহিত্যের পরিচর্য্যা করায় নিমিত্ত তাঁহারা বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

'বঙ্গবাসী'র সকলই ছিল—অভাবের মধ্যে, কেবল মাসিক পত্রিকা। আজি "জন্মভূমি"র অবতারণা দ্বারা তাহার সে অভাবও তিরোহিত হইল। আমরা অনেক সময় মনে মনে ভাবিয়াছি, "বঙ্গবাসী'র সাময়িক পত্র বিভাগে সাপ্তাহিক, দৈনিক, অধিক কি—ত্রৈমাসিক ভাবও দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু উহার মাসিক মূর্ত্তি প্রকটিত হয় না কেন? আমরা এখন বুঝিলাম, উহার অধ্যক্ষগণের অন্তরে "মাসিক পত্র প্রকাশের কল্পনা"ও জাগরূক ছিল, কেবল যথোপযোগী উদ্যোগ অভাবে "সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত" হয় নাই। এত দিনে তাহাদিগের "উদ্যোগ শেষ হইল"—বঙ্গভূমে "জন্মভূমি"ও জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। কি কারণে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, নবজীবন, প্রচার, প্রভৃতি পত্রের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে,—কি কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র সকলের উত্থানের সঙ্গেই পতন হইয়াছে—হুঙ্কারের সঙ্গেই হাহাকার উঠিয়াছে—কি উপায়ে, কিরূপ উদ্যোগে, কি কি গুণ থাকিলে, মাসিক পত্র যথানিয়মে চালান যায়—এই সকল মহাতথ্য সবিশেষ জানিয়া তদুপযোগী মহান্ উদ্যোগ করা সত্ত্বেও "জন্মভূমির" অকাল-বিলয় ঘটিবে কি না—সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাই বলিতে পারেন। তবে এরূপ অবস্থায়, বিলয় ঘটিলেও, "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ" বলিয়া উহার অধ্যক্ষগণ মনকে প্রবোধ দিতে পারিবেন। যাহাই হউক, আমাদিগের জন্মভূমির এই অসাড় নির্জ্জীব অবস্থায়—বঙ্গসন্তানের বিকৃতমস্তিষ্কতা প্রযুক্ত, বঙ্গভাষার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধার অবস্থায় "বঙ্গবাসী"র উদ্যোগে বঙ্গভূমে এই 'জন্মভূমি'র জন্ম বড়ই আনন্দকর। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, উহা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জন্মভূমির উন্নতি-সাধনে ও মাতৃভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় ব্যাপৃত থাকুক।

আমরা 'জন্মভূমি'র দীর্ঘজীবন প্রয়াসী বলিয়া উহার 'সূচনা' হইতেই দুই এক কথার সমালোচনা করিব।

"বঙ্গবাসী" পত্রিকা বঙ্গবাসী মাত্রেরই গৌরবের পদার্থ, বাস্তবিক উহা লোক-শিক্ষা বিস্তারে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছে, অল্পমূল্যে সমাচার বহন পক্ষে 'সুলভ' প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও, 'বঙ্গবাসী'ই তৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; উহার সহযোগী ও পদানুসরণকারী নানা পত্রের 'পতন' ও 'হাহাকারে'র পর 'সঞ্জীবনী' ও 'সময়' টিকিয়া গেলেও এবং লোকশিক্ষা সাধন পক্ষে ইহারাও যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিলেও, 'বঙ্গবাসী'কেই এ কার্য্যের পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে। কিন্তু কালক্রমে 'বঙ্গবাসী'র প্রতি লোকের ক্রমশঃ শ্রদ্ধা কমিতেছে;—'বঙ্গবাসী'র আত্মম্ভরিতাই ইহার একমাত্র কারণ। আমরা প্রথমাবধিই 'বঙ্গবাসীর'র পক্ষপাতী, উহার যুক্তি-তর্কের সঙ্গেও আমাদিগের অধিকাংশ স্থলে ঐক্য

আছে, কিন্তু উহার ইদানীং ভাব আমাদিগেরও কিঞ্চিৎ অরুচিকর বোধ হয়। সংসারে সকলের ঐকমত্য একেবারে অসম্ভব—উহা কখন হয় নাই, কখন হইবে এমনও বোধ হয় না। অতএব 'বঙ্গবাসী'র সকল মতের সঙ্গেই যে সকলের মত মিলিবে, ইহা মনে স্থান দেওয়াই ভ্রান্তি; আর 'বঙ্গবাসী'র সকল মতই যে অভ্রান্ত এবং তদ্বহির্ভূত সমস্ত মতই ভ্রান্ত,—ইহা মনে করা অসাধারণ আত্মম্ভরিতার পরিচয়;—ব্যাস-বুদ্ধ-পতঞ্জলি, মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীগণও যে কখন এরূপ মনে স্থান দিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। কোন কোন বিষয়ে "বঙ্গবাসী"র সমীচীন মত ও উহার বর্ণনা (tone) গুণে লোকের কর্ণশূল হইয়া উঠে। লোকশিক্ষা যাহার ব্রত, কটুভাষী হওয়া তাহার পক্ষে কখনও কর্ত্তব্য নহে। মিষ্ট উপদেশে যে উপকার সংসাধিত হয়, শ্লেষময় ব্যঙ্গোক্তি বা ঘৃণাব্যঞ্জক টীট্‌কারিতে তাহার শতাংশের একাংশ ফলও জন্মে না, বরং তাহাতে শ্রোতার গাত্রদাহ বর্দ্ধিত করে,—শত্রুতার পথ প্রসারিত করে। যুক্তিমার্গানুসারে অনতিরঞ্জিত ভাষায় যে সত্য প্রকাশিত হয়, অতিরঞ্জনের দোষে, সে সত্য প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, মৌলিক যুক্তি-জালও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই দোষে 'বঙ্গবাসী'র উপদেশ কাহারও কর্ণে বড় বাজিতেছে না,—'বঙ্গবাসী'-স্তম্ভেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই কংগ্রেসের কথা;—যে সকল কারণে কংগ্রেসের সহিত 'বঙ্গবাসী'র সহানুভূতি নাই, অনেকেই সে সকল কারণ উপলব্ধি করিয়া থাকে এবং তৎসম্বন্ধে 'বঙ্গবাসী'র সহিত অনেকের মতেরও মিল আছে। কিন্তু দুইটা প্রকৃত কথার সঙ্গে 'বঙ্গবাসী' দুইশ'টা শ্লেষময় বাগ্‌জাল বিস্তার করেন, সুতরাং কংগ্রেস-পক্ষীয়দিগের মত পরিবর্ত্তন করা দূরে থাকুক, তাহাতে 'বঙ্গবাসী'-পক্ষীয়দিগেরও বিরক্তি জন্মে। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা;—নিতান্ত স্বেচ্ছাচারের কাল পড়িলেও, আজি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি অনেক হিন্দুর যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে,—কিন্তু সে কেবল যথার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিই আছে, সূত্রগুচ্ছধারী ব্রাহ্মণপদবীধারী ব্যক্তিমাত্রের প্রতি নহে। 'বঙ্গবাসী' এ শ্রেণীর হিন্দুকেও অহিন্দু বলেন, হয় ত তাঁহাকে 'বাবু' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া বিষম টীট্‌কারি প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসী'র এ কিরূপ যুক্তি, আমরা ভাবিয়া পাই না। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আর কশাই-কালী-প্রতিষ্ঠাতা, পতিতপাবন শিরোমণি যদি উভয়েই ব্রাহ্মণ বলিয়া সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন, তবে সেরূপ হিন্দুধর্ম্মে কাহার আস্থা জন্মিবে? 'বঙ্গবাসী' যে মহাভারতের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন, সেই অমূল্য গ্রন্থই বলিতেছে,—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য না করিল, সে শূদ্রাপেক্ষাও অধম, আর যে শূদ্র শমদমাদি গুণ সংযুক্ত, সেও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। * ইহার পরেও

* "যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুরিতাচারী হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে বর্ত্তমান থাকে, সে শূদ্র হয়, এবং যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমান্বিত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি; কেননা ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরিত্র।"

—বঙ্গবাসীর শাস্ত্রবিভাগ প্রকাশিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ; ৪৭৮ পৃঃ।

অপিচ অন্যত্র। "সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্য, অহিংসা ও দয়া * * যে শূদ্রে * * থাকে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা না থাকে, সে শূদ্র শূদ্র নয়-

ব্রাহ্মণ-পদবী-ধারী মাত্রকেই ব্রাহ্মণোচিত ভক্তি প্রকাশ করিতে বসিলে কি সেই আর্য্যগ্রন্থেরই অবমাননা করা হয় না? বেদ পুরাণ, স্মৃতিশ্রুতি প্রভৃতি দুরূহ বিষয় সকল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের আলোচ্য নহে; বেশ কথা, কিন্তু ঐ পতিতপাবন শিরোমণির আলোচনায় অধিকার আছে, আর সংস্কৃত সাহিত্যবিৎ সংযতচিত্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তাহাতে অধিকার নাই—ইহাই কি শাস্ত্রের বিধান?—এইরূপ নানা কারণে 'বঙ্গবাসী'র কথা অযৌক্তিক ও অরুচিকর বোধ হয়, এবং সেইজনাই উহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ কমিতেছে।

আমরা 'জন্মভূমি'র আলোচনা করিতে বসিয়া 'বঙ্গবাসী'র অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। তাহার এক কারণ আছে,—'জন্মভূমি' "বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত" এবং 'সূচনা' হইতেই যেরূপ দেখা যাইতেছে, 'বঙ্গবাসী'র সহিত এক সুরে সংমিলিত। "কাণ টানিলেই মাথা আসে"; —'বঙ্গবাসী'র দোষ-গুণের কথা বলিলেই, 'জন্মভূমি'রও দোষ গুণ বুঝা যাইবে, এই বিবেচনায় আমরা 'বঙ্গবাসী' সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। পূর্ব্বকথিত আত্মম্ভরিতার পরিচয় 'জন্মভূমি'র 'সূচনা'তেই দেদীপ্যমান,—জানি না, সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে উহা কতদূর বৰ্দ্ধিত হইবে। আপন মুখে আপন ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া পুরুষার্থ নহে; কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাইলে সহজেই তাহা সাধারণের হৃদয়'কর্ষণ করে এবং সেই গুণ বা ক্ষমতার জন্য লোকেই সাধুবাদ করিয়া থাকে। জগতের অক্ষয় কবি কালিদাসও কবিত্ব-স্রোতে গা ঢালিয়া, "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং" বলিয়া, আপনার হীন বলের জন্য বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর 'জন্মভূমি'র জন্মদাতাগণ আসরে অবতীর্ণ হইয়াই, বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রচার যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই করিবেন বলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা নিতান্তই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

তার পর ঘৃণা ও শ্লেষ।—'নব্যভারত, ও 'ভারতী'র প্রতি বিচক্ষণ একটু ভ্রুকুটী বিক্ষেপ হইয়াছে। উক্ত পত্রিকাদ্বয়, যথাক্রমে, 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্ম পরিবারের' পত্র বলিয়া তাহাদিগের নিয়মিত প্রকাশরূপ সদগুণও 'জন্মভূমি'র বিবেচনায় "ধর্ত্তব্যই নহে।" কলিযুগের শেষে হিন্দুধর্ম্মের এতই রূপান্তর হইয়াছে, এতদিন আমাদিগের সে জ্ঞান ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, অধিক কি - কলির প্রারম্ভেও, হিন্দুরা পরম শত্রুরও গুণ ব্যাখ্যা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, আর আজ 'জন্মভূমি' সেই "হিন্দুর * * শিক্ষা সম্পূর্ণ" করিতে অবতীর্ণ হইয়া, ধর্ম্ম বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ পার্থক্য হেতু, এক জনের প্রকৃত গুণ প্রকাশেও সঙ্কুচিত। তদ্ভিন্ন উক্ত বাক্যে সত্যেরও কিঞ্চিৎ অপলাপ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, উক্ত পত্রিকাদ্বয় 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্মপরিবারের' পত্র নহে; উহাদিগের স্বত্বাধিকারীগণ এবং কোন কোন লেখক, ন্যূনাধিক্য ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, উহারা

এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। * * * অপৌরুষেয় সত্য বেদবাক্য চতুর্বর্ণেরই হিতকর। * * * পুরুষ যে পর্য্যন্ত বেদে সংযুক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শূদ্র সম থাকে। * * * যে পুরুষেতে সুসংস্কৃত চরিত্র দৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি।" ঐ ঐ ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

নিরবচ্ছিন্ন 'ব্রাহ্মদলের' বা 'ব্রাহ্ম পরিবারের' মুখপাত্র নহে। লেখকদিগের মধ্যে আমরা অনেককে জানি—তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী নহেন, এবং অনেক প্রবন্ধে ব্রাহ্ম মত-বিরোধী তীব্র সমালোচনাও প্রকাশিত হইতে দেখিযাছি; প্রত্যুত, ঐ উভয় পত্রে নিরপেক্ষ ভাবে সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লেখকগণের প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং "প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।" আর প্রকৃত পক্ষে উহারা 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্ম পরিবারের' পত্র হইলেই বা ক্ষতি কি?—ধর্ম্ম বিশ্বাস মনুষ্য মাত্রের সমান নহে;—হইলে, নাস্তিক, আস্তিক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, এবং এইরূপে এক এক ধর্ম্মের মধ্যে শত শত সম্প্রদায়ভেদ থাকিত না। সকলে এক উপায়ে ভগবানকে পাইবে না জানিয়াই করুণাময় সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ং অভয় দান করিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

উক্ত পত্রিকাদ্বয় 'তত্ত্ববোধিনী' বা 'বেদব্যাসে'র ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত নহে; উহাতে হিন্দুর মত-বিরোধী কোন প্রবন্ধ থাকে, আমি হিন্দু—তাহা পড়িব না বা তাহার উপদেশে চলিব না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, তাহাতে প্রকাশিত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য বা অপর সাধারণ হিতকর প্রবন্ধ মাত্রেই পাঠ্য বা ধর্ত্তব্য নহে—ইহা কিরূপ যুক্তি? যদি ব্রাহ্মদলের পত্র বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্য না হয়, তবে হিন্দুদলের পত্র বলিয়া 'জন্মভূমি'ও অনেকের ধর্ত্তব্য না হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে, "জন্মভূমির লোক শিক্ষাব্রত সম্পূর্ণ হইবে কিসে?—তাহার পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকই বা জুটিবে কিরূপে?—আর যদি চিন্তাশীল ¶ পাঠকগণ কর্ত্তৃক উহা পঠিত না হইয়া কেবল মুদীর দোকানেই শোভা পায়, তবে 'জন্মভূমি'র প্রকৃত মর্য্যাদাই বা রক্ষিত হইবে কিরূপে?—আর যদি হিন্দু ভিন্ন অপরের রচিত প্রবন্ধ মাত্রই অপাঠ্য হয়, তবে 'জন্মভূমি, হিন্দু-মাহাত্ম্য গাহিতে না গাহিতেই হিন্দুমত-বিরোধী, বিলাত-প্রত্যাগত, "ভারতেশ্বরীর সহিত পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত Mr. T. N. Mukherjia প্রবন্ধ সাদরে আপন অঙ্গে স্থান দিলেন কি বলিয়া?

আর এক কথা। ধীর ও প্রশান্ত ভাবে সৎশিক্ষা দেওয়াই সাধু লোকের কার্য্য। সৌম্য মূর্ত্তিই হিন্দুর প্রধান লক্ষণ। সর্ব্ব-জীবে নিষ্কাম ভাবে দয়া প্রকাশই হিন্দুর একমাত্র অনুষ্ঠেয়। এ সকল উপদেশ আমরা সময়ে সময়ে বঙ্গবাসী হইতেই শিক্ষা করিয়াছি। এখন মুখে এক উপ-দেশ, কার্য্যে তাহার বিসদৃশ ভাব করা সদ্বিবেচকের কার্য্য নহে। ব্রাহ্ম মতিভ্রান্ত হইয়া গন্তব্যচ্যুত হইয়া থাকে, যুক্তিপূর্ণ সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত সহৃদয়ের কার্য্য। যদি তাহাকে আদৌ না ধরিলে, তাহার প্রতি আদৌ চাহিয়া না দেখিলে, তবে সেত অসৎ হইতে অসত্তর পথে ধাবমান হইবে। ব্রাহ্ম নিজ পত্রিকায়, বা নিজ প্রবন্ধে,

¶ কংগ্রেস সভায় শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় কর্ত্তৃক যে অর্থে "চিন্তাশীল" কথা ব্যবহৃত হইয়াছিল, আমরা সে অর্থে উহা ব্যবহার করি নাই; 'জন্মভূমি'র 'বেদান্ত-দর্শন'-ব্যাখ্যাকার তদীয় প্রবন্ধের উপসংহারে উহা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন," আমরাও সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম।

মিথ্যা যুক্তি, অসার তত্ত্ব বা অধর্ম্মকর প্রস্তাব উত্থাপিত করে, তাহা দেখিয়া, তাহা পড়িয়া তাহার সরল প্রতিবাদ কর, প্রকৃত যুক্তি, সারতত্ত্ব, প্রকৃত ধর্ম্মোদ্দীপক ভাব তাহার সম্মুখে ধর—তবে তাহার মোহ ঘুচিবে, হিন্দুধর্ম্মের অবিনশ্বর বিজয় নিশান উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে উড্ডীয়মান হইবে। যদি সে প্রবন্ধ চক্ষেই না দেখিলে, তবে তাহার অসারতা বুঝিবে কিরূপে?—মতিভ্রান্তের সদ্গতি সম্পাদনই বা করিবে কিরূপে? যে হিন্দু সে ত হিন্দু আছেই, তাহার জন্য কষ্ট কেন? যে হিন্দু ছিল, এখন কালবিপর্য্যয়ে মতিভ্রান্ত হইয়া অহিন্দু হইয়াছে, তাহাকে পুনবায় হিন্দু করিতে পারিলেই ত হিন্দুর কার্য্য হইবে,—হিন্দুর মাহাত্ম্য রক্ষিত হইবে। আমরা তাই বলি, অসূয়া আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিয়া, শ্লেষ ব্যঙ্গ পরিহার করিয়া অভিমান মাৎসর্য্য ভুলিয়া গিয়া, ধীর ভাবে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হও, মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা বাক্যে আপন ক্রোড়ে সকলকে স্থান দাও, আর্য্যঋষিগণের কথিত সারতত্ত্ব সকল সরলহৃদয়ের অবিকৃত ভাবে সকলের নিকট উদ্ঘাটিত কর,—প্রকৃত জন্মভূমির কার্য্য হইবে,—স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া উহার প্রতি অধম সন্তানের শ্রদ্ধা জন্মিবে; নচেৎ অনেকেই দূর হইতে নমস্কার পূর্ব্বক "Dear, damn'd native land, good bye!" কবিয়া বিদায় গ্রহণ করিবে। পাশ্চাত্য দার্শনিক হইলেও Herbert Spencer এর মতেই আজকাল নীতি শিক্ষা দেওয়া ভাল, নচেৎ প্রহার ও তিরস্কারের জন্যে বালক বিগড়াইয়া যায়, সংস্কৃত হয় না।

আমরা জন্মভূমির সুচনা লইয়াই অনেক কথা বলিলাম। উহার উদ্দেশ্য মহৎ—সন্দেহ নাই; এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেই পরম সুখী হইব। উহার অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

'হিন্দুরমণী'র প্রতি আমাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি আছে; প্রত্যুত হিন্দুরমণীর সতীত্ব গুণেই আমরা আজ পর্য্যন্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইতেছি। আর্য্যশাস্ত্রে "স্ত্রী জাতির ও ভার্য্যার মর্য্যাদা" যথেষ্ট পরিমাণে বিহিত থাকিলেও, কি জন্য বর্ত্তমান অবস্থা, "বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে স্ত্রীজাতিকে অন্তরে" রাখা হয়,—একথা বিশদরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিলে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিব। "বাল্যবিবাহ" প্রসঙ্গে বঙ্গবাসীর স্তম্ভে এ কথার কতক আলোচনা হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু, যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখার কারণ ব্যাখ্যাত হয় নাই। আর্য্য শাস্ত্রেরই বিধান—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"

অথচ, বর্ত্তমান (প্রাচীন?) হিন্দুরা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী কেন, এ শিক্ষা বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর, এ সকল বিষয় আমরা "জন্মভূমি''র নিকট শিক্ষাপ্রার্থী। স্ত্রী পুরুষের আশ্রয়—আশ্রিত ভাবে আমাদিগের মতদ্বৈধ নাই, ইদানীং সাম্যবাদিদিগের ন্যায় আমরা স্ত্রীজাতিকে সকল বিষয়ে সম্যক্ স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সামঞ্জস্যের সহিত সংস্কার

সাধন 'করিতে দোষ কি? * সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথার প্রয়োজন কি? আমরা যতদূর জানি, ভারতের প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে এ সকল প্রথা পূর্ণমাত্রায় ছিল না, মুসলমান শাসন কালে তদানীন্তন পাশব প্রকৃতির লোকদিগের উৎপীড়নে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এখন সেরূপ উৎপীড়নের আশঙ্কা নাই, তথাপি ঐ প্রথা সমাজে অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্য করিতেছে কেন? একজন রসপ্রবীণ কবি বলিয়াছেন—

"ঘোমটা টানা, যায় না জানা,
ভিতরে কেমন কাজ;
* * * *
মনটি ভাল, হলেই হ'ল
কাজ কি অত লাজ?*

. . . । এই সমাজ-সংস্কার চিন্তায় আমরা পরম মুগ্ধ। এইরূপ ও অন্যান্য সামান্য বিষয়ে স্ত্রীজাতিকে, সম্ভবমত, স্বাধীনতা দিলে ক্ষতি কি—জন্মভূমির নিকট আমরা এ সকল তথ্য শিখিতে চাই।

'মহাবিদ্যাসাধন' সাধনপ্রিয় হিন্দুর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য, "ভক্তের আরাধ্য বস্তু এবং কাব্যপ্রিয় ব্যক্তির প্রিয়তম পদার্থ"—তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কবিবর রসিকচন্দ্র প্রবীণ বয়সে প্রগাঢ় ভক্তিভাব-বিমিশ্রিত রসে জন্মভূমির পাঠকমাত্রকে সেই 'মহাবিদ্যাসাধন' শিক্ষা দিয়া প্রকৃত ভক্তের কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান রুচির বাজারে এ সাধন বঙ্গীয় পাঠকের কতদূর চিত্তাকর্ষক হইবে—বলিতে পারি না। আজ কাল যখন সহজেই লোকে "ন্যাংটা গা' ন্যাংটো পা, দেখিয়া সিহরিয়া উঠে, তখন "বিপরীত রতাতুরা দিগম্বরী" মহাবিদ্যাগণের কেবল দিগম্বর ভাব দেখাইলে, লোকের অরুচি ভিন্ন ভক্তি জন্মিবার অল্পই সম্ভাবনা। আজ কাল ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কথা তুলিলেই লোকে বলিয়া বসে—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

এখন আর সে ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তির কাল নাই; এখন যুক্তি, তর্ক দর্শন ভিন্ন লোকে কিছু বুঝিতে চাহে না, বিশ্বাস করিতে চাহে না, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও তাই এখন বৈজ্ঞানিক মতে 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' করিতে বসিয়াছেন। আমরা তাই বলিতেছিলাম, দশ মহাবিদ্যার বাহ্যিক ভাব এখন সকল লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে না,—কাল-তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণকে অশেষবিধ ভক্তিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করিলেও এখন তাঁহারা সকলের ভক্তি উদ্দীপন করিতে পারিবেন না। এখন উঁহাদিগের আভ্যন্তরিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করা সমধিক সমীচীন বোধ হয়; কবি হেমচন্দ্র তাহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার দশমহাবিদ্যার পার্শ্বে 'কবিবর' রসিকচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কিরূপ আসন পাইবেন, বলিতে পারি না।

'তারাচাঁদ সদ্দার' এর উপাখ্যান বেশ উপদেশপ্রদ। আজকাল বঙ্গসন্তান যেরূপ হীনবল ও অকৃতজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইতেছে,

---

* সংস্কার ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমাদিগের বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

* সাতনরী।—ছোট বৌ ১৯। ২১ পৃঃ।

তাহাতে তারাচাঁদের সাহস ও বিক্রম এবং সর্ব্বোপরি অকৃত্রিম প্রভুপরায়ণতা বাস্তবিক শিক্ষার সামগ্রী। ইহার সঙ্গে ক্রমশঃ আমরা পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত সঙ্কলিত ভারতীয় "আর্য্যকীর্ত্তি" শুনিতে পাইলে সমধিক সুখী হইব। 'বঙ্গবাসী'র প্রথমাবস্থায় এইরূপ উপাখ্যান পাঠে আমরা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। কালাচাঁদ, মডেলভগিনী প্রভৃতি উপাখ্যান-রচয়িতা বঙ্গসাহিত্য সংসারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; বঙ্গভাষার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত এবং সমাজ-চিত্র গঠনেও তিনি বিলক্ষণ পটু। তাঁহার প্রণীত 'রাধানাথ' উপন্যাসও উপন্যাস-পাঠকের বিশেষ তৃপ্তিকর হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সকল উপন্যাসই কেমন এক ছাঁচে ঢালা;- তাঁহার বর্ণনাচাতুর্য্যময় উপকথার স্রোত কেমন একই ভাবে প্রবহমান—

"অবিরাম-গতি নদী বাধা নাহি মানে।
বিরাম যে কি তা' নদী কভু নাহি জানে॥"

মডেলভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস, বাঙ্গালীচরিত—সকলেরই কেমন একই ভাব, একই ভাষা, একই ছন্দ, একই ছাঁচ। আখ্যায়িকার কথঞ্চিৎ রূপান্তর থাকিলেও, সকলগুলি কেমন একই উপাদানে সংগঠিত। উহাদিগের মধ্যে যে কোন একখানি গ্রন্থ পড়িলেই সকলগুলি পাঠ করার ফল পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ, ইংরাজি সাহিত্যে Reynolds উপন্যাসকারের যে আসন লাভ করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে "রাধানাথ"-রচয়িতাও সেই আসনের যোগ্য। আমরা জন্মভূমির অঙ্গে তাঁহার হস্তপ্রসূত দুই এক খান Ivanhoe, Kenilworth বা Adam Bede এর ন্যায় নবন্যাস দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি একজন সুরসিক, সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকস্থলে 'কবিবর' রাজকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'-গত যণ্ডামার্কের ন্যায় রস গড়াইয়া যায়। পাশ্চাত্য রসিকেরা বলেন—

"Brevity is the soul of wit"

কথাটা, বোধ করি, আমাদিগের প্রাচ্য-রসিকেরাও বড় অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; 'রাধানাথে' কিন্তু brevity অপেক্ষা Tautologyই অধিক—এক "দাড়িম্বদলনী দেবী"র নামকরণ অধ্যায়েই চূড়ান্ত নিদর্শন লক্ষিত হইবে।

'বেদান্ত-দর্শন' আমাদিগের জন্মভূমির উপাদেয় সৃষ্টি। 'জীব ব্রহ্মের ঐক্য" প্রতিপাদন, "যাগ যজ্ঞাদি ও শম দমাদির প্রয়োজনীয়তা" নির্দ্ধারণ, 'জীবন্মুক্তি ও নির্ব্বাণ মুক্তির স্বরূপ' নির্ণয়, "পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয় প্রভৃতি 'গভীর বিষয়' সকল জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য। আমাদিগের উল্লিখিত মহান্ তত্ত্ব সকল "ধারণা করিবার উপযুক্ত শক্তি না থাকিলেও" ব্যাখ্যাকার স্বীয় যথাশক্তিতে উহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, আমরাও যথাশক্তি তাহা বুঝিতে ও তাঁহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা সংসারের কীট, আমাদিগের সকল কার্য্যই প্রায় বিড়ম্বনাময়; এরূপ অবস্থায়, সংসারের সারতত্ত্ব বুঝিতে গিয়া 'বিড়ম্বনা' ভোগ করাও অবাঞ্ছনীয় নহে। এই বেদান্তদর্শনই নব-প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অস্থি মজ্জা-প্রাণ; অন্ততঃ ব্রহ্মবাদীরা ইহাই বলিয়া থাকেন। "পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয়"ই যখন সেই বেদান্তদর্শনের অন্যতম প্রতিপাদ্য, তখন 'জন্মভূমির' 'বেদান্তদর্শন' দ্বারা আধুনিক হিন্দু ও ব্রাহ্মদলের পরস্পর বিরুদ্ধ মত-সমন্বয় দেখিতে পাইলে আমরা পরম সুখী

হইব,-'জন্মভূমি'রও মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

'পঙ্গপাল' ও 'ভারতে স্বর্ণ'—উভয়ই বঙ্গের বর্ত্তমান সাময়িক প্রসঙ্গ এবং তত্তৎ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞদিগের দ্বারা তাহা সুচারুরূপে আলোচিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করা আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা।

পরিশেষে, পুনরায় বলিতেছি, 'জন্মভূমি'র যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই আমরা আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিমতে এবং কর্ত্তব্যানুরোধে উহার দোষ-গুণের আলোচনা করিলাম। কোন কথা অপ্রীতিকর বোধ হইলে, উহার অনুষ্ঠাতাগণ আমাদিগের প্রতি যেন কোনরূপে বিরূপ না হয়েন, ইহাই আমাদিগের বিনম্র প্রার্থনা।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩০৮। মীন যেমন তড়াগাদির জলে জীবিত থাকে, মানবাত্মা সেইরূপ ব্রহ্ম-সত্বা-সাগরের সলিলে জীবিত থাকে। মীনের পক্ষে জল যেমন জীবন, আমাদিগের নিত্য প্রসার পক্ষে সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ-সাগরে প্রবাহ জীবন। আমরা সেই আনন্দ সাগরে যতই মগ্ন হই, ততই স্ফূর্ত্তি, বল, বীর্য্য ও পবিত্রতা লাভ করি।

৩০৯। সর্ব্বদা নিজ মঙ্গলের জন্য আপনার ছিদ্রান্বেষণ কর, কখন পরছিদ্রান্বেষী হইওনা। যখন কাহার বাক্যে, বা ব্যবহারে তোমার মনঃকষ্ট হইবে, তখন দেখিও, তুমি নিজে কতদূর তাহার কারণ। যদি তোমার বিবেক বলে, তুমি নির্দোষী, তবে তুমি প্রসন্ন চিত্তে তোমার কষ্টদানকারী ব্যক্তির দোষ ক্ষালন্ জন্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল পূর্ণ চরণে প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবে, তাহার প্রতি ক্রোধ দৃষ্টিপাত করিলে তোমার জীবন পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে।

৩১০। সকল কার্য্য কর্ত্তব্য জ্ঞানানুরোধে নিষ্কাম মনে মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদন করিবে। সৎক্রিয়ার ফল প্রত্যাশা করিলে স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হইতে হইবে।

৩১১। ১১ই মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইতেছে। আনন্দের স্রোত বহিতেছে। নহবৎ বাজিতেছে। মনে হইল, আত্মা পরমাত্মার সহিত উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইবে। পতিপ্রাণা সতীর ন্যায় সে তাঁহারই মঙ্গলপূর্ণ চরণাশ্রয়ে অবিচ্ছেদে নিত্যকাল বাস করিয়া তাঁহারই সেবা করিবে, ও তাঁহারই আনন্দ, অমৃত, শান্তি, মঙ্গল, পবিত্রতা ও শোভাদি কতই নিত্য সুখভোগ করিতে থাকিবে। ইহারি জন্য এত আনন্দোৎসব, ইহারি জন্য এত বাদ্য বাদন, এত নাম সঙ্কীর্ত্তন।

৩১২। কোন আত্মীয়ের মাতৃ আদ্য-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিয়ম ভঙ্গদিনে ও তাহার পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আজ আপনার জীবনের একটী বিশেষ দিন, এরূপ দিন আর আপনার হইবেনা। যাহার বিয়োগে এক মাসকাল অশুচি থাকিয়া শুচি হইবার এই শেষ দিনে তাঁহাকে মঙ্গল-ময়ী জগজ্জননী তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ চরণে স্থান দান করিয়া আমার গৃহে অন্নপূর্ণারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আজ তিনি আপ-নাদিগকে অন্নদান ও পরিবেষণ করিতেছেন। আজ তিনি আপনাদিগকে তাঁহার নিষ্ক লঙ্ক পবিত্রতা এবং অমোঘ আশীর্ব্বাদ দান করিতেছেন। আজ আপনি নিজ পরিবারসহ পবিত্রতা ভোগ করুন। আপনাকে অন্ততঃ এক বৎসর কাল পবিত্র ভাবে চলিতে হইবে। আপনার সদ্ব্যবহার যেন আপনার প্রিয়া ভার্য্যা ও প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রদ্বয় অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যে সৎপুত্র তাহার পিতৃ বা মাতৃ বিয়োগে এক বৎসরকাল শুদ্ধাচারে অতিবাহন করিতে পারেন, তিনি তাঁহার সেই দীর্ঘ ব্যাপী অভ্যাসের বলে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে হয়ত সেই পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কি চমৎকার ঋষিদিগের এই বিধি। ইহা কেমন জ্ঞানগর্ভ ও মধু-ময় ফলোৎপাদক।

৩১৩। পাপ কখন পাপ দ্বারা বিনষ্ট হয় না। পুণ্যই পাপের বিনাশক। তুমি যখনই কাম ও ক্রোধ, লোভাদি দ্বারা উত্তে-জিত বা আক্রান্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে অনন্যগতিতে পবিত্রস্বরূপের স্মরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট নীরবে পুণ্যবলের জন্য প্রার্থনা করিবে। তাহার পর তোমার মনঃ প্রাণ প্রশান্ত হইলে, তুমি যথোচিত ব্যবহারে সমর্থ হইবে। তুমি কিছুদিন এই রূপে আপনাকে শাসন করিবার অভ্যাস করিলে, পুণ্যপথে পাদচারণা করিতে সমর্থ হইবে। তোমার সেই উন্নত ধর্ম্মজীবন হৃদয়ঙ্গম করিবে যে, পুণ্যই পাপের একমাত্র বিনাশক।

৩১৪। সত্যস্বরূপের যে সকল সত্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে বা হইবে, তাহা অবিনশ্বর, আর মানবীয় ক্ষীণতা দোষে যে সকল তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী অসত্য তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে বা করিবে, তাহা নিশ্চয়ই নশ্বর। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যেন এই নিত্য নিয়ম বিস্মৃত না হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলোন্নতি সাধনে যত্নবান থাকেন।

৩১৫। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মতে কোন একটী ঔষধের যতই সারভাগ গ্রহন করা যায় (অর্থাৎ আটেনিউএসন (Attenuation) প্রক্রিয়া সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, তত সেই ঔষধের অসার ভাগ হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহার সারাংশ প্রকাশিত হয়, ততই তাহার সূক্ষ্মতা ও বল বাড়িতে থাকে। সেইরূপ মানবাত্মা যতই ধর্ম্ম সাধনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিমল হইতে থাকে, (অর্থাৎ তাহার পাপ, তাপ, শোক, সন্তাপ, কামনা বাসনা, পাশববৃত্তি, অভিমান, অহঙ্কার, আত্মাদর, অহংজ্ঞান, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অসার ও স্থূলভাগ বিনষ্ট হয়, ততই সে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া নূতন হইতে নূতনতর বল বীর্য্য লাভ করিতে থাকে।

৩১৬। পিতা গো! পাপেতাপে স্নান

আমি মরি জ্বলেপুড়ে। আমায় রাখ রাখ মা গো! তোমার অভয় ক্রোড়ে।

৩১৭। এই বঙ্গদেশে প্রত্যেক নূতন বৎসর আসিবার সময়ে তরুবাজী কেমন মনোহর নূতন বেশ ধারণ করিয়া প্রকৃতি-নাথের মহিমা প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদিগের পুরাতন শ্রীহীন বেশ কালসাগরে পতিত হইয়া আধিভৌতিক পদার্থের পুষ্টি সাধন করে। মানব! তুমি কেন না বৃক্ষাদির সে দৃষ্টান্ত-অনুকরণ কর। তোমার আত্মার পাপরূপ পুরাতন বেশ কালসাগরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি পূণ্যরূপ নব বেশে শোভিত হইয়া নূতন বৎসরে প্রাণেশ্বরের পূজারম্ভ কর! পাদপাদির শিক্ষা অবহেলা করিও না।

৩১৮। সুচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহাতে যে কিছু সদ্‌গুণ দেখিতে পান, তিনি তাহারই সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। তিনি জানেন যে, একাধারে সকল গুণ থাকে না। তাই তিনি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে গুণের তারতম্য দেখিয়া যাহাতে প্রত্যাশিত গুণের অল্পতা বা অভাব রহিয়াছে, তাঁহাকে তজ্জন্য তাচ্ছল্য করেন না। ভক্ত কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

৩১৯। জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিবার জন্যই বিদ্যা, জ্ঞানও ধর্ম্মচর্চ্চার প্রয়োজন। যে বিদ্যা, জ্ঞান বা ধর্ম্মালোচনায় ঐ আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না হয়, তাহা বৃথা।

৩২০। একজন চিন্তাশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অল্প পুস্তক পাঠ বা বিদ্যালাভ করিয়া যেরূপ সত্যাবধারণে ও আপনার পবিত্রতা ও উন্নতি সাধনে সমর্থ হন, সেরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া স্থূল বুদ্ধিদোষে দূষিত লোক কথনই সমর্থ হয় না। তাহার জীবন বলদের মত কেবল পুস্তকের বোঝা বাহক হয়। অতএব বেশী পুস্তক পাঠ না করিয়া অধিকতর চিন্তাশীল হও।

৩২১। বহুদর্শিতাজনিত জীবনলব্ধ-জ্ঞান, কেবল পুস্তক পাঠ নিবন্ধন জ্ঞানাপেক্ষা অধিকতর আদরনীয় ও নির্ভর করিবার যোগ্য। এই জন্য বৃদ্ধেরা নানা শাস্ত্র নানা বিদ্যা-বিশারদ না হইলেও তাঁহাদিগের বচন শ্রদ্ধার সহিত গ্রাহ্য হয়। পঞ্চাশৎ বৎসরাধিক না হইলে প্রথমোক্ত জ্ঞান লাভ হয় না।

৩২২। একাধারে সদিচ্ছা ও তাহা পূর্ণ করিবার যথাবশ্যক অর্থ থাকিলে মধুময় ফলোৎপাদন হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সদিচ্ছার বিরোধী আধারে তাহা পূর্ণ করিবার অর্থবল থাকিলে, বিবাদ বিপ্লবাদি উপস্থিত হইয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উঠিতে থাকে! পরস্পর-বিরোধী দুই শক্তির সংঘর্ষণে দুঃখ বই সুখ হয়না। কিন্তু মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে দুঃখ অধিক দিন থাকে না। ঐ দুই শক্তির মধ্যে একের জয় অবশেষে হইয়া দুঃখ দূর হয়।

৩২৩। পবিত্রস্বরূপের যতই পবিত্র সহবাস ভোগ, যতই তাঁহার কৃপাবর্ষণ, যতই তাঁহার উপর নির্ভরতা, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পাপের প্রকাশ। সেই অপাপবিদ্ধ, পূর্ণ ও অভ্রান্ত স্বরূপ বিনা ঈদৃশ পাপ সকল দেখাইবার কোন পতনশীল ভ্রান্ত ও অপূর্ণ মানুষের সাধ্য নাই। ইহা ভক্ত জীবনের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত।

৩২৪। যতই পাপ, ততই পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ। যে পরিমাণে পাপের অবসান ও পুণ্যের উদয়, সেই পরিমাণে পিতৃ চরণে পুত্রের পুনঃ সম্মিলন। আমরা এইরূপে

নিত্য পিতৃ মাতৃ মঙ্গলপূর্ণ চরণে পুনঃ সম্মিলিত হইতে থাকি।

৩২৫। মানুষ কেবল শুষ্ক জ্ঞানবলে স্থূল স্থূল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা, তাঁহার পবিত্র সহবাস ও ভক্তিরসার্দ্র জ্ঞান অভ্যাস বিনা সে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপ হইতে মুক্তলাভ করতে পারে না।

৩২৬। যাহার ভিতর যত পাপাসক্তি, ক্রোধের সময় তাহার ভাষা তত ইতর, কটু, অশ্রাব্য ও অপবিত্র হয়।

৩২৭। বিশেষ কারণ না পাইলে কাহারও চরিত্রে নীচাশয়তা আরোপ করাই নীচাশয়তা। উদার প্রেমিক ভক্ত সন্তোষজনক কারণ অবগত হইলে অপরের প্রতি ক্ষুব্ধ চিত্তে দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণমনা ও নিতান্ত স্বার্থপর পাপারাই ইহার বিপরীত আচরণ করে।

৩২৮। লোক সচারাচর নীচ বিষয়বুদ্ধিরই অধীন হইয়া চলে। অত্যল্প ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্ম বুদ্ধির উত্তেজনায় আপনাদিগকে পরিচালিত করেন। সদ্বুদ্ধিই ধর্ম্মবুদ্ধি। নীচ বিষয়, বুদ্ধি অসদ্বুদ্ধির নামান্তর। ইহার বশম্বদ হইয়া কেহই ঔদার্য্য বিশুদ্ধ প্রেম ও সরলভাব ভাবগতিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না।

৩২৯। সজ্জনে ব্রহ্মোপাসনা করিবার সময় নিমীলিত নেত্রে মানস চক্ষু দ্বারা দেখিতে হইবে যে, আমি কতগুলি অশরিরী, নিত্য-জ্ঞান-প্রেমধারী ব্রাহ্মসন্তানের সঙ্গে এক প্রাণে প্রাণেশ্বরের মঙ্গলপূর্ণ চরণ ভক্তি ও প্রেম বিগলিত হৃদয়ে পূজা করিতেছি, তাঁহার স্মরণ, মনন, গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট কাতরে সকলের মঙ্গল ও পবিত্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। এইরূপে তাঁহার উপাসনা না করিলে আমাদিগের জীবন কখনই প্রশান্ত, পবিত্র ও উন্নত হইবেনা, আমরা পরম পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার অমৃতময় ফল লাভে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব না, ইহার জন্য আমাদিগকে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া অনন্যমনা হইয়া স্থিরচিত্তে একাগ্র ভক্তি সহকারে ব্রহ্মোপাসনা করিবার অভ্যাস করিতে হইবে।

৩৩০। যে পাশব জীবনের উপর জয়লাভ করিয়াছে, সেই বীর।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈদিক যুগ।

আর্য্য হিন্দুদিগের ভারতবর্ষে আবাস।

আর্য্যজাতির আদিনিবাস কোথায় ছিল, সে বিষয়ে বিদ্বমণ্ডলী মধ্যে অশেষ তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে, এখনও হইতেছে। ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে আর্য্যজাতির উৎপত্তি, হিন্দু পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। আবার অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বল্টিক সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশ আর্য্যদের আদিম উৎপত্তিস্থান

বলিয়া প্রমাণ করিতে বড়ই ব্যস্ত। এই বিষম তর্কের মীমাংসা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; তবে আমরা এইমাত্র বলিতেপারি যে, অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে, মধ্য আসিয়াই আর্য্যজাতির আদি নিবাস-ভূমি ছিল।

যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া, পণ্ডিতেরা শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা ভট্ট মোক্ষমুলরের অধুনাতন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ, আর্য্য জাতিদিগেব দুইটী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এবং আর একটী ইয়ুরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিকে। এই দুইটি প্রবাহের সংযোগস্থল, আসিয়া মহাদেশ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতম কালেব সভ্য-দেশ সমূহ আসিয়া খণ্ডেই অবস্থিত। আর্য্য ভাষা সমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সুতরাং আসিয়াখণ্ডের মধ্যে, এবং ঋগ্বেদের জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য আসিয়া হইতে বার বার অনেক পরাক্রান্ত জাতি উদ্ভূত হইয়া ইয়ুরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হূনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগল জাতি তাহার উদাহরণ স্থল। অতএব, প্রাচীন কালেও আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া ইয়ুরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থতঃ, যদি ইয়ুরোপ, বিশেষতঃ স্কাণ্ডানেভিয়া হইতে আর্য্য জাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, আর্য্য ভাষাসমূহে সমুদ্র সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পশু-বিশেষ বা পক্ষিবিশেষের সাধারণ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম পাওয়া যায় না।

আর্য্যভাষা সমূহে যে সকল সাধারণ শব্দ আছে, তাহার অর্থসংগ্রহ করিয়া, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আদিম আর্য্যজাতির অবস্থার অনেক কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতির সেরূপ কোনও চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইব না। তবে বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক আর্য্যজাতি সম্বন্ধীয় যে সকল কথা অবিসংবাদিত রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এস্থলে সঙ্ক্ষেপে তাহার উল্লেখ কবিব।

আধুনিক আর্য্য সমাজে পিতা যেরূপ পরিবারের ভিত্তিস্বরূপ, প্রাচীন আর্য্য-সমাজেও সেইরূপ ছিল। অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যে পিতৃপুরুষ উল্লঙ্ঘন করিয়া মাতা হইতে বংশের পরিচয় দিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়; অথবা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব পুরুষ অনুক্রমে নির্ণীত না হইয়া নারী অনুক্রমে নির্ণীত হয়, এবং বিবাহ প্রণালীর শৈথিল্যের অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়। আর্য্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আর্য্য জাতির ইতিহাসে এইরূপ কোনও পদ্ধতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইবেন না। পরন্তু, আর্য্য সমাজে পিতা গৃহের পাতা ও ভরণকর্ত্তা; মাতা স্নেহময়ী, গৃহিনী ও পালয়িত্রী। দুহিতা গাভী

দোহ্‌ক্‌ত্রী; বিবাহ সমাজের বন্ধন রজ্জু।

আদিম আর্য্যদিগের মধ্যে অনেক প্রকার বন্য ও পালিত পশু পরিচিত ছিল। গাভী, ষণ্ড, বলদ, মেষ, ছাগ, শূকর, অশ্ব, বৃক, শশক, হংস, কাক, বর্ত্তিকা ও পেচক প্রভৃতি পশু পক্ষীর সাধারণ নাম আর্য্য-ভাষাসমূহে পাওয়া যায়। (যথা গৌ=Cow; উক্ষ=ox ইত্যাদি।

আদিম আর্য্যগণ নানা রূপ শিল্প কার্য্যেরও কিছু কিছু জানিতেন, তাহার প্রমাণও আর্য্য ভাষা সমূহে পাওয়া যায়। গৃহ ও নগর নির্ম্মাণ, জল পথে গমনা-গমনের জন্য নৌকানির্ম্মাণ এবং সামান্য রূপ বাণিজ্য পদ্ধতি আর্য্য-দিগের পরিচিত ছিল। তাঁহারা সেচন ও বয়ন করিতে জানিতেন ও পশুলোম ও চর্ম্ম হইতে পরি-ধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। সূত্রধরের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, এবং বস্ত্রাদি ধৌত ও রঞ্জিত করিবার প্রণালীও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, আদিম আর্য্যেরা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। কৃষিকার্য্য হইতেই, তাঁহাদের কর্ষক-ধাতার্থ-মূলক আর্য্য নাম হইয়া থাকিবে। লাঙ্গল, শকট প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উপকরণ সমূহের সাধারণ নাম আর্য্য ভাষা সমূহে পাওয়া যায়। অতএব, এই উপকরণগুলি, আদিম আর্য্য জাতির পরিচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যবাদি পেষণ করিয়া তাহা রন্ধন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পালিত গো মেষাদি হইতে দুগ্ধ ও মাংসের সংস্থান হইত। কৃষি কার্য্যই অধিকাংশ লোকের জীবিকা ছিল বটে, তথাপি, অনেকেই কৃষকের অনেকে কৃষকের ন্যায় এক স্থানে না থাকিয়া, গো মেষাদি সহ, দেশ দেশান্তরে নূতন ও উর্ব্বর চারণ ভূমির উদ্দেশে ভ্রমণ করিতেন।

তাদৃশ প্রাচীন সময়ে, সচরাচর প্রায়ই যুদ্ধ ঘটিত। তখন, যুদ্ধ কালে অস্থি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ, ও বল্লভ যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল।

প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হয়, তাঁহারা সভ্যতার কতকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অয়স্‌-নামে আর একটী ধাতুও আর্য্যদিগের পরিচিত ছিল। প্রাচীন আর্য্য ভাষায় "অয়স্" লৌহ কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তৎ কালে কিরূপ শাসন প্রণালী প্রচ-লিত ছিল, তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। সমাজে বৃদ্ধ ও অগ্রণী ব্যক্তিদের যে বিশেষ প্রাধান্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধা-রণ লোকেরা, তাঁহাদিগেকে "পতি" অর্থাৎ পালন কর্ত্তা, "বিশ্‌পতি" অর্থাৎ লোক-পালক, এবং "রাজা" অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রভু বলিয়া মানিত। সভ্য মনুষ্যের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ন্যায় অন্যায়ের বিচার চলিত এবং প্রচলিত আচার ও স্বজাতির মঙ্গলের বিরুদ্ধ কার্য্য অবিধি বলিয়া গণ্য হইত।

প্রকৃতির সুন্দর ও বিস্ময়কর পদার্থ দেখিয়া আর্য্য জাতির সরল হৃদয়ে যে স্বাভা-বিক ভাবের সঞ্চার হইত, তাহা হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় আকাশ (দ্যোঃ) তাঁহাদের চির বিস্ময় ও উপাসনার বিষয় ছিল। সূর্য্য, উষা, অগ্নি, পৃথিবী, বাত্যা, মেঘ, বজ্র, তাঁহারা এ সকলেরই উপাসনা করিতেন

ধর্ম্ম ভাব তখন অতি সরল ও অকপট ছিল। দেবতাদের সম্বন্ধে পুরাণ ও ইতিহাস এবং তাঁহাদের বৈবাহিক সম্পর্কাদি তখনও কল্পিত হয় নাই। যাগযজ্ঞের আড়ম্বর তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আর্য্যজাতি সমূহের তেজস্বী পিতৃপুরুষেরা, প্রকৃতির সুন্দর ও বিস্ময়কর প্রাকৃতিক কার্য্য পরম্পরাকেই স্বাভাবিক ভক্তিসহকারে সম্মান করিতেন, কৃতজ্ঞ ও উৎসাহিত চিত্তে তাঁহাদের স্তুতি করিতেন।

আর্য্যেরা, আহার্য্য, গোচরভূমি, ও অভিনব রাজ্য লোভে দলে দলে আদিম গৃহ পরিত্যাগ করিতেন। আর্য্যজাতি সমূহের পিতৃপুরুষেরা, কত আগে বা কত পরে, এইরূপে আদি স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি অবধারিত হয় নাই, এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই। বোধ হয়, আর্য্যেরা প্রথমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া, এক দল ইউরোপ এবং অপর দল দক্ষিণ আসিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। এই বিচ্ছেদের পর, আর তাঁহাদের দুই দলের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। ইউরোপ যাত্রী আর্য্যেরা পাঁচ জাতিতে বিভক্ত হইয়া, ইউরোপের পাঁচ অংশে অধিকার স্থাপন করিলেন। কিন্তু কোন্ জাতি কখন্ এইরূপে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। কেল্ট জাতীয়েরা, স্বেচ্ছায় হউক বা টিউটন্ প্রভৃতি জাতির তাড়নায় হউক, ফরাসি, আয়র্লণ্ড, ব্রিটেন এবং বেলজিয়ম অর্থাৎ ইউরোপের পাশ্চাত্যতম দেশ সমূহে বাসস্থাপন করিলেন। টিউটন্ জাতীয়েরা মধ্য ইউরোপে বাস করিলেন এবং রোম রাজ্য পতনের পর সমগ্র ইউরোপ জয় করিবার চেষ্টা করিলেন।

দক্ষিণ আসিয়া-যাত্রী আর্য্যেরা দক্ষিণ দিকে চলিয়া, সপ্ত সিন্ধু বা পঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলেন। হিন্দু ও ইরানি (পার্সি) জাতি তখনও এক সঙ্গে ছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধু দেশে আসিয়া, সংস্কৃত ও জেন্দ, এই দুই ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন কোনও এক সাধারণ ভাষার ব্যবহার করিতেন। তদনন্তর ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে, তাঁহারা দুই স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত হইলেন। 'দেবোপাসক' হিন্দুরা পঞ্জাবে রহিলেন, আর 'অসুরোপাসক' ইরাণীয়েরা পারস্যে গমন করিলেন। *

এই দেবোপাসক হিন্দু আর্য্যেরাই জগদ্বিখ্যাত ঋগ্বেদের প্রণেতা। মানব জাতির যত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ঋগ্বেদের ন্যায়, কৌতুহলোদ্দীপক ও উপদেশজনক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। কেবল আর্য্য জাতি সমূহের প্রাচীনতম আচার প্রণালীর এবং অধুনাতন লৌকিক প্রবাদাদির মূল বলিয়াই যে ঋগ্বেদের একপ সম্মান, তাহা নহে।

ঋগ্বেদের সমাদর লাভের এতদপেক্ষা অনেক গুরুতর কারণ আছে। মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস-লেখক, এই ঋগ্বেদে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের কারণ দেখিতে পাইবেন। কেবল মাত্র এক বেদ পাঠেই জানা যায়, কিরূপে মনুষ্যহৃদয় সর্ব্ব প্রথমে প্রকৃতির সমুজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিশালী ও বিস্ময়কর

* অনেকে বলেন, সিন্ধুনদে আগমন করিবার পূর্ব্বেই হিন্দু ও ইরাণীদের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক মতভেদ উপলক্ষে মনোবাদ জন্মে। এবং হিন্দুরা ইরাণীদের কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের এই মত।

ক্রীয়ার স্তব স্তুতি করে। ব্যাধি ও বিপত্তি-ভয়ে দুর্ভাগ্য জাতিদের ধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় দ্যৌঃ, লজ্জাবতী উষা, উদীয়মান সূর্য্য, জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি, প্রকৃতির উজ্জ্বল ও চিত্তমুগ্ধকর পদার্থপুঞ্জ নয়ন-গোচর করিয়া, আর্য্যদের সরল হৃদয়ে গভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক স্তুতি, ও সাধুবাদ-পূর্ণ গাথা সকল আপনি যেন তাঁহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। সেই হৃদয়-নিঃসৃত গাথাই ঋগ্বেদ-সংহিতা।

কিন্তু ঋগ্বেদের সমাদর ও গৌরবের আরও বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে। কি প্রকারে মানব হৃদয়ে, প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে, ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ। কারণ ঋগ্বেদের ঋষিরা, অনেক সময়ে প্রাকৃতিক বস্তুর স্তব করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। তাঁহারা চিন্তাশক্তির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া, সূর্য্য, আকাশ, বাত্যা, বজ্র,—সকলই এক অজ্ঞেয় পরমেশ্বরের প্রকাশ চিহ্ন মাত্র, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের শেষাংশের অনেক মন্ত্রে এই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

যদি সমস্ত মানবজাতির নিকট ঋগ্বেদের এত আদর হয়, তবে আর্য্যজাতি সমূহের নিকট ইহার মূল্য যে কত অধিক, তাহার পরিমাণ করা দুষ্কর। ঋগ্বেদ আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ। আর্য্যেরা পৃথিবীর নানা স্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম, ঋগ্বেদে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। আর্য্যজাতি সমূহের প্রাচীনতম দেবদিগের নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের Zeus, রোমকদিগের Jupiter, টিউটনদিগের Tiu, ঋগ্বেদের দ্যৌঃ ভিন্ন আর কেহ নহেন। Uranos ঋগ্বেদের বরুণ, Daphne ঋগ্বেদের দহনা অর্থাৎ উষা, Prometheus ঋগ্বেদের প্রমন্থ অর্থাৎ অগ্নি।

হিন্দুদের নিকট ঋগ্বেদসংহিতা মহা আদরের গ্রন্থ। ঋগ্বেদে আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিয়াছে, কি প্রকারে দেবতাগণও তাঁহাদিগের উপাখ্যান আখ্যায়িকা প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে, ঋগ্বেদ পাঠে এ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে। অতি প্রাচীনতম সময় হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির মানসিক ভাবের বৃত্তান্ত, ঋগ্বেদ না পড়িলে, বুঝিতে পারা যায় না। উদয়কালীন, মধ্যাহ্ন ও অস্তগামী সূর্য্যই পুরাণে বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের বজ্র পুরাণে মহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ধর্ম্ম স্তোত্র পুরাণে ব্রহ্মা রূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, রাম ও কৃষ্ণ, দুর্গা ও লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্ত্তিক, এই সকল দেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই।

কেবল আধ্যাত্মিক কেন, ঋগ্বেদ পাঠে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারি। ঋগ্বেদে হিন্দুসমাজের যেরূপ চিত্র রহিয়াছে, তাহাতে জাতিভেদ ছিল না, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর পিঞ্জরচারিণী ছিলেন না, ও তাঁহারা বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিতেন না।

ঋগ্বেদে ১০২৮ সূক্ত ও দশ সহস্র ঋক্। যে প্রাকৃতিক দেবতাদের উদ্দেশে সূক্তগুলি রচিত হইয়াছে, তাঁহাদের সবিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

স্তুতি-মন্ত্রগুলি প্রায়ই অতি সরল। মন্ত্র-প্রণেতারা যজ্ঞ করিয়া সোমরস প্রদান করিতেন এবং গাভী ও ধন জনাদি বৃদ্ধির আশায় এবং কৃষ্ণত্বক্ দাসদিগের জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই সকল প্রার্থনায়, দেবতাদের প্রতি, মন্ত্র-প্রণেতাদের সরল ও অকপট বিশ্বাসের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশ মণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল আট জন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিলে বোধ হয়, সেই ঋষির বংশীয় ব্যক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্যপরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমদ। এই গৃৎসমদ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা। প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, দশম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা কাল্পনিক ঋষির প্রণীত বলিয়া পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে।

মন্ত্রের ভাষা ও অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া তাহাদিগকে প্রাচীন ও অপ্রাচীন, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সে চেষ্টা যে কখনও ফলবতী হইবে, তাহা বোধ হয় না। তথাপি ঋগ্বেদের পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, দশম মণ্ডল অপর নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা যেন ঋগ্বেদের পরি-শিষ্টস্বরূপ। দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। এই সকল সূক্তে চিন্তাশক্তির বিকাশ ও উন্নতি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অতি জটিল অবস্থায় পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সূক্তে পরলোকের বর্ণনা, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মন্ত্র এবং সকল দেবতার দেবতা একমাত্র পরব্রহ্মের আভাস রহিয়াছে।

রোগ প্রতীকারের উদ্দেশে রচিত যে সকল মন্ত্র আছে, তাহা অপ্রাচীন। অথর্ব বেদ যে ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন নয়, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথর্ব্ব বেদে এরূপ মন্ত্র অনেক আছে। আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়।

ঋগ্বেদের মন্ত্র সকল আবহমানকাল পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অথবা গুরু শিষ্যপরম্পরায় শ্রবণমাত্রে আবদ্ধ ছিল। যে সময় মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময়ে দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে, সেই সময়েই তাহা সঙ্কলিত ঋগ্বেদের শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়। ঋগ্বেদের সংগ্রহকার্য্য দ্বিতীয় যুগে সমাপ্ত হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় যুগের অবসান হইবার পূর্ব্বেই, ঋগ্বেদের সূক্ত, ঋক্, পদ ও অক্ষর পর্য্যন্তের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঋক্ সংখ্যা ১০,৪০২ অথবা ১০৬২২। পদসংখ্যা ১৫৩, ৪২৬ এবং অক্ষর সংখ্যা ৪৩২০০০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষি, গোচারণ ও বাণিজ্য।

অধুনাতন হিন্দুদের ন্যায় প্রাচীন-হিন্দুদেরও কৃষিকার্য্যই প্রধান জীবিকা ছিল।

ঋগ্বেদেও ভূয়োভূয়ঃ তাহার উল্লেখ করিয়াছে। যে আর্য্যশব্দে হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে দাস ও আদিম নিবাসী হইতে শ্রেষ্ঠবান্ বলিয়া পরিচয় দিতেন, সেই শব্দ কর্ষণ-বোধক* ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইরাণ্ বা পারস্য হইতে এরিণ্ বা আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যভূমে এই শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্যশব্দ দ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিতেন, ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঋষিরা যে আর্য্যশব্দের ধাতুগত অর্থ বিস্মৃত হয়েন নাই, ঋক্বেদের অনেক সূক্তে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। একটী উদাহরণই এস্থানে যথেষ্ট হইবে। "হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাস করাইয়া) যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ। মণ্ড ১। ১১৭২।

ঋগ্বেদে চর্ষণ (১ মণ্ডল ৩। ৭) এবং কৃষ্টি (১ মণ্ডল ৪।৬) নামক যে দুইটী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কৃষিবাচক চৃষ বা কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। জাতিবাচক অর্থে স্পষ্ট ব্যবহার না থাকিলেও এই দুই শব্দ মনুষ্য অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত।

ঋগ্বেদে কৃষি সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে যে মন্ত্রের দেবতা ক্ষেত্রপতি, তাহাই অতি প্রাসঙ্গিক। নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে। (৪র্থ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত)।

১। "আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্র জয় করিব; তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।"

২। "হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃত তুল্য, মাধুর্য্যোপেত ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামিগণ আমাদিগকে সুখী করুন।"

৩। "ওষধি সমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জল সমূহও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা (শত্রু কর্ত্তৃক) অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব।"

৪। "বলীবর্দ্দ সমূহ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্র সমূহ সুখে বদ্ধ হউক, এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।"

৫। "হে শুন। হে সীর। তোমরা আমাদিগের এই স্তুতি সেবা কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার দ্বারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর।"

৬। "হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও; আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর।

৭। "ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুক, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন। তিনি জলবতী হইয়া বৎসরের পর বৎসর (শস্য) দোহন করুন। *

* এই দুই ঋকে সীতাকে স্ত্রীরূপে বর্ণনা করিয়া প্রচুর শস্য প্রদানের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সীতা অর্থ—হলে যে কর্ষণ চিহ্ন রাখিয়া যায়। যজুর্বেদে এই সীতার স্তুতি রহিয়াছে। যখন আর্য্যেরা

৮। "ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক; রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জ্জন্য মধুর জল দ্বারা (পৃথিবী) সিক্ত করুন)। হে শুনসীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।"

কৃষকের সামান্য আশা ভরসা এরূপ অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া, ঋগ্বেদ ভিন্ন অপর কোন্ সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়? ঋগ্বেদের সংহিতায় এই এক বিশেষত্ব এবং মনোহারিত্ব রহিয়াছে। দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণই হউক, পরম সহায় ইন্দ্রের স্তুতিই হউক, অথবা সামান্য কৃষকের গানই হউক, ঋগ্বেদ যেমন আমাদিগকে তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ অথচ সরল নিষ্কপট হৃদয়ের সঙ্গী করিয়া দেয়, কোন অপ্রাচীন গ্রন্থে তাহা হইবার নয়।

কৃষি সম্বন্ধে আর একটী মন্ত্রের কিয়দংশ এ স্থলে অনুবাদ করিতেছি। (১০ মণ্ডল, ১০১ সূক্ত)।

৩। "লাঙ্গলগুলি যোজন কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর; আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। শৃণিগুলি নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক।

৪। "লাঙ্গলগুলি যোজিত হইতেছে। কর্ম্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে। বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়িতেছেন।

৫। "পশুদিগের জলপান স্থান প্রস্তুত কর। বরত্রা যোজনা কর। এই উদ্রিক্ত, অক্ষয় ও সৌকার্য্যযুক্ত গর্ত্ত হইতে জল সেচন করি।

৬। "পশুদিগের জলপান স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। এই উদ্রিক্ত, অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে। অক্লেশে জল সেচন করা যায়। ইহা হইতে জল সেচন কর।"

৭। "ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদের জলাধার এক দ্রোণ প্রমাণ হইবেক। ইহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হইবেক। ইহা জলপূর্ণ কর।"

পঞ্জাব প্রদেশে কূপ-জল না হইলে জল সেচন ও কৃষিকার্য্য অসম্ভব, সুতরাং মনুষ্য ও গবাদির জল পানের জন্য কূপ খনন করা হইত। আবার উদ্ধৃত মন্ত্রে ঋগ্বেদ-সময়ে কৃষিকার্য্যে অশ্ব ব্যবহৃত হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষে এই আচার লোপ পাইলেও অদ্যাপি ইউরোপ খণ্ডে কৃষিকার্য্যে অশ্বের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

দশম মণ্ডলের ২৫শ সূক্তের ৪র্থ ঋকে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে কূপের উল্লেখ রহিয়াছে। "হে সোম! যেরূপ কলসগুলি জল উত্তোলন করিবার জন্য কূপের মধ্যে যায়, তদ্রূপ আমাদের স্তব সমস্ত তোমাতে যাইতেছে।" উক্ত মণ্ডলের ৯৩ সূক্তে কূপ হইতে কি প্রকারে জল উত্তোলন করা হইত, তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। "যেরূপ

সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া বন বিনাশ করিয়া তাহাতে সীতা পরিচালিত করিলেন, তখন লাঙ্গলচিহ্ন সীতা মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া অবশেষে দাক্ষিণাত্য জয় বিবরণ পূর্ণ রামায়ণের নায়িকা রূপে স্থান পাইলেন।

ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্র পশ্চাৎ ভাবে উঠিতে থাকে, আমার স্তবগুলিও তদ্রূপ।" ১৩শ ঋক্। অদ্যাপি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই উপায়ে জল উত্তোলিত হয়। অনেকগুলি ঘটী রজ্জুতে একাদিক্রমে বদ্ধ করিয়া একটী চক্রের সাহায্যে কূপে অবতরণ করাইয়া তাহা পূর্ণ করা হয়। চক্র যেমন ঘুরিতে থাকে, ঘটী জলপূর্ণ হইয়া উপরে আনীত হয়। ঋগ্বেদে ইহার নাম ঘটীচক্র; অদ্যাপিও এই নামে তাহা পরিচিত।

দশম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দ্রোণে পয়োনালী পরিপূর্ণ করিয়া ক্ষেত্র সেচন করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। "তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়া মেঘে ভ্রমণ পূর্ব্বক উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়া ঘৃত তুল্য জল বহাইয়া দেয়; তাহাদের চরণ নাই, রথ নাই, দ্রোণিই তাহাদিগের অশ্ব।" পুনরপি উক্ত মণ্ডলের ৬৮ সূক্তের প্রারম্ভে রহিয়াছে, "জল সেচনকারী কৃষাণগণ পক্ষীদিগকে শস্য ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোলাহল করে।"

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—কৃষিকার্য্যের যেরূপ প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, গোচারণের উল্লেখ তাদৃশ পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। পূষা, গোপাল বা মেষ পালের দেবতা; তাহাদের নিকট পূষা সূর্য্যস্বরূপ। মধ্য আসিয়ায় থাকিতে এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াও আর্য্যেরা যে গো মেষাদির চারণভূমি অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ যাত্রা করিতেন, ঋগ্বেদে তৎসম্বন্ধে কিংবদন্তী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে রহিয়াছে;—

১। "হে পূষা! পথ পার করাইয়া দাও। (বিঘ্নহেতু) পাপ বিনাশ কর; হে মেঘপুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

২। "হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

৩। সেই মার্গপ্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

৪। "যে কেহ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) উভয়ই হরণ করে এবং অনিষ্ট সাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা, তাহার পরসন্তাপক দেহ, তোমার পদের দ্বারা দলিত কর।

৫। "হে শত্রুবিনাশী ও জ্ঞানবান্ পূষা! যেরূপ রক্ষণাদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলে, তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি।

৬। "হে সর্ব্বধনসম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা! তুমি অনন্তর ধনসমূহদিগকে শোধন কর।

৭। "বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও। হে পূষা! তুমি এই [পথে] আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৮। "শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। হে পূষা! তুমি এই [পথে] আমাদের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৯। "[আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে] সক্ষম হও। (আমাদিগের গৃহ ধনে) পরিপূর্ণ কর। (অন্য অভীষ্ট বস্তুও) দান কর।

(আমাদিগকে) তীক্ষ্ণতেজা কর। আমাদের উদর পূরণ কর। হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

১০। "আমরা পূষাকে নিন্দা করি না, সূক্তদ্বারা স্তুতি করি, আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাঞ্চা করি।"

দশম মণ্ডলের ১১৯শ সূক্তে গাভীদিগকে বাহির করিয়া গোষ্ঠে নেওয়া এবং পুনর্ব্বার বাটীতে ফিরাইয়া আনা সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। তাহা হইতে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি।

৪। "যিনি গোপাল অর্থাৎ রাখাল, তাঁহাকে আমি আহ্বান করিতেছি, তিনি এই গাভীদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যান, গোষ্ঠে চারণ করুন, চিনিয়া চিনিয়া লউন, বাটীতে ফিরাইয়া আনুন, ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিক বিচরণ করাইয়া দিন।

৫। "যে রাখাল চতুর্দ্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরাইয়া আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে ফিরিয়া আসে।

৮। "হে নিবর্ত্তন (গোচারণকারী পুরুষ) গাভীগণকে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরাইয়া লইয়া এস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চারিদিকে বিচরণ করাইয়া ফিরাইয়া লইয়া এস।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সূক্তসমূহে আর্য্য দেশের চতুঃপার্শ্বে উপদ্রবকারী শত্রুদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা আদিম পরিচিত জাতিভুক্ত লোক; আর্য্য গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী বনে লুক্কায়িতভাবে বাস করিত এবং অবসর পাইলে আর্য্যদের গবাদি চুরি ও অন্যান্য প্রকারে উপদ্রব করিত। ইতঃপশ্চাৎ ইহাদের সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে।

ঋগ্বেদ দেবতাদের স্তব সংগ্রহ। তাহার মধ্যে পণ্যবাণিজ্যের অধিক উল্লেখ থাকা সম্ভব নয়। তথাপি যাহাতে তাৎকালীক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নীতি অবগত হইতে পারি, ঈদৃশ বর্ণনা কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। টাকা ধার দেওয়ার নিয়ম সুপ্রচলিত ছিল। এক স্থানে ঋষিরা নিজদের ঋণাবদ্ধতার দুঃখ অতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। (স্মরণ রাখা উচিত যে, ঋগ্বেদে ঋষিরা পরবর্ত্তী কালের সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থগত মনি নহেন; তাঁহারা বিষয়ী গৃহস্থ লোক)। এক স্থানে লিখিত আছে, একবার কোন বস্তু বিক্রয় হইলে, পুনর্ব্বার সেই বিক্রয় অতিক্রম করিয়া আর বিক্রয় হইতে পারে না। চতুর্থ মণ্ডল, ২৪ সূক্তে ৯ম ঋক্, যথা—"(কেহ) অনেক (পণ্যের) দ্বারা অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, পরে (ক্রেতার নিকট) গমন করতঃ "আমি বিক্রয় করি নাই" বলিয়া অবশিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা 'অনেক দিয়াছি' বলিয়া অল্প মূল্য অতিক্রম করিতে পারে না। সমর্থ হউক বা অসমর্থ হউক, বিক্রয়কালে যে কথা বলে, তাহাই থাকিয়া যায়।"

উদ্ধৃত ঋক হইতে বোধ হয় যে, ক্রয় বিক্রয়ে মুদ্রা ব্যবহার করিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক স্থানে ঋষিরা শত স্বর্ণ মুদ্রা দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। "এরুণ আমাকে শত (সুবর্ণ), বিংশতি গো এবং শকট বাহনক্ষম অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। ৫।২৭।২। এই কথা নিশ্চয় যে, এই সকল ঋকে কোন নির্দ্ধারিত মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সে মুদ্রা প্রকৃত মুদ্রা (coined money) নহে; কেবল নিরূপিত ওজনের সুবর্ণ ছিল

মাত্র। অনেক স্থলে নিষ্ক বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। "আমি কক্ষীবান তাঁহার নিকট শত নিষ্ক, শত লক্ষণ যুক্ত অশ্ব ও শত বলীবর্দ্দ গ্রহণ করিলাম।" কোথাও ইহার অর্থ মুদ্রা কোথাও বা আভরণ। এই দুই অর্থ পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতে মুদ্রাকে অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহার করা ভারতবর্ষের রীতি রহিয়াছে।

অনেক স্থলে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে ভুজ্যুর ও অশ্বিদ্বয় কর্তৃক তাহার প্রাণ রক্ষার বর্ণনা আছে। "কোন ম্রিয়মান মনুষ্য যেরূপ ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র (অতি কষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদিগের নৌকা সমূহ দ্বারা তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।" * ৩ ঋক্। এই মণ্ডলের ২৫ সূক্তে বরুণ "অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন এবং সমুদ্রের পথ জানেন" বলিয়া বর্ণনা রহিয়াছে। ৪র্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে ধনলাভার্থ সমুদ্র গমনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

"৬। হে দ্যাবা পৃথিবী দ্বয়! যেমন ধন লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা (সমুদ্র মধ্যে) গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে, সেইরূপ আমি অভিলষিত কার্য্য লাভের জন্য অহির্বুধ্ন্য নামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি।"

সপ্তম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তে ৩ ঋকে বশিষ্ঠ বলিতেছেন—"যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।"

সমুদ্র গমন সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু সমুদ্র গমন করিবে না, করিলে অপকার্য্য হয়, ঋগ্বেদের কুত্রাপি এরূপ কথা নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

কামাতুরদের জন্য মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নহে।

১। গর্ভাধান।

মনু লিখিয়াছেন,—

গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥ ২। ২৭

"গার্ভ" হোম বা গার্ভসংস্কার সমূহ এবং জাতকর্ম্ম চৌড় মৌঞ্জীনিবন্ধন দ্বারা দ্বিজ বা হিন্দুদের বৈজিক ও গার্ভিক দোষ স্খালন হয়।

সন্তান গর্ভে থাকিতে যে সংস্কার, তাহা গার্ভ সংস্কার। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন,—

---

* সায়নাচার্য্য বলেন, 'তুগ্রনামে অশ্বিদিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন, তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে, সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূরে গিয়া সেই নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন। তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদের পোতে অবস্থান করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন।

নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতঃ বিধিঃ।
তস্যশাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্যকস্যচিৎ॥২।১৬

"নিষেক হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানে দাহ পর্য্যন্ত মন্ত্রানুসারে সংস্কার যে ব্যক্তির বিধি রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রে অধিকারী, অপর লোকেরা শাস্ত্রের অধিকারী নহে'।"

মনুর মতে "গার্ভ সংস্কার" মধ্যে নিষেক সর্ব্ব প্রথম। টীকাকার মেধাতিথি নিষেক শব্দের গর্ভাধান অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু টীকাকার মেধাতিথি অপেক্ষা শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ স্বয়ং শাস্ত্রকারেরা নিষেক সংস্কারের যে অর্থ ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন—

"গর্ভস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেককর্ম্ম। ১ স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনম্। ২। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নম্। ৩। সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অর্থাৎ গর্ভ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট জানিতে পারিলে নিষেক কর্ম্ম। স্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন এই কথাই কবিতা করিয়া মহর্ষি শঙ্খ লিখিয়াছেন ;—

"গর্ভস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ততস্তু স্পন্দনাৎকার্য্যং সবনন্তু বিচক্ষনৈঃ॥ ২। ১

মহর্ষি অঙ্গিরা লিখিয়াছেন ;—

পূর্ব্বশ্চ স্রাবিতো যশ্চ গর্ভো যশ্চাপ্যসংস্কৃতাঃ।
দ্বিতীয়ো গর্ভসংস্কারাস্তেন শুদ্ধি বিধীয়তে॥৬৭

"প্রথম গর্ভ যদি অসংস্কৃত হইয়া স্রাবিত হয়, তবে দ্বিতীয় গর্ভে গর্ভসংস্কার করিবে। তাহা হইলে বিশুদ্ধি হয়।"

তবে এই হইল যে, নিষেক সংস্কার এমন সময়ে হইবে যে, তাহা না হইতেই গর্ভস্রাব সম্ভব ছিল। মহর্ষি বিষ্ণু ও শঙ্খের মত (গর্ভস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেকঃ) অঙ্গিরাবাক্যে দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। মহর্ষি ব্যাস লিখিয়াছেন ;—

গর্ভাধানং প্রথমত স্তৃতীয়ে মাসিপুংসবঃ
সীমন্তশ্চাষ্টমে মাসিজাতে জাতক্রিয়া ভবেৎ॥১।১৬,১৭

প্রথম মাসে গর্ভাধান, তৃতীয় মাসে পুংসবন. অষ্টম মাসে সীমন্ত; সন্তান জন্মিলে জাতকর্ম্ম।

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন, একমাস মধ্যে গর্ভ হইয়াছে কি না, তাহা জানা যায় না, সুতরাং প্রথমত শব্দের অর্থ প্রথম মাস নয়। যদি প্রথম মাস জানা না গেল, তবে তৃতীয় ও অষ্টম মাস কি প্রকারে গণনা হইবে? ব্যাস, গর্ভের প্রথম মাস নির্দ্ধারণ করা যায়, বিশ্বাস করিয়া প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম মাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল স্থানে বিষ্ণু ও শঙ্খ "গর্ভের স্ফুট জ্ঞানে" এবং "স্পন্দনের পূর্ব্বে" এইরূপ বিধি করিয়াছেন। কুমারী ভার্য্যার প্রথম রজোদর্শনে গর্ভাধান-সংস্কার মনু, বিষ্ণু, শঙ্খ, অঙ্গিরা ও ব্যাস, কেহই এই কথা বলেন নাই।

মনু যে নিষেক সংস্কারের কথা লিখিয়াছেন, যে সময়ে সেই নিষেক সংস্কার হওয়া উচিত, বিষ্ণুসংহিতা ও শঙ্খ সংহিতায় তাহার সময় নির্দ্দেশ রহিয়াছে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যে কোন সময়ে উপযুক্ত বর মিলিবে, তখনই বিবাহ দিবে। সুতরাং ঋতুমতী হইয়া অনেক কন্যার বিবাহ হইত। বাঙ্গালাদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের অনেকের রজস্বলা হইলে বিবাহ হয়। প্রথম রজোদর্শনে নিষেক-সংস্কার কখনই মনুর অভিপ্রেত অর্থ নহে। এবং

শঙ্খ ও বিষ্ণুমতে এই প্রকার কদর্থ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

ব্যাসাদি কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিষেক শব্দ নাই। তাঁহারা গর্ব্ভাধান শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য, মনুর ব্যবস্থা—"নিষেকাদিশ্মশানান্তোমন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ" উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

যাজ্ঞবল্ক্য। ১। ০

গর্ব্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম ॥ ১।১১

ঋতু হইলে গর্ব্ভাধান, স্পন্দনের পূর্ব্বে সবন, ষষ্ঠ বা অষ্টমে সীমন্ত এবং প্রসবে জাতকর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, "ঋতুকালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে।" প্রথম ঋতুতেই গর্ভাধান, এইরূপ অর্থ না করিয়া বিবাহের পর প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, এই অর্থ করিলে কোনও প্রকারে কদর্থ হয় না। তবে কিনা যাজ্ঞবল্ক্য অরজস্বা অবস্থায় কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত, বক্ষ্যমাণ শ্লোকে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যা মৃতাবৃতৌ।১।৬৪

কন্যা ঋতুমতী হইলে কন্যাদাতার ভ্রূণহত্যাপরাধ হয়।

জিজ্ঞাসা করি, "গর্ব্ভাধানম্ ঋতৌ"—প্রথম ঋতুতে গর্ব্ভাধান, এই অর্থ কি করিতে হইবে? ঋতুকালে অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ষোড়শ দিনমধ্যে গর্ব্ভাধান সংস্কার হইবে, অনৃতুকালে অর্থাৎ এই ষোল দিন অতিক্রান্ত হইলে আর গর্ব্ভাধান সংস্কার হইবে না, ইহাই প্রকৃত অর্থ।

মনুর ব্যবস্থা "ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ" টীকায় মেধাতিথি তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঋতুকালে স্ত্র্যভিগামী হইবে, কিন্তু অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না। "গর্ব্ভাধানম্ ঋতৌ" এই বিধির অর্থ এই যে "ঋতুকালে গর্ব্ভাধান হইবে, অনৃতু কালে গর্ব্ভাধান সংস্কার হইবে না।" প্রথম ঋতু বা দ্বিতীয় ঋতু বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রে কোন নির্দ্দেশ নাই। "সমে যজেত" অর্থ সমদেশে যজ্ঞ করিবে, বিষমদেশে যজ্ঞ করিবে না। তদনুসারে "ঋতু কালাভিগামীস্যাৎ" অর্থ ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না। "গর্ব্ভাধানম্ ঋতৌ" বিধির অর্থ ঋতুকালে গর্ব্ভাধান সংস্কার হইবে, অনৃতু কালে গর্ব্ভাধান সংস্কার হইবে না। "সমে যজেত" এই সূত্রের এইরূপ কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই যে, যত সমদেশ আছে, তন্মধ্যে যে সমদেশ সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহাতে যজ্ঞ করিবে। সুতরাং "ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ" সূত্রের "প্রথম" ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অথবা "গর্ব্ভাধানম ঋতৌ" ইহার "প্রথম" ঋতুতেই গর্ব্ভাধান করিবে, ঈদৃশ ব্যাখ্যা কোনও মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

নিষেক সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হইতেছে। এক মতে গর্ব্ভ নিশ্চয় হইয়াছে, জানিলে অথবা গর্ব্ভের প্রথম মাসে সংস্কার। বিষ্ণু, শঙ্খ ও মনু এই মতের পোষক। অপর মতে গর্ব্ভ হউক, এই ইচ্ছা করিয়া যে কোন ঋতুতে প্রথম স্ত্রী-সঙ্গম হয়, সেই ঋতুতে গর্ব্ভাধান সংস্কার হইত। যাজ্ঞবল্ক্য * এই মতের প্রবর্ত্তক। যে শাস্ত্রই অনুসরণ কর, স্ত্রীর "প্রথম" ঋতুতে গর্ব্ভাধান সংস্কার না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, ইহা কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রেত নয়। †

* ব্যাসকেও এই মতের পোষক স্বীকার করা যাইতে পারে।

† এই সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক সম্বন্ধে অন্যান্য পণ্ডিতগণ কি বলেন, আমরা জানিতে চাই। ন, স।

কুমারী কাহাকে বলে ?

মনু বলিয়াছেন—

রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥ ১১।৫৯

স্বযোনি, কুমারী, অন্ত্যজা, সখি স্ত্রী, পুত্র স্ত্রী, ইহাদের সঙ্গে রেতঃসেক হইলে গুরুতল্প পাপ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

সখিভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিষ্বন্ত্যজাসু চ।
সগোত্রাসু সুতস্ত্রীষু গুরুতল্প সমং স্মৃতম্॥
আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ॥
ছিত্ত্বালিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি॥ ৩।২৩৩

সখিভার্য্যা গমন ও কুমারী গমন, আচার্য্য পত্নী গমনে গুরুতল্প অপরাধ হয়। এই সকল স্ত্রীলোক সকামা হইলেও অপরাধীর লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড হইবে।

মনুর টীকাকার মেধাতিথি "কুমারী" শব্দের "অনূঢা স্ত্রী" অর্থ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সেই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কুমারী শব্দের "অনাগতার্ত্তবা," প্রথম বয়োবিশিষ্টা, এই রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থ এত অনিশ্চিত যে, কল্পনা বলে কোন একটা অর্থ অবলম্বন করিলেই হইল ? পুরাণেতিহাসাদি-ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নির্ণায়ক অনেক কোষ রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল কোষ সৃষ্টি হইবার অনেক পূর্ব্বে দুই মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি বেদসংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এক ব্যক্তি শব্দের ধাতু প্রত্যয় ও অর্থ নির্ণয় করিয়া ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদব্যাস ঈশ্বরাবতার বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কিন্তু আপামর সকলের নিকট পাণিনি মহেশাবতার বলিয়া আদৃত। বেদব্যাস ভ্রম ক্রম ছাড়িয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা কোন মন্ত্র আর ঋক্‌বেদে নূতন প্রবেশ করাইতে পারি না, অথবা পাণিনি-সম্মত ধাতু প্রত্যয় ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন শব্দের অভিনব অর্থ করিতে পারি না। পাণিনি বলিয়াছেন "আচার্য্যাণী" শব্দের অর্থ "আচার্য্যের স্ত্রী" এবং "আচার্য্যা" শব্দের অর্থ "স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী।" যদি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভার্য্যাকে আচার্য্যা বলি, আর পণ্ডিতা রমাবাইকে আচার্য্যাণী বলি, তবে পাণিনির অবমাননা অথবা পাণিনি-জ্ঞান-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করা হয়। মেধাতিথি গোবিন্দ রাজ তো অতি সামান্য লোক; সায়নাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যকেও পাণিনি ধৃত অর্থ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইয়াছে। পাণিনি উনাদি সূত্রে কহিয়াছেন "পুবশ্চ হ্রস্বঃ ১৬৫। পঞ্চম পাদঃ" অর্থাৎ পূ ধাতুর উত্তর "ক্ত্র" প্রত্যয় হয়, আর দীর্ঘ উ হ্রস্ব হয়। এই রূপে "পুত্র" শব্দ উৎপন্ন। কল্পনা বলে পুৎ নামে নরকের আবিষ্কার করিয়া ত্রৈ ধাতুর উত্তর ডচ্ প্রত্যয় করিলে বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু পাণিনিকে অশ্রদ্ধা করা হয়।

পাণিনি বলেন "বয়সি চ।৩।২।১০। উদামানার্থং সূত্রম্। কবচহরঃ, কুমারঃ।" এখন যদি আমি বলি, কুমার শব্দ বয়োবাচক নহে, কিন্তু বিবাহ-বাচক, আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?

পাণিনি বলেন "প্রথমে বয়সি।৪।১।২০। প্রথম বয়োবাচিনোঽদন্তাৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্ স্যাৎ। কুমারী।" কুমার শব্দের উত্তর প্রথমবয়স বুঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় হয়। এখন

যদি পাণিনিকে তুচ্ছ করিয়া বলি, কুমারী শব্দের অর্থ "প্রথম বয়োবিশিষ্টা স্ত্রী" নহে, কুমারী অর্থ "অনূঢ়া স্ত্রী," মূর্খ ছাড়া কে আমার কথায় আস্থাস্থাপন করিবে? তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় যে সকল ব্যক্তিরা ঋক্‌বেদোল্লিখিত আর্য্যের সন্তান অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত দ্বিজের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, এবং মহেশ্বরাগত-পাণিনি-প্রোক্ত-অষ্টাধ্যায়ী যাহাদের কণ্ঠস্থ, তাঁহারা কখনই মেধাতিথি সম্প্রদায়ের কপোলঃকল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া পাণিনির মস্তকে পদাঘাত করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় ব্রাহ্মণকে "দ্বিজ" বলে; কিন্তু মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজ শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।" কুমারী শব্দও বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা অনেকে অনূঢ়া অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে কি প্রচলিত বাঙ্গালা অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্বাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের অর্থ করিতে হইবে? পল্লবগ্রাহিতা আর কাহাকে বলে?

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, কুমারী সহবাস ভগিনী-সহবাস তুল্য মহাপাপ। দণ্ড, মুষ্কচ্ছেদন বা লিঙ্গচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রাণবধ। একি সম্ভব কথা, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাকরণ জানিতেন না, অথবা পাণিনি মানবশাস্ত্র ও যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রাদির ভাষা বুঝিতেন না?

মনুর মতে সকামা কন্যাদূষণের শাস্তি অর্থদণ্ড। যাজ্ঞবল্ক্য মতে

কন্যাদূষণশ্চৈব পরিবেদক যাজনম্। ৩।২৩৮

*   *   *   *

ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষাম্ একৈকম্ উপপাতকং।
৩।২৪১

কন্যাদূষণ প্রভৃতি অপরাধ উপপাতক মধ্যে গণ্য। তাহার শাস্তি চান্দ্রায়ণ।

উপপাতক শুদ্ধিস্যাৎ এবঞ্চান্দ্রায়নেন বা। ৩।২৬৫

তবে দেখুন, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এই দুই ব্যবস্থাকারের মতে কুমারীগমন ও কন্যাগমনের দণ্ডেতে কত তারতম্য! রাজপুরুষেরাই শাস্তি বিধান করুন, আর সামাজিক শক্তির কেন্দ্রীভূত বিদ্বন্মণ্ডলিই শাস্তি বিধান করুন, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে বলিতেছেন, কুমারীগমনে মুষ্কচ্ছেদন বা লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড, আর কন্যাগমনে লঘুশাস্তি। কন্যা ও কুমারী শব্দ একার্থক হইলে, তাঁহারা কি দণ্ডের এত তারতম্য করিতেন? কুমারী "প্রথম বয়োবিশিষ্টা স্ত্রী" আর কন্যা "অনূঢ়া স্ত্রী" এই অর্থ গ্রহণ করিলে মনু ও পাণিনিতে বিরোধ হয় না, অথবা যাজ্ঞবল্ক্য বা মনুকৃত বিধি সমস্ত পরস্পর বিসংবাদী হয় না। শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিরোধী ব্যক্তিরা পুনর্ব্বার পাণিনি সূত্র ও মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখুন। সামান্য টোলের ছাত্রের ন্যায় টীকা টিপ্পনী চটিকে মান্য করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকারকের মস্তকে পদাঘাত করিবেন না।

বিধবাবিবাহ-প্রচারক পরাশর বলিতেছেন;—

সীদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।
কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা। ১। ৩১

এই কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয়, আর কুমারী অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কুমারীগমন ছিল, তাহার দণ্ড মুষ্কচ্ছেদন করিয়া প্রাণবধ। কলিযুগে কুমারীর সন্তান হইতে লাগিল। কলির এমনি মাহাত্ম্য! কুমারীর সন্তান সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন—

কুমারী সম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধ স্মৃতঃ॥ ।০

চণ্ডাল ত্রিবিধ। ১। কুমারী স্ত্রীর সন্তান। ২। সগোত্রাজাত সন্তান। ৩। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণী জাত সন্তান। "কুমারী সম্ভব" কথনই 'কানীন পুত্র' হইতে পারে না। পাণিনি কন্যা শব্দে প্রথম বয়োবিশিষ্টা স্ত্রী অর্থ করিয়াছেন। কানীন শব্দের বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যা পাণিনিতে দেখিতে পাই। "কন্যায়াঃ কনীন চ।৪।১।১১৬। চকারাৎ... দোঽণ। তৎ সন্নিয়োগেন কন্যায়াঃ কনীনাদেশশ্চ। কানীনো ব্যাসঃ কর্ণঃ। অনূঢ়ায়া এবাপত্যমিত্যর্থম্।" অনূঢ়ার কন্যা বা। ব্যাস ও কর্ণ উভয়ে কানীন পুত্র ছিলেন, তাঁহারা কেহই চণ্ডাল নহেন। যে নষ্ট ব্যক্তি বলেন, ব্যাস চণ্ডাল ছিলেন, তাঁহাকে পুষ্প চন্দন দান করিব, না পাদুকা মালায় ভূষিত করিব?

স্ত্রীলোকের পরম বয়স কি? মনু ৯ অধ্যায়ে স্ত্রীলোকের বয়স তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কৌমার, যৌবন ও স্থবির। রজোদর্শন পর্য্যন্ত কৌমার, রজোদর্শন হইতে রজ নিবৃত্তি পর্য্যন্ত যৌবন, রজ নিবৃত্তি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থাবির বা বার্দ্ধক্য।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ মনু ৯।৩

কৌমারে অর্থাৎ রজোদর্শন যত দিন না হয়, ততদিন পিতা, যৌবনে অর্থাৎ রজোদর্শন হইতে যত দিন স্বাভাবিক মাসিক নিবৃত্তি না হয়, ততদিন স্বামী, এবং তাহার পর পুত্রগণ স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। স্ত্রীলোকদিগকে যেন স্বতন্ত্রা হইয়া থাকিতে না হয়।

বর কন্যার বিবাহ সময়।

পিতা, কন্যার রজোদর্শনের তিন বৎসর মধ্যে তাহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু উপযুক্ত বর পাইলে অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। আর উপযুক্ত বর পাইতে বিলম্ব হইলে উক্ত তিন বর্ষ অতিক্রম হইয়া বিবাহ হইলেও দোষ নাই। অধিক কি, উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যা আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবেক, মনু এরূপ বিধানও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা,—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্। ৯।৯০।

কন্যা ঋতুমতী হইলেও, তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। আরও—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।৯।৮৯

"ঋতুমতী কন্যাও আমরণ পিতৃগৃহে অবস্থান করিবে, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক গুণহীন বরকে কখন কন্যা দান করিবে না।" ঋতু হইলেই গর্ভাধান করিতে হইবে, মনুর ব্যবস্থা এরূপ নয়।

বরের বয়স সম্বন্ধে মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন, চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ—

ষট্ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥৩।১
গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥৩।৪

গুরুগৃহে ৩৬ বর্ষ ত্রৈবেদিক ব্রত আচরণ করিবে, ৩৬ বর্ষ না হইলে ১৮ বৎসর, তাহা না হইলে ৯ বর্ষ, অথবা যে পর্য্যন্ত ব্রত গ্রহণ সমাপ্ত না হয়, ততদিন গুরুগৃহে এই ব্রত আচরণ সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইবে

এবং তখন সুলক্ষণান্বিত সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিবে।

গুরুর নিকট পাঠ সমাপনের পূর্ব্বে ভার্য্যাগ্রহণ করা কোনও শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নয়। পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে থাকিয়া যুবকদের চরিত্র দোষ জন্মিত না। আজকাল পিতৃগৃহে থাকিলেও শিশুদের চরিত্র দোষ জন্মিবে, এই আশঙ্কা। তাহাদের পাঠ ব্রত সমাপন না হইতেই গুরুর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বালক অবস্থায় বিবাহ দেওয়া হয়। মনু বলুন আর পরাশর বলুন, কোনও প্রাচীন কি আধুনিক শাস্ত্রকারের মতে পুরুষের বাল্য বয়সে, পাঠব্রত সমাপনের পূর্ব্বে, বিবাহ ধর্ম্ম-বিবাহ নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কন্যাসম্বন্ধে মহর্ষি মনুর সার ব্যবস্থা এই যে, উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যার বিবাহ দিবে না, এবং পাঠব্রত সমাপন না করিয়া বিবাহ করিবে না। পুরুষের বিবাহ বয়স কোনও শাস্ত্রকার পরিবর্ত্তন করেন নাই। মনু বলিয়াছেন, "কালেঽদাতা পিতা বাচ্যো"—উপযুক্ত বর মিলিলেও যথা কালে কন্যা সম্প্রদান না করিলে পিতা দোষী। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা আরো পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

> যাবচ্চ কন্যাম্ ঋতবঃ স্পৃশন্তি
> তুল্যৈঃ সকামাম্ অভিযাচ্যমানম্।
> ভ্রূণানি তাবন্তি হতানিতাভ্যাং
> মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥ ১৭ অধ্যায়।

তুল্য বর কন্যাকে যাচ্ঞা করিতেছে, অর্থাৎ উপযুক্ত বর মিলিতেছে, এবং কন্যাও তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছে, এমন অবস্থায়ও পিতা মাতা যদি কন্যা সম্প্রদান না করে, এবং কন্যা ঋতুমতী হইয়া থাকিলে পিতা মাতা ভ্রূণহত্যারূপ পাপে লিপ্ত হয়েন। সুতরাং উপযুক্ত বর না পাইলে এবং সম্মতা না হইলে কন্যা রজস্বলা হইলেও পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা দোষ ভাগী নহেন।

কিন্তু মনু ও বশিষ্ঠের পরবর্ত্তী মহর্ষিদের বিধি অনেক সঙ্কীর্ণ। মনু ও বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, কন্যার রজোদর্শনের তিনবৎসর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবে, যদি উপযুক্ত বর মিলে। অপর শাস্ত্রকারেরা বলেন, সদৃশ অভিরূপ বর মিলুক আর না মিলুক, রজোদর্শনের পূর্ব্বে অবশ্যই কন্যার বিবাহ হওয়া চাই, নতুবা পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন। এই শ্রেণীর শাস্ত্রকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে, মনুকে তো একেবারে পায়ে ঠেলা যায় না, তবে দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে যদি কন্যা ঋতুমতী হয়, তবে পিতা মাতা ভ্রাতা দোষ ভাগী হইবেন না। কিন্তু দ্বাদশ বর্ষের পরে কন্যা (অনূঢ়াবস্থায়) ঋতুমতী হইলে পিতা মাতার ভ্রূণ হত্যা পাপে আর নিষ্কৃতি নাই।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে মহর্ষি পরাশর কাহারও অপরিচিত নহেন; পরাশর—

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥ ৪। ২৭

পতি নষ্ট, মৃত, প্রব্রাজিত, ক্লীব ও পতিত হইলে নারীগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন, এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পরাশর যেমন বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী, আবার তেমনি রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহের বিশেষ উদ্যোগী। তিনি বলিয়াছেন—

> অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
> দশবর্ষা ভবেৎকন্যা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ৭৬

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥ ৭।

"অষ্টবর্ষা বালিকাকে গৌরী, নববর্ষা বালিকাকে রোহিণী, দশবর্ষা বালিকাকে কন্যা এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাকে (ঋতুমতী না হইলেও) রজস্বলা বলা যায়। দ্বাদশ বর্ষ বা তদধিক বয়সে যদি কন্যা (অনঢ়াবস্থায়) ঋতুমতী হয়, তবে "পিতর" পিতা মাতা ভ্রাতা সেই রজঃ পান করেন।" সুতরাং কন্যা চতুর্দ্দশ, ষোড়শ বা ততোধিক বর্ষ পর্যন্ত রজস্বলা না হইয়া পিতৃগৃহে রহিলে পরাশর মতে পিতার কোন দোষ স্পর্শ হয় না। মহর্ষি যম বর্ষের দ্বাদশ বর্ষের পূর্বে কন্যার রজোদর্শনের পাপ হইতে পিতাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

প্রাপ্তে দ্বাদশমবর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥ ২২

যম ও পরাশর ভিন্ন আর সমস্ত আধুনিক শাস্ত্রকারদের মত এই যে, যে বয়সেই হউক, পিতৃগৃহে কন্যার রজোদর্শন হইলেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন। মুসলমানদের অধিকার কালে এই সকল (আধুনিক) শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন "কুমার্য্ৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেৎ তুল্যাম্। (সপ্তদশ অধ্যায়।)"

কন্যা ঋতুমতী হইয়া পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে বিবাহ করিলে স্বামী স্ত্রী কাহারও দোষ হয় না। ঋতুমতী কন্যা বর্ষত্রয় অপেক্ষা করিয়া পিতা মাতার অনভিপ্রায়ে স্বয়ং স্বামী বরণ করিলে বরকন্যা কেহই দোষভাগী হয় না। মহর্ষি মনু ও বশিষ্ঠ রজোদর্শনের ৩ বৎসর পরে কন্যাকে স্বয়ম্বরা ক্ষমতা দিয়াছেন।

মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

ঋতুত্রয়ং উপাসীব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্।
ঋতুত্রয়ে অতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥ ২৪।৪০

কন্যা ঋতুত্রয় অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং স্বামী বরণ করিবে। কারণ ঋতুত্রয় অতীত হইলে কন্যার আত্মপ্রভাব (majority) জন্মে। এইরূপ স্বয়ং স্বামী বরণ করিলে বর কন্যা কেহই দোষভাগী হয় না।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;—

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যাম্ ঋতাবৃতৌ
গম্যত্বাভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরং॥ ১৬৪

কন্যা ঋতুমতী হইয়া অনঢ়া থাকিলে কন্যাদাতা প্রতিঋতুতে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েন। কন্যাদাতা না থাকিলে কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করিবে।

কন্যার স্বয়ম্বর ক্ষমতা এখানে খর্ব্ব হইয়া আসিল। বশিষ্ঠ ও মনু বর্ষত্রয় এবং বিষ্ণু ঋতুত্রয় অতিক্রান্ত হইলে কন্যাকে স্বয়ম্বর ক্ষমতা দিয়াছেন। যদি দাতার অভাব হয়, তবেই যাজ্ঞবল্ক্য মতে কন্যা স্বয়ম্বরা হইতে পারে। কিন্তু স্বয়ম্বর বিবাহে বিবাহিত বর ও কন্যা কেহই দোষভাগী নহে।

কোন কোন আধুনিক শাস্ত্রকার শুধু পিতা মাতাকে ভ্রূণহত্যা ও নরক গমন ভয় প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হয়েন না। কন্যা বৃষলী বা শূদ্রা বলিয়া গালি দিয়াছেন। জাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ কুলীন মহাশয়েরা এই সকল অভিনব শাস্ত্র বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন

* ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কন্যার স্বয়ম্বর ক্ষমতা জন্মেনা।

না! কুলীন কন্যাদের মধ্যে শত শত "বৃষলী" রহিয়াছে।

মহর্ষি যম স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ;—

যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ
অসংভাষ্যোহপাঙক্তেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥ ২৪

যেই মদমোহিত ব্রাহ্মণ ঋতুমতী কন্যা বিবাহ করিবে, সে শূদ্রা বিবাহ করিল বলিয়া জানিবে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিবে না, তাহার সঙ্গে এক পঙক্তিতে আহার করিবে না।

মহর্ষি পরাশরের বিধিও তদনুরূপ ;—

যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোহজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহপাঙক্তেয়ঃ সবিপ্রোবৃষলীপতিঃ॥ ৭।৯

যেই অজ্ঞান মোহিত ব্রাহ্মণ ঋতুমতী কন্যা বিবাহ করে, সে শূদ্রার স্বামী, সে অসম্ভাষ্য ও অপাঙক্তেয়। *

মহর্ষি যম বলেন, ঋতুর প্রাক্‌কালে কন্যা দান করিবে। এমনও ঘটিয়াছে যে, বিবাহ সময়ে কন্যা ঋতুমতী হইয়াছে।

মহর্ষি আপস্তম্ব নিয়ম করিয়াছেন—

বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতেতথা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যা সংস্কারস্ত কথং ভবেৎ॥
স্নাপয়িত্বা তদা কন্যাং অন্যৈর্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম।
পুনঃ প্রত্যাহুতিংহুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ৭।৯, ১০

প্রশ্ন এই, বিবাহ যজ্ঞ বিতত হইয়া সংস্কার হইবার সময় যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে কি প্রকারে সংস্কার হইবে?

উত্তর। কন্যাকে তখন স্নান করাইয়া ও অন্য কাপড় পরাইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাহুতি করিয়া বাকী যে সকল কর্ম্ম থাকে, তাহা শেষ করিবে।

প্রথমতঃ কথা হইল যে, রজোদর্শনের তিন বৎসর মধ্যে কন্যা সম্প্রদান সময়, যদি উপযুক্ত বর মিলে। উপযুক্ত বর মিলিলে ইহার পূর্ব্বেও কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারে, উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যা চিরকাল পিতৃগৃহে রহিবেক। আর রজোদর্শনের তিন বৎসর পর ঋতুমতী কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করিতে পারে। স্বয়ংবর বিবাহ প্রশস্ত প্রথা, তদ্দারা বর কন্যা কেহই দোষ ভাগী হয় না। কিন্তু উপযুক্ত বর সত্বেও কন্যা-দাতা সকামা কন্যা দান না করিলে দোষী হইবে; যদি উপযুক্ত বর না মিলে, তবে কন্যাদাতার কোন দোষ নাই। মহর্ষি মনু ও বশিষ্ঠ এই প্রশস্ত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তী মহর্ষিদের মত অল্পে অল্পে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। গুণহীন হউক, সবর্ণ বর হইলেই উপযুক্ত বর হইল, এই যেন তাঁহাদের বিধি। আর রজোদর্শনের পূর্ব্বে যে প্রকারে হউক, কন্যা সম্প্রদান করিতেই হইবে। না করিলে পিতা মাতা ভ্রূণহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবেন। তবে দুই এক ঋষি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে যদি কন্যা ঋতুমতী হয়, তবে দোষ নাই। অনেক দিন স্বয়ংবর বিধি প্রচলিত রহিল। আধুনিক ঋষিরা নিয়ম করিলেন, সে কি কথা? ঋতুমতী কন্যাকে সম্প্রদান না করিয়া কন্যা-দাতার ভ্রূণহত্যাপরাধ হইবে, আর ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করিয়া বর সুখে কাল কাটাইবে? তাহা কখনই হইবে না, যে ব্যক্তি ঋতুমতী

* "পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন, ৬, ৭, ৮ ও ৯ শ্লোক স্বার্থ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের রচিত। প্রাচীন কালের বিবাহ প্রথা পর্য্যালোচনা করিলে এই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।' বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রকাশিত পরাশর-সংহিতা, ৪৫ পৃষ্ঠা।

কন্যা বিবাহ করিবে, সে অসম্ভাষ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়, আর ঋতুমতী কন্যা—

সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদূষতি।

বিষ্ণুসংহিতা। ২৪।৪১ *

ঋতুমতী কন্যা বৃষলী অর্থাৎ শূদ্রা স্বরূপ, তাহাকে হরণ করিলে কোন দোষ হয় না।

৪। স্ত্রীগমন।

ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন "বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী গৃহ কর্ম্মনিচৈন্দ্রিয়ে" ঋতুকালের রজঃ নিবৃত্ত হইলে (পঞ্চম দিবস হইতে) স্ত্রীলোক গৃহকার্য্য ও ঐন্দ্রিয় কর্ম্মের উপযুক্তা হয়।

ঋষি আপস্তম্বেরও এই বিধি। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ পর্ব্ববর্জ্জং স্বদারে বা। ১২ অধ্যায়।" পর্ব্ব-বর্জ্জে ঋতুকালে স্বদার গমন করিবে।

মহর্ষি গৌতম বলেন, "ঋতাবুপেয়াৎ সর্ব্বত্র বা প্রতিষিদ্ধ বর্জ্জন। ৫ অধ্যায়।" সর্ব্বত্র স্ত্রীর ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, কিন্তু প্রতিষিদ্ধ দিনে নহে। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বত্র 'ঋতৌ' শব্দের বিশেষণ, সর্ব্বত্র ঋতৌ পদের অর্থ 'প্রতি ঋতুতে'। যদি ইহা প্রকৃত অর্থ হয়, তবে মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত এই বিরোধের সূত্রপাত। কিন্তু 'সর্ব্বত্র' সকল অবস্থায় "ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না," এই অর্থ প্রকৃত অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ;—

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদার নিরতঃ সদা।

পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥৩।৪৫

স্বদার-নিরত ব্যক্তি সদা (পুত্র কামনায়) ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে। আর রতি কামনায় পর্ব্ব দিন ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীগমন করিবে।

মূলে "পুত্র কামনায়" নাই। কিন্তু পর্ব্ব বর্জ্জ দিনে রতি কামনায় স্ত্রীগমন হইতে ঋতুকালে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন অনুমান করা যাইতেছে।

'ঋতু কালাভিগামী স্যাৎ'—এই পদের অর্থ কি? প্রত্যেক ঋতুতে স্ত্রীগমন করিবে, অথবা যে কোন ঋতুকালে হউক পুত্র কামনায় ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, না ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন করিবে না? মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের টীকাকার অর্থসৌকর্য্যার্থে একটী অতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিয়া 'ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ' বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক ব্যবস্থা "সমে যজেত" অর্থাৎ সমদেশে যাগ করিবে। সমদেশ তো অনেক আছে। তবে কি প্রত্যেক সম-ভূমিতে যাগ করিতে হইবে? না, যে সমভূমি সর্ব্বপ্রথমে চক্ষুগোচর হয়, সেই সমভূমিতেই যাগ করিতে হইবে? না, যাগ করিবার সময় অতিক্রান্ত না হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল

---

* কোন কুলীনবিদ্বেষী চণ্ডাল বিষ্ণুসংহিতায় এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবে। বঙ্গোদেশানব ঋতুত্রয় পরে কন্যাকে স্বয়ং স্বামিবরণ ক্ষমতা দিয়া মহর্ষি বিষ্ণু কি বলিবেন, রজস্বলা কন্যা হরণ করিলে দোষ হয় না? যদি ইংরেজ রাজত্ব না থাকিত, উদ্ধৃত শ্লোক শাস্ত্র হইলে, বাঙ্গালা দেশের রজস্বলা কুলীন কন্যাদের দশা কি হইত? আর মহীশূর, বরদা, রাজপুতানা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যে রজস্বলা কন্যা হরণ করিলে কি শাস্তি হয় না? ইংরেজদের আসিবার অনেক পূর্ব্বে দেবীবর ঘটকের মেল বন্ধন হেতু কুলীন কন্যাদের রজস্বলা হইয়া বিবাহ হইত। কোন ব্যক্তি কি রজস্বলা কন্যাকে হরণ করিয়া বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছে?

"সম্মতির আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদে যাঁহারা প্রবৃত্ত, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কুলীন ব্রাহ্মণ। শত সহস্র রজস্বলা অবিবাহিতা কন্যা যাঁহাদের গৃহে, তাঁহাদের পক্ষে নীরব থাকা কি ভাল নয়।" ন, স।

সমদেশ বহিয়াছে, তাহার যে কোনটী হউক, শাস্ত্রকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে বাছিয়া লইবে? কিন্তু যাগ করিতে হইলে সমভূমি ভিন্ন অসমভূমিতে যাগ করিতে নিষেধ। ঋতু কালে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ঋতু সময় দেখা যায়। এই পঞ্চবিংশতি বর্ষে ৩০০ তিন শত বার ঋতুকাল উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিবারে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন করিবে, এইরূপ যদি মনুর বিধির অর্থ হয়, তবে, যে অসংখ্য সমদেশ রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক স্থানে যজ্ঞকারীর যাগ করা উচিত। যদি প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রীগমন হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম না হয়, তবে প্রথম ঋতু কালে অবশ্য স্ত্রীগমন করিবার যে আধুনিক দেশাচার রহিয়াছে, তাহাও শাস্ত্রানুসারে অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য নহে। স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনে স্ত্রীগমন করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কেহ পাতকী হয় না, আবার স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনে স্ত্রীগমন না করিলেও কেহ পাতকী হয় না। ২০০ কি ৩০০ বার স্ত্রীর ঋতুকাল উপস্থিত হয়। পুত্রকামী ব্যক্তি তাহার যে কোন সময়ে স্ত্রীগমন করিতে পারেন, ইহাই শাস্ত্রের বিধি। "ঋতু কালাভিগামীস্যাৎ স্বদার নিরত সদা।" সদা অর্থাৎ প্রথম রজোদর্শন হইতে শেষ রজোদর্শন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পুত্রকামনার যে সময়কে শাস্ত্রকার "ঋতুকাল" নাম করিয়াছেন, সেই সময়ে স্ত্রীগমন করিবে। সেই সময় পরিত্যাগ করিয়া অন্য সময়ে স্ত্রীগমন করিলে রতিকামনায় স্ত্রীগমন হইল, তাহা মনে করিতে হইবে। তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মচর্য্য * ব্রতের পুণ্যসঞ্চয় হয় না।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥ ৩। ৪৬

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতু ষোড়শ রাত্রি, তন্মধ্যে অশুচি চারি রাত্রি অন্তর্গত।

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥ ৩।৪৭।

আদ্য চারি রাত্রি, একাদশী রাত্রি ও ত্রয়োদশী রাত্রি, এই ছয় রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ রাত্রি স্ত্রীগমনে প্রশস্ত।

এই স্থানে "সাম যজেত" স্মরণ রাখিবে। এই দশ রাত্রির প্রতি রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করিতে হইবে, না করিলে দোষ হয়, এমন কথা নয়। তাহার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্ত্রিয়ম্॥ ৩। ৪৮

যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্রসন্তান এবং অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে কন্যা সন্তান জন্মে। সুতরাং পুত্রার্থী ব্যক্তি যুগ্মরাত্রিতেই ঋতু কালে স্ত্রীগমন করিবে। পুত্রার্থীর পক্ষে যুগ্মরাত্রি ভিন্ন অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন অনিয়ম বলিয়া সিদ্ধ হইল। ঋতুকালের প্রত্যেক যুগ্ম রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করিবে, এমন কথা নয়।

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ইন্দ্রিয় সংযমের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া পশুত্ব লাভের জন্য নহে। তাহা বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করাতেই মনু যে বিধি করিয়াছেন, তাহা শুনুন।

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ ৩। ৫০।

নিন্দিত (ষট্) রাত্রি, এবং অন্য অষ্ট রাত্রি এই রূপ চতুর্দ্দশ রাত্র পরিত্যাগ করিয়া ঋতুকালে অবশিষ্ট দুই রাত্রির অধিক যে ব্যক্তি স্ত্রীগমন না করেন, তিনি যেখানে সেখানে থাকুন, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও তিনি ব্রহ্মচারী। আর দেখুন, যদি এই দুই রাত্রিতে অমাবস্যা, অষ্টমী, পৌর্ণমাসী ও চতুর্দ্দশী তিথি হয়, তবে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

অমাবাস্যামষ্টমীঞ্চ পৌর্ণমাসীং চতুর্দ্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যমপ্যৃতৌ স্নাতকো দ্বিজঃ॥ ৪। ১২৮

---

* নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচর্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ মনু ৩।৫০।

"স্নাতক, গৃহস্থ, দ্বিজ (হিন্দু) স্ত্রীর ঋতুকালে অমাবস্যা অষ্টমী, পূর্ণিমা, ও চতুর্দ্দশী এই কয়েক তিথিতে ইন্দ্রিয় সংযম করিবেন।" অবজস্থা-গমনকারীরা বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মটা শুধু কামরিপু সেবার জন্য, অবজস্থলা অবস্থায়ও স্ত্রীকে নিষ্কৃতি দিবে না, স্ত্রীর প্রথম ঋতুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ঋতুকাল যেন স্ত্রীগমনে বাদ না যায়, শুচি অশুচি যেন বিচার করা না হয়, যুগ্মাযুগ্ম রাত্রি যেন মনে না পড়ে, ইন্দ্রিয় সংযম করিবে, এই বিধি যেন গৃহস্থের জন্য শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। তাহাদের মতে শুধু ইন্দ্রিয় সেবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র। কিন্তু শুনুন, মনু কি বলিতেছেন,—

যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ। ৯। ১৭

যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃঋণ হইতে মুক্তি ও মোক্ষলাভের অনন্ত উপায়, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মজ পুত্র। পণ্ডিতেরা অপর পুত্রদিগকে "কামজ" পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ বর্ষ হইতে অন্ততঃ চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ঋতু হয়। ২৫ বর্ষে ৩০০ বার ঋতুকাল উপস্থিত হয়। এই ৩০০ ঋতুকালে ৩০০০ পর্য্যন্ত রাত্রি। তন্মধ্যে ১৫০০ যুগ্ম রাত্রি। পিতৃঋণ পরিশোধ ও মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ একটী মাত্র ঔরস পুত্র জন্মিবার আবশ্যক। ঔরস পুত্র না হইলেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ইন্দ্রিয়-সংযমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি আমাদের এই অধোগতি হইল যে, অবজস্থা অবস্থায়ই দুহিতাকে জামাতার পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পাঠাইলে সমাজে নিন্দার ভাগী হইব? পুত্রকামী না হইয়া স্ত্রীগমন করিবে না; ঋতুকাল ভিন্ন অপর সময়ে স্ত্রীগমন করিবে না, স্বদার অতিক্রম করিবে না; কোনও ঋতুকালে অর্থাৎ কোনও মাসে দুই রাত্রির অধিক স্ত্রীগমন করিবে না; মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে সংলোকের পক্ষে এই ব্যবস্থা। আজ সেই ধর্ম্ম বিকৃত করিয়া আমরা সমাজে কি পশ্বাচারই প্রচলিত করিয়াছি। ঋতুমতী ও অনৃতুমতী বিচার করিবে না, কোনও ঋতুকাল পরিত্যাগ করিবে না, কোনও রাত্রি পরিত্যাগ করিবে না, স্ত্রীর রোগ, শোক, শারীরিক মানসিক দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবে না। একটা সামান্য মণ্ড বা শূকরের যে বিচার আছে, অনেক মহাত্মা নরপশুর সেই বিচার নাই, আবার এই মহাশয় ব্যক্তিরাই নির্লজ্জ ভাবে বলিয়া থাকেন, মহর্ষি মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই পাশব কাণ্ডের নিয়ম বিধি রহিয়াছে। হা ধর্ম্ম!!

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

ফুলরেণু।

প্রেতযোনি।

পাঁচটী বছর আজ—দীপ্ত দিবালোকে
মুখে মেখে দেখিয়াছি—কভু স্বপ্ন নয়!
শারদ সন্ধ্যার শোভা উষার আলোকে
দেখেছি সে দেবতার নব অভ্যুদয়!
পাঁচটী বছর আজ—আজো দেখি তারে
অবিকৃত সেই মূর্ত্তি সেই রূপ রাশি,
অধর দু'খানি ঢেউ লোহিত সাগরে,
সুধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভাসি!
কিন্তু সে কেন যে আজ কাছে নাহি আসে,
একি তবে সে কি নহে আর কোন্ জন?
অথবা "আরেক আমি" দেখিয়া তরাসে,
সবলা সভয়ে বুঝি করে পলায়ন?
কি জানি কেমন মনে লাগিছে সন্দেহ,
আমরা কি আগেকার 'প্রেতযোনি' কেহ?

পত্র।

নেও পত্র ফিরে নেও নাহি চাহি আর,
অগ্নিময় উপেক্ষায় পূর্ণ প্রতি কথা,
পদাঘাতে করিয়াছ প্রেম প্রত্যাহার,
ফিরে নেও ফিরে নেও দগ্ধ আত্মীয়তা!

স’রে যাই—চলে যা’ই দূর পরবাসে,
আর না করিব তব দৃষ্টি কলুষিত,
আর না করিব বায়ু বিষাক্ত নিশ্বাসে,
অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী পাপী কদাচিৎ!
জীবন আমার চির-দগ্ধ চিতাভূমি,

আমার সম্বল আহা চির অশ্রুজল,
আবার দু’ফোটা অশ্রু বাড়াইলে তুমি,
ঝরিবে যাবৎ বাঁচি—নিত্য অবিরল!
বেঁচে থাক, সুখে থাক—এই শেষ কথা,
ফিরে নেও, ফিরে নেও দগ্ধ আত্মীয়তা!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। প্রসূতি—শ্রীরাসমোহন দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী দ্বারা প্রকাশিত। বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ধাত্রীশিক্ষা বঙ্গদেশের আপামর সাধারণের মহা উপকার সাধন করিয়াছে। রাসমোহন বাবুর “প্রসূতিও” এই শ্রেণীর গ্রন্থ। প্রসূতিতে সন্তান পালন, রোগনির্ণয়, ঔষধ ও পথ্যের নিয়ম এবং প্রসূতির অবশ্য পালনীয় বিধি ব্যবস্থা সরল ভাষায় অতি পরিষ্কার রূপে লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক দ্বারা ডাক্তারের সাহায্য ভিন্নও প্রসূতি এবং সন্তান চিকিৎসিত হইতে পারে। পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

২। অশোকা—(উপন্যাস) শ্রীমতী “বনলতা,” “নীহারিকা” ও “আর্য্যাবর্ত্ত,” রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকর্ত্রী নব্যভারত পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। ইনি এক জন ভাল কবি, কিন্তু ভাল কবি হইলেই যে ভাল উপন্যাস লিখিতে পারেন, গ্রন্থ পাঠে সে পরিচয় পাওয়া গেল না।

৩। হৃদয়োচ্ছ্বাস—শ্রীকালীহর বসু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কবিতায় গ্রন্থ খানি পূর্ণ। লেখক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন “এই পুস্তকে ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই।” বাস্তবিক তাই বটে, পুস্তক পাঠের সময় গদ্য কি পদ্য পড়িতেছি, ঠিক করা যায় না। গ্রন্থকারের বোধ হয় এই প্রথম উদ্যম;—এরূপ নব উদ্যমপ্রসূত ফল লোকচক্ষুর গোচরে না আনিলেই ভাল হইত। কবিতাগুলির মধ্যে “ভ্রাতৃবধূর প্রতি” কবিতাটির ভাব ভাল হইয়াছে। “সীতা হরণে লক্ষ্মণের খেদোক্তি” লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার কেমন একটা বিকৃত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

৪। বক্তৃতা—কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন পরিব্রাজকের বক্তৃতার সার সংগ্রহ। শ্রীভূদেব কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বক্তা। তাঁহার বক্তৃতাগুলি এরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান পুস্তকে “তৃষ্ণার জল” এবং “অন্ধের যষ্টি” নামক যে দুইটী বক্তৃতার সারাংশ লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সহিত স্থানে স্থানে অমিল থাকা সত্ত্বেও একথা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, হিন্দু কি মুসলমান,

ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান, সকল শ্রেণীর ধর্ম্মার্থীর নিকটই এ পুস্তক আদরনীয় হইবে। তর্কাস্ত্রে জগৎ জিত হয় না, ভাবময় ভক্তি কথায় সকলেরই মন গলিয়া যায়। এ পুস্তকে যুক্তি আছে, ভাষার লালিত্য আছে এবং ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাস আছে।

৫। পুনর্জন্ম আছে কি না? শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন প্রণীত। কুঞ্জ বাবু অতি সংক্ষেপে এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় যুক্তিযুক্ত কথা লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, বেশ ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পুস্তকে যাহা আশা করা যায়, এ পুস্তকে তাহা আছে।

৬। রমণী—সমর্থকোয় প্রেস হইতে প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই, তিনি যিনিই হউন, কবিতা লিখিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে। পুস্তকের নামটি "রমণী" না দিয়া "প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের উক্তি" হইলেই ভাল হইত।

৭। বন-প্রসূন—শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ⁄০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দুটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ দুটির ভাব মন্দ নয়; কিন্তু ভাষাতে ছাত্র-সুলভ ভাবের গন্ধ পাওয়া যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অতি বিনীত ও শান্তভাবে লেখা কর্ত্তব্য।

৮। শৈলজা—বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। এ খানি সামাজিক নাটক। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে বিবাহ-পণ দ্বারা কি কুফল ফলিতেছে, এই নাটকে তাহা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বৈচিত্র্য রক্ষাই নাটককারের কবিত্ব, এ নাটক-লেখক তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শৈলজাকে দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয়, চক্ষে জল আইসে, আবার অর্থ পিশাচ কুলাভিমানী চণ্ডাল প্রকৃতির রাম সাধনকে দেখিলেই অবিমিশ্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সামান্য সামান্য দোষ থাকিলেও চরিত্র-অঙ্কন কার্য্যে লেখকের খুব পটুতা আছে।

৯। শিশুপালন—ডাক্তার বিনোদ-বিহারী রায়কর্ত্তৃক প্রণীত, বঙ্গবাসী বিনোদ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ।⁄০ আনা। আয়ুর্ব্বেদ মতে কিরূপে শিশুপালন করিতে হয়, এ গ্রন্থে তাহা সংক্ষেপে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১০। সত্য-সরলা—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। এখানি নাটক; কিন্তু প্রকৃত নাটকত্ব এ গ্রন্থে দুর্লভ। এ পুস্তক নভেলের আকারে লিখিত হইলেই সুবুদ্ধির কাজ হইত।

১১। কণ্ঠহার—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন প্রণীত। মূল্য ১৲। গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, এ গ্রন্থ তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল। প্রথম চেষ্টা বলিয়া, এ পুস্তকের কঠোর সমালোচনার প্রয়োজন না থাকিলেও, এ কথা, বলা আবশ্যক যে, এ উপন্যাস পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। ভাষা ভাবের দাসী। ভাবশূন্য ভাষা ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজের মত কার্য্যকরী নহে। এ পুস্তকে ভাষা আছে, ভাব নাই; বীরত্বের কথা আছে, বীরত্ব নাই, অনেকগুলি চিত্র আছে, বৈচিত্র্য নাই। তার উপর স্থানে স্থানে অনুকরণ দোষও ঘটিয়াছে।

১২। জন্মএয়োস্ত্রী—শ্রীসুরনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি নাটক। কুরুচির ভাণ্ডার এ পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই।

১৩। ভগ্নতরী।—এম্ এম্ মজুমদার কর্ত্তৃক ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। গ্রন্থকারের ইহা প্রথম উদ্যম, সুতরাং নাম দেন নাই। কবিতার বিষয়গুলি ভালই নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং সুরুচিসম্মত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ ও সাধু। কালে ভাল লেখক হইলে, তাঁহার লেখনী অনেক সুফল প্রসব করিবে।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহার্য্য, পরিধেয় ও গৃহোপযোগী দ্রব্য।

কৃষির মধ্যে যব ও গোধূমের প্রচুর চাস হইত এবং এই গুলিই প্রধান আহার্য্য-বস্তু ছিল। যে নামে শস্যগুলির পরিচয় ঋক্-বেদে পাওয়া যায়, আধুনিক সংস্কৃতে তাহা ভিন্নার্থে প্রয়োজিত হয়। সুতরাং তৎ-কালীন শস্যের নির্ণয় করা একটু কঠিন ব্যাপার। আধুনিক সংস্কৃতে যব শব্দে শুধু যব বুঝায়; পুরাকালে যব গোধূমাদি সমস্ত খাদ্য (Grains) বুঝাইত। ধান্য শব্দে ঋগ্বেদে ভাজা যব হইতে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ বুঝাইত। দেবতাদিগকে ইহা নৈবিদ্য দেওয়া হইত। • ঋগ্বেদে ব্রীহির (চাউলের) উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদে যবাদি হইতে প্রস্তুত পক্তি, পুরোডাশ, অপূপ ও করম্ভ প্রভৃতি নানা প্রকার পিষ্টকের উল্লেখ আছে। এই সক-লই দেবতাদিগকে নিবেদন করা হইত। "হে ইন্দ্র! তুমি ভৃষ্ট যবযুক্ত, দধিমিশ্রিত সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উকৃথবিশিষ্ট আমাদের (সোম) প্রাতঃ সেবনে গ্রহণ কর। হে ইন্দ্র, পক্ক পুরোডাশ গ্রহণ কর।"

পঞ্জাবের আর্য্যেরা যে সেই প্রাচীন সময়ে মাংস ভোজন ও দেবতা-দিগকে ভোজনার্থ মাংস প্রদান করি-তেন, তাহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। গাভী, মহিষ ও বলীবর্দ্দাদির মাংস রন্ধনের প্রণালী ও যজ্ঞে প্রদান করিবার কথা অনেক স্থানে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে আছে "১২। হে ইন্দ্র, তুমি এই বৃত্রকেই বজ্রপ্রহার কর, গরুর ন্যায় বৃত্রের শরীরের সন্ধিগুলি তির্য্যক্ অবস্থিত বজ্র দ্বারা কর্ত্তন কর।" দ্বিতীয় মণ্ডলের সপ্তমসূক্তে রহিয়াছে, "৫। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের। তুমি বন্ধ্যাগাভী ও বৃষ ও গর্ভিনা গাভী সকলের দ্বারা আহুত হইয়াছ।" পুনশ্চ পঞ্চম মণ্ডলের ২৯ সূক্তে আছে; "৭। ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি স্বীয় মিত্র ইন্দ্রের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সত্বর তিন শত মহিষ পাক করিলেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি তিন শত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলে।" পুনরপি ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে আছে "১১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন।" এই মণ্ডলের ১৬ সূক্তে আছে, "৪৭। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে হৃদয় দ্বারা সংস্কৃত ঋক্ রূপ হব্য প্রদান করিতেছি। কাশালী বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য হউক।" ২৮ সূক্তে আছে "৪। রেণু সকলের উত্থা-পনকারী সামরিক অশ্ব * * যেন যজ্ঞে বিশসনাদি (বলিদানাদি) সংস্কার প্রাপ্ত না হয়।" অপরন্তু দশম মণ্ডলের ২৭ সূক্তে আছে "২। হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক করি।" ২৮ সূক্তে আছে "৩। হে ইন্দ্র! * * * তাহারা বৃষভ পাক করে; তুমি তাহা ভোজন কর।"

দশম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তে গোহত্যা স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। "১৪। যেরূপ গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয়, তদ্রূপ তোমার এই অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে।" গোহত্যা প্রথা বিশেষ রূপ প্রচলিত না থাকিলে তজ্জন্য ভিন্ন-স্থান নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভব নহে। ৫১ সূক্তে আছে "১৪। যে অগ্নির উপর বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্ব-বিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে, * * * সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিতেছি।" গোবধ, অশ্ববধ ও মেষবধের প্রমাণ রহিয়াছে। অশ্বভোজনের উল্লেখ অতি কদাচিত পাওয়া যায়। বোধ হয়, আর্য্যহিন্দুরা মধ্য এসিয়া হইতে এই রীতি লইয়া পঞ্জাবে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে আসিলে তাহা এক রকম উঠিয়া যায়। অপ্রাচীনতম সময়ে দিগ্বিজয় করিয়া সম্রাট্ মহারাজ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতে হইলে অশ্ববধ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। প্রাচীন সময়ে যাগ পূর্ব্বক অশ্বমাংস ভোজনের যে নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইয়াই যে অবশেষে প্রতাপশালী নৃপতি-বর্গের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপ্রাচীন সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে যে আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া-কাণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৈদিকযুগে তাহার কিছুই প্রচলিত ছিল না।

বৈদিক সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ যে প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইতে, ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে ১৬২ সূক্তে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ হইলেও নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"১। যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত দ্রুতগতি অশ্বের বীরকর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি। অতএব মিত্র বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ যেন আমাদিগের নিন্দা না করেন।

"২। সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বের সম্মুখে (ঋত্বিকগণ) উৎসর্গার্থ ছাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিবিধ বর্ণ ছাগ শব্দ করতঃ তদভিমুখে গমন করিতেছে, উহা ইন্দ্র ও পূষার প্রিয় অন্ন হউক।

"৩। সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ পূষারই ভাগে পড়ে, উহাকে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত সম্মুখে আনা হইতেছে। অতএব দেবতাগণের মহাভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সহিত এই অজ হইতে সুখাদ্য পুরোডাশ প্রস্তুত করুন্।

"৪। যখন ঋত্বিকগণ দেবতাগণের লভ্য হবির্যোগ্য অশ্বকে প্রতি ঋতুতে তিন বার অগ্নির নিকট লইয়া যায়, সেই সময় পূষার প্রথম ভাগের ছাগ দেবতাগণকে যজ্ঞের কথা জ্ঞাপন করিয়া অগ্রে গমন করে।

"৬। যাহারা যূপ বৃক্ষচ্ছেদন করে, যাহারা যূপবৃক্ষ বহন করে, যাহারা অশ্বযূপের জন্য চষাল (যূপাগ্রভাগ) প্রস্তুত করে, যাহারা অশ্বের জন্য পাত্র সংগ্রহ করে, আমাদের সঙ্কল্পই যেন তাহাদের সঙ্কল্প হয়।

"৭। আমাদের মনোরথ আপনিই সিদ্ধ হউক, মনোহর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব দেবতাগণের আশা পূরণার্থ আগমন করুক। দেবতাগণের পুষ্টির জন্য আমরা উহাকে উত্তমরূপ বন্ধন করিব, মেধাবী ঋত্বিকগণ আনন্দিত হউন।

"৮। যে রজ্জু দ্বারা অশ্বের গ্রীবা বদ্ধ হয়, যাহার দ্বারা উহার পদ বদ্ধ হয়, যে রজ্জু উহার মস্তকে বদ্ধ থাকে, সেই রজ্জ সকল এবং উহার মুখে যে ঘাস নিক্ষেপ কর হয়, সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক।

"৯। অশ্বের অপক্ক মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদন কালে বা পরিষ্কার করিবার সময় ছেদন ও পরিষ্কার সাধন-অস্ত্রে যাহা লিপ্ত হয়, ছেদকের হস্ত দ্বয়ে এবং নখে যাহা লিপ্ত থাকে, সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক।

"১০। উদরের যে অজীর্ণ তৃণ বাহির হইয়া যায়, অপক্ক মাংসের যে লেশ গাত্র থাকে, ছেদন কর্ত্তা তাহা নির্দ্দোষ করুন, এবং পবিত্র মাংস দেবতাগণের উপযোগী করিয়া পাক করুন।

"১১। হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক করিবার সময় তোমার গাত্র হইতে যে রস বাহির হয়, এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে, তাহা যেন ভূমিতে পড়িয়া না থাকে, এবং তৃণের সহিত মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হইয়াছেন, সমস্তই তাঁহাদিগকে প্রদান করা হউক।

"১২। যাহারা চারিদিক হইতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যাহারা বলে উহার গন্ধ মনোহর হইয়াছে, এখন নামাও, এবং যাহারা মাংস ভিক্ষা জন্য অপেক্ষা করে, তাহাদিগের সঙ্কল্প আমাদিগেরই সঙ্কল্প হউক।

"১৩। যে কাষ্ঠ দণ্ড মাংস পাপ পরীক্ষার্থ ভাণ্ডে দেওয়া যায়, যে সকল পাত্রে রস (ঝোল) রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়, যে বেতস শাখা দ্বারা অশ্বের অবয়ব প্রথমে চিহ্নিত করা হয়, এবং যে ছুরিকা দ্বারা (পরে এই চিহ্ন অনুসারে অবয়ব কর্ত্তিত হয়) ইহারা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করিতেছে।

"১৪। যে স্থানে অশ্ব গমন করিয়াছিল, যেস্থানে উপবেশন করিয়াছিল, যেস্থানে লুণ্ঠন করিয়াছিল, যাহাদ্বারা উহার পদ বদ্ধ হইয়াছিল, যাহা সে পান করিয়াছিল, এবং যে ঘাস আহার করিয়াছিল, সে সমস্তই দেবতাগণের নিকট গমন করুক।

"১৫। হে অশ্বগণ, অগ্নি যেন তোমাকে শব্দ করাইতে না পারে, অত্যন্ত অগ্নি সংযোগে প্রতপ্ত সুগন্ধী ভাণ্ড যেন চলিত না হয়। (যজ্ঞের) জন্য অভিপ্রেত, (হোমের) জন্য আনীত সম্মুখে প্রদত্ত বষটকার দ্বারা শোভিত অশ্ব দেবগণ গ্রহণ করুন।

"১৬। অশ্বকে যে আচ্ছাদন-যোগ্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, উহাকে যে হিরণ্ময় আভরণ সকল প্রদান করা যায়, যদ্দ্বারা তাহার মস্তক ও পাদ বদ্ধ করা যায়, এই সকল বস্ত দেবতাগণের প্রিয়। ঋত্বিকগণ দেবগণকে এই সকল প্রদান করিতেছেন।

"১৬। হে অশ্ব! তুমি সবলে নাসাধ্বনি করতঃ গমনে বিরত হইতে কশাঘাত দ্বারা অথবা তোমার পার্শ্ব দেশে পদাঘাত দ্বারা যে ব্যথা উৎপন্ন হইয়াছিল, যজ্ঞে শ্রুক দ্বারা যে হব্য প্রদত্ত হয়, সেই রূপ মন্ত্র দ্বারা তোমার সেই সমস্ত ব্যথা আহুতি প্রদান্ করি।

"১৮। দেবতাগণের বন্ধু স্বরূপ অশ্বের বক্রভূত চতুস্ত্রিংশৎ পার্শ্বাস্থি ছেদনের জন্য স্বধিতি (খড়্গ) গমন করিতেছে। (হে অশ্ব-ছেদক!) এরূপ বুদ্ধি প্রকাশ কর যেন

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি ছিন্ন হইয়া না যায়; শব্দ করিয়া ও দেখিয়া দেখিয়া ছেদন কর।

"১৯। ঋতুই তেজঃপুঞ্জ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্ত্তা এবং দুইজন তাহাকে ধারণ করেন। হে অশ্ব! তোমার শরীরের যে অবয়ব সকল যথাকালে কর্ত্তন করি, তাহা পিণ্ডাকারে অগ্নিতে প্রদান করি।

"২০। হে অশ্ব! যখন তুমি দেবতাদের নিকট গমন কর, তখন তোমার প্রিয় দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না দেয়। স্বধিতি তোমার অঙ্গে যেন অধিক ক্ষণ না থাকে। মাংসলোলুপ ও অনভিজ্ঞ ছেদক অস্ত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গুলি অতিক্রম করিয়া তোমার গাত্র যেন বৃথা ছিন্ন না করে।

"২১। হে অশ্ব! তুমি মরিতেছ না; অথবা লোকে তোমায় হিংসা করিতেছে না; তুমি উত্তম পথে দেবতাগণের নিকট গমন করিতেছ। ইন্দ্রের হরি নামক অশ্বদ্বয়, এবং মরুৎগণের পৃষতীনামক বাহন দ্বয়, তোমার রথে যোজিত হইবে। অশ্বিদ্বয়ের বাহন রাসভের পরিবর্ত্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার রথে সংযুক্ত হইবে।

"২২। এই অশ্ব আমাদিগকে গো ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন প্রদান করুন; আমাদিগকে পুরুষ অপত্য প্রদান করুক; তেজস্বী অশ্ব আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত করুক। হবির্ভূত অশ্ব আমাদিগকে শারীরিক বল প্রদান করুক।"

বৈদিক সময়ে সোমরস ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য পান করা হইত না। প্রাচীন আর্য্যেরা সোমরসের ভক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষে সোম নামে, আর ইরাণে 'হওম' নামে ইহার স্তব পূর্য্যন্ত হইত, এবং ঋগ্বেদের একটী সমগ্র মণ্ডল এই সোমের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ভারতের তেজস্বী আর্য্যেরা ইরাণের শান্তিপ্রিয় আর্য্যদের অপেক্ষা এই মাদক সোমরসের বিশেষ আদর করিতেন, এবং ইরাণীয় জেন্দাভেস্তাতে ভারত-আর্য্যদের এই ঘৃণিত সোম-রসাসক্তির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সোমরসানুরক্তিই ভারত-আর্য্য ও ইরাণি আর্য্যের (দেব ও অসুরের) বিচ্ছেদের প্রধান কারণ।

যে প্রণালীতে সোমরস প্রস্তুত হইত, নবম মণ্ডলের ৬৬ সূক্তে এবং অপরাপর সূক্তে তাহার বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে। এস্থলে প্রথমোক্ত সূক্তের কতিপয় ঋকের অনুবাদ করিতেছি।

"২। হে সোম! তোমার যে দুইটী পত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল, তদ্দ্বারা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হইয়াছিল।

"৩। হে সোম! তোমার চতুর্দ্দিকে লতা অবস্থায় যে সকল পত্র বিদ্যমান, তদ্দ্বারা তুমি তাবৎ ঋতুতে সুশোভিত ছিলে।

"৭। হে সোম! তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে; তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে ধারারূপে ইন্দ্রিয়ের দিকে যাও এবং অক্ষয় আহার বিতরণ কর।

"৮। সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করিতে করিতে এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল, তাহারা কহিল যে, তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির যজ্ঞ স্থলে সকল কার্য্য স্মরণ করাইয়া দাও।

"৯। যখন তুমি শব্দ করিতে করিতে জলের সহিত মিশ্রিত হও, তখন কয়েকটী অঙ্গুলি একত্র হইয়া মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করিতে থাকে, তৎ-

কালে তোমার ফেণা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং মেষ লোম হইতে শব্দ উঠিতে থাকে।

"১০। হে সৎ কর্ম্মশালী ও বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ খাদ্য আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে।

"১১। কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে পুনঃ পুনঃ চালিত করিতে লাগিল।

"১২। সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়া গেল, যেমন নবপ্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে।

"১৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হও, তৎকালে জলপ্রবাহিত হইয়া বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে তোমার দিকে যাইয়া থাকে।

"২৯। এই যে সোমরস, ইনি গোচর্ম্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইনি আনন্দ লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন।"

সিদ্ধিসেবক মহাশয়েরা যে প্রণালীতে সিদ্ধি প্রস্তুত করেন, উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সোমরসও তদ্রূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া দুগ্ধের সহিত পীত হইত। ঋগ্বেদের কবিগণ সোমরসের মাহাত্ম্য ও গুণগান করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের তাদৃশ বর্ণনা হইতে অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। নবম মণ্ডলের ১০৮ মন্ত্রে আছে "৩। হে সোম! তোমার উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতাবংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক।" ১১০ মন্ত্রে আছে "৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদের পেয় বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।" পুনরপি ১১৩ মন্ত্রে আছে "৭। যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয়ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

নবম মণ্ডলে এইরূপ ঋক্ অনেক রহিয়াছে। কে ভাবিয়াছিল যে, ঋগ্বেদের এই সামান্য সোমরস বর্ণনা হইতে পৌরাণিক সমুদ্র মন্থন ও অমৃত উৎপত্তির উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়াছে? সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য; স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং অনেক সময় সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে ভাবময়ী কল্পনার সাহায্যে সমুদ্র হইতে অমৃত মন্থনরূপ পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র হইতে বোধ হয় যে, তৎকালে অনেক প্রকার শিল্পপ্রণালীর বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বস্ত্রবয়ন প্রথা অতি উত্তমরূপে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা তানাপোড়েন সাহায্যে কাপড় প্রস্তুত করিত। *

* দ্বিতীয় মণ্ডলের ২ সূক্তে আছে "৬। আমাদের সাধু কর্ম্মকারের চিরপ্রদায়ী (অগ্নিরূপ) ঊষাও নক্ত-বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় সাহায্যার্থ পরস্পর গমনাগমন করতঃ যজ্ঞের রূপ নির্ম্মাণার্থ পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্ত বয়ন করিতেছেন।" উক্তমণ্ডলের ৩৮ সূক্তে আছে "৪। বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্ব্বার আলোককে সম্যক্‌রূপে বেষ্টন করিতেছেন।"

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৯ সূক্তে "আমি তন্তু (তানা-সূত্র) অথবা ওতু (পড়্যানসূত্র) জানি না, কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে (বস্ত্র) বয়ন করে, তাহার কিছুই অবগত নহি।" যজ্ঞের তন্ত্র ও ওতু জানেন না বলিয়া ঋষি ভরদ্বাজ আক্ষেপ করিয়াছেন। ১০ মণ্ডলের ২৬ সূক্তে আছে "৬। পূষাদেবই * মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করেন; তিনিই বস্ত্র ধৌত করেন।"

বোধ হয়, সেই প্রাচীন সময়েও প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন নাপিত ছিল; এবং প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৪৪ ঋকে অরণ্য-দাহ করিয়া ভূমি পরিষ্কার করাকে কি এক অর্থে ভূমি-কামান বলিয়া বর্ণনা আছে। † সূত্রধরের ব্যবসায়ও প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক স্থানে রথ ও শকটের উল্লেখ রহিয়াছে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩সূক্তে আছে, "১৯। রথের খদির কাষ্ঠের সারকে দৃঢ় কর; রথের শিশপা কাষ্ঠকে দৃঢ় কর। হে দৃঢ় ও আমাদের দৃঢ়ীকৃত অক্ষ! দৃঢ় হও,এই রথ হইতে আমাদিগকে ফেলিয়া দিও না।" চতুর্থ মণ্ডলের ২।১৪ ঋকে রথের এবং ১৬ সূক্তের ২০ ঋকে ভৃগুগণ অর্থাৎ সূত্রধরগণের উল্লেখ আছে। স্বর্ণ, লৌহ, প্রভৃতি ধাতুরও প্রচলন ছিল। পঞ্চম মণ্ডলের নবমসূক্তে ৫ঋকে কর্ম্মকার-গণের ভস্ত্রাদি দ্বারা অগ্নিকে সংবর্দ্ধিত করিয়া অগ্নির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির বর্ণনা আছে, এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ৪ ঋকে স্বর্ণকারের ধাতু দ্রবীভূত করিবার বর্ণনা রহিয়াছে।

বৈদিক সময়ের স্বর্ণালঙ্কার, লৌহযন্ত্র এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনা হইতে তৎকালে কর্ম্মকার ও স্বর্ণকারাদির ব্যবসায়ের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভূয়োভূয়ঃ স্থলে এতাবৎ সম্বন্ধীয় বর্ণনা রহিয়াছে; কিন্তু আমরা যে কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে তৎকালীন শিল্পাদির আভাস পাওয়া যাইবে। প্রথম মণ্ডলের ১৪০ সূক্তের ১০ ঋকে বর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ আছে; দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩০।৪ ঋকে খৃগলাশব্দের ব্যবহার আছে; তাহার অর্থ তনুত্রাণ *। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৩।২ ঋকে 'পিশঙ্গদ্রাপি' উল্লেখ আছে; তাহার অর্থ হিরণ্ময় কবচ। আর উদাহরণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৪।৩ ঋকে সিপ্র শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে; ইহার অর্থ শিরস্ত্রাণ। † ৪র্থ মণ্ডলের ৩৪।৯ ঋকে অংসত্র নামে স্কন্ধকারী ঢাল বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চম মণ্ডলের ৫২।৬ ও ৫৪।১১ ঋকে ঋষ্টি নামক বল্লভ-অস্ত্রের বর্ণনা আছে। পঞ্চম মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে আছে "২। হে সুবুদ্ধিমরুৎগণ! তোমাদিগের বাশী ‡ ও ঋষ্টি ও উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ, তূণীর, শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও রথ আছে।" ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২৭।৬ ঋকে ত্রিংশৎবর্ম্মী যোদ্ধার, ৪৬।১১ ঋকে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্তবাণের এবং ৪৭।১০ ঋকে লৌহময় (খড়্গ) ধারার

---

* পূষা মেষপাল ও গোপালের দেবতা, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

† "৪। কেশবিশিষ্ট তিনজন (অগ্নি, আদিত্য ও বায়ু) সংবৎসরের মধ্যে যথাসময়ে ভূমি পরিদর্শন করেন। উহাদের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কামাইয়া দেন, একজন নিজ কর্ম্ম দ্বারা পরিদর্শন করেন; আর এক জনের রূপ দৃষ্ট হয় না, কেবল গতি দৃষ্ট হয়।

* সায়ন।

† আধুনিক সিরপা বা শিরোভূষণ এই সিপ্র হইতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

‡ বাশী অস্ত্রবিশেষ সূত্রধরের বাইশের ন্যায় যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রবিশেষ।

উল্লেখ দেখিতেছি। এই ৪৭ সূক্তের ২৬ ঋকে যুদ্ধোপযোগী রথের এবং ২৯ ঋকে যুদ্ধ-দুন্দুভি বর্ণনা আছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে যুদ্ধের সাজসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রের যে বর্ণনা রহিয়াছে, আমরা পরবর্ত্তী কোন অধ্যায়ে তাহার অনুবাদ করিয়া দিব।

চতুর্থ মণ্ডলের ২। ৮ ঋকে "হেম্যাবান অশ্ব" হইতে অশ্বের সুবর্ণ নির্ম্মিত সজ্জার ব্যবহার ছিল, তাহা জানিতে পারি। চতুর্থ মণ্ডলের ৩৭। ৪, পঞ্চম মণ্ডলের ১৯। ৩ এবং অন্যান্য অনেক স্থলে নিষ্ক নামক স্বর্ণময় কণ্ঠাভরণের উল্লেখ আছে। ৫ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৪ ঋকে মারুৎগণের দীপ্তির সহিত অঞ্জি, বাশী, স্রক্, রুক্ম (বক্ষস্ত্রাণ) ও খাদির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উক্ত মণ্ডলের ৫৪।১১ ঋকে পুনর্ব্বার "অংশে ঋষ্টি, পাদদেশে খাদি, বক্ষে রুক্ম এবং শিরে সিপ্রা" বা স্বর্ণ মুকুটের উল্লেখ দেখিতে পাই।

এই সকল উদ্ধৃত মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধাস্ত্র, সজ্জা ও আভরণাদির প্রস্তুত করণ শিল্পের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এতভিন্ন ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৮। ১৮ ঋকে দৃতি নামক চর্ম্মাধারের এবং পঞ্চম মণ্ডলের ৩০। ১৫ ঋকে অশ্বর নামক লৌহ-কলসের এবং অনেক স্থলে অয়োনির্ম্মিত পুরীর* উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ৪র্থ মণ্ডলের ৩০।২০ ঋকে এবং অন্যান্য মন্ত্রে শতসংখ্যক অশ্মময়ী (প্রস্তর নির্ম্মিতা) নগরীর কথা আছে।

যে সকল প্রস্তরময় ও পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রাচীন আর্য্যেরা স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তথাকার প্রস্তর হইতে অল্প পরিশ্রমে যে স্থায়ী গৃহাদি প্রস্তুত করিতে তাঁহারা অতি অল্প সময় মধ্যে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর গৃহাদি প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত করিতেন, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি। গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীর যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪১।৫ ঋকে এবং পঞ্চম মণ্ডলের ৬২। ৬ 'সহস্র স্তম্ভ' সৌধাদিরূপ গৃহের উল্লেখে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ে কোন প্রকার মূর্ত্তি বা প্রতিমা গঠন প্রণালী বা প্রস্তর লিখন প্রচলিত ছিল না, একথা নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধ যুগের বহুদিনের পূর্ব্বকার কোন প্রকার খোদিত প্রস্তর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। এবং ইউরোপের মিউজিয়ম সমূহে মিসর, বেবিলন, গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষের যে রাশীকৃত প্রস্তর লিখন ও প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও বৌদ্ধ যুগের বহুদিন পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন চিহ্ন নাই।

আমাদের গৃহে যে সকল পশু পক্ষ্যাদি গৃহপালিত হইতেছে, ঋগ্বেদের সময়ে তাহার সমস্তই গৃহে পোষিত হইত। অনেক মন্ত্রে তেজস্বী যুদ্ধাশ্বের বিবরণ রহিয়াছে।

বস্তুতঃ আদিম দাস জাতির সহিত যুদ্ধাদিতে অশ্বের এত প্রয়োজন হইয়া উঠিল এবং তাহার আদর এত বাড়িল যে, দধিক্রানামে শীঘ্রই অশ্ব-পূজা প্রবর্ত্তিত হইল। ৪র্থ মণ্ডলে ৩৮ সূক্তে আছে "৭। সেই অশ্ব সহনশীল এবং বলবান্, এবং সময়ে স্বশরীর দ্বারা কার্য্যসাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী শত্রু সেনামধ্যে বেগে গমন করেন! তিনি ধূলি উত্থিত করত ভ্রূদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন।

"৮। যুদ্ধাভিলাষীগণ দীপ্তিমান অশনির

* সপ্তম মণ্ডল ২। ৭ ১৫। ৯৫ এবং ৯৫।১

ন্যায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে! যখন তিনি চতুর্দ্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্ব্বার হইয়া উঠেন।

"১০। সূর্য্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জলদান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বলদ্বারা পঞ্চ কৃষ্টিকে বিস্তৃত করিয়াছেন। শতসহস্র দাতা বেগবান্ অশ্ব আমাদিগের স্তুতিবাক্য মধুর ফলের দ্বারা সংযোজিত করুন।"

চতুর্থ মণ্ডলের ৪। ১ ঋকে 'অমাত্যের সহিত গজ স্কন্ধারূঢ় রাজার উল্লেখ আছে। পালিত পশুর মধ্যে গাভী, ছাগ, মেষ, মহিষ এবং কুকুরের বর্ণনা আছে! কুকুর ঋকবেদের সময়ে ভার বহন করিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধবিগ্রহ।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাচীন আর্য্যেরা পঞ্জাবের আদিম নিবাসীদিগকে বহিস্কৃত করিয়া সিন্ধু ও তৎসন্নিহিত নদীসমূহের পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত উর্ব্বর ভূমি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু আদিমনিবাসীরা যে দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজ অধিকার ছাড়িয়া দিল, তাহা নহে। অনার্য্যেরা সমরক্ষেত্রে ও সম্মুখ যুদ্ধে হিন্দুরশৌর্য্য দ্বারা পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেও আর্য্যদের নবাধিকৃত গ্রাম ও উপনিবেশের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে ও গিরিকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগকে বিপাকে পাতন, গ্রামলুণ্ঠন ও তাহাদের গাভীচৌর্য্য প্রভৃতি যে কোন উপায়ে হউক উত্তেজিত করিত এবং সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিত। এ কথা বলা বাহুল্য যে,বিজেতারা বিজিত অনার্য্য জাতীয় সমূহকে একান্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণাচক্ষে দেখিতেন। খ্রীষ্টের সপ্তদশ শতাব্দীর পরে আমেরিকা দেশে বিজিত আদিম জাতিদিগের যে দশা, আর খ্রীষ্টের সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পঞ্জাবে বিজিত অনার্য্য জাতিদিগেরও সেই দশা ঘটিল। আধুনিক সময়ে আমেরিকায় ইউরোপীয় বিজেতাগণ সাহসী ও তেজস্বী আদিমজাতিদিগের নির্মূল করিয়াছেন, প্রাচীন পঞ্জাবে আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে তেমনি নির্ম্মূল করিলেন।

অনার্য্যের সহিত যুদ্ধবিরোধের কথা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে রহিয়াছে। তাহার কতিপয় মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "ইন্দ্র বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া বীরকার্য্যে উৎসাহ পূর্ণ হইয়া দস্যুদিগের নগর সমূহ বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। হে বজ্রধারিন্, আমাদিগের স্তুতি অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর; হে ইন্দ্র, আর্য্যগণের বল ও যশঃবর্দ্ধন কর।" ১ মণ্ডল ১০৩। ৩।

ইহার পরে মন্ত্রেই সিফা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী, ক্ষুদ্রনদী চতুষ্টয়ের তীরবর্ত্তী গুপ্তগৃহে দস্যুদের অবস্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় নদীর আধুনিক নাম জানা যায় নাই। সেই দস্যুবংশে জাত ভীলসর্দ্দার তাঁতিয়া যেমন অধুনাতন সময়ে মধ্যভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ গ্রামে লুণ্ঠনাদি করিয়া বেড়াইত, তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরাও তদ্রূপ গুপ্তগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আর্য্যদিগকে উত্তেজিত করিত। "কুয়ব পরের ধন জানিতে পারিয়া স্বয়ং অপহরণ করে, জলে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বয়ং কেন (যুক্ত জল) অপহরণ করে, কুয়বের দুই ভার্য্যা সেই জলে স্নানকরে, "তাহারা যেন শিফা-নদীর গভীর নিম্নভাগে হত হয়। অযু

(অর্থাৎ উপদ্রবকারী কুয়ব দস্যু) জল মধ্যে অবস্থান করে এবং তাহার বাসস্থান গুপ্ত ছিল; সেই শূর পূর্ব্ব অপহৃত জলের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিরাজ করে। অঞ্জসী, কুলিসী ও বীরপত্নী নদীত্রয় স্বকীয় জলদ্বারা তাহাকে প্রীত করিয়া জলদ্বারা তাহাকে ধারণ করে। বৎসপ্রিয় গোরু যেরূপ গোষ্ঠের পথ জানে, আমরা সেইরূপ সেই অসুরের গৃহেরদিকে যে পথ গিয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। হে মঘবন্! সেই অসুরের পুনঃ পুনঃ কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" প্রথম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তের ৩,৪, ও ৫ ঋক।

অন্যত্র রহিয়াছে;—"ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন। অসংখ্য বাব রক্ষাকারী ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য ব্রত-রহিত ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। তিনি (কৃষ্ণ অসুরের) কৃষ্ণ ত্বক্ উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করেন। তিনি উহাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংসকদিগকে দগ্ধ করেন এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন।" প্রথম মণ্ডল ১৩০।৮। পুনরপি এই মণ্ডলের ১৩৩ সূক্তে ২ হইতে ৫ ঋকে আছে—"হে (শত্রু) ভক্ষক ইন্দ্র! তুমি হিংসাবতী সেনার মস্তক একত্র করিয়া তোমার বিস্তৃত পদদ্বারা ছেদন কর। তোমার পদ মহা বিস্তীর্ণ। হে মঘবন্! এই হিংসাবতী (সেনার) বল চূর্ণ কর এবং কুৎসিৎ শ্মশানে বা মহাশ্মশানে নিক্ষেপ কর। হে ইন্দ্র। তুমি এইরূপ ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক সেনা নাশ করিয়াছ। লোকে তোমার এই কার্য্যকে বড় ভাল বলিয়া মনে করে। কিন্তু তোমার পক্ষে এ কার্য্য সামান্য। হে ইন্দ্র! তুমি অতি ভয়ঙ্করী পিশাচীকে * বিনাশ কর, এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে নিঃশেষ কর।" "হে ইন্দ্র! অর্চ্চনীয় অন্ন লাভের জন্য কবি তোমার স্তব করিতেছে, তুমি পৃথিবীকে দাসের শয্যা করিয়া দিয়াছ। অথবা তিন ভূমিকে দাসদ্বারা বিচিত্র করিয়াছ, এবং দুর্য্যোনি রাজার জন্য কুযবাচকে হনন করিয়াছ। হে ইন্দ্র! নব্য ঋষিগণ তোমাব সনাতন প্রসিদ্ধ বীরকর্ম্মের স্তুতি করে, তুমি অনেক হিংসকদিগকে সংগ্রাম নিরারণের জন্য বিনাশ করিয়াছ। তুমি দেব-রহিত বিপক্ষ নগর সকল ভেদ করিয়াছ এবং দেবরহিত শত্রুর অস্ত্র নত করিয়াছ।" (প্রথম মণ্ডলের ১৭৪ সূক্ত, ৭ ও ৮ ঋক) "হে অশ্বিদ্বয়! জঘন্য শব্দ করতঃ কুক্কুরের ন্যায় যাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ কর। তাহারা সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেল। তাহাদিগকে মারিবার উপায় তোমরা জান। তোমাদিগকে যাহারা স্তুতি করে, তাহাদের প্রত্যেক কথা রত্নবতী কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা কর।" (প্রথম মণ্ডলের ১৮২ সূক্ত, ৪ ঋক্) "দ্যুতিমান, কীর্ত্তিমান অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, শত্রুনাশক বলবান্ ইন্দ্র যেন শোক-অনিষ্ঠকারী দাসের প্রিয় মস্তক নিম্নে ক্ষেপণ করেন। বৃত্রহা পুরনাশন ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাস সেনাকে বিনাশ করিয়াছেন তিনি যেন। যজমানের উচ্চ অভিলাষ পূরণ করেন। "২ মণ্ডল, ২০ সূক্ত ৬ ও ৭ ঋক।

* এখানে পিশাচ ও রাক্ষস শব্দদ্বারা বোধহয় অনার্য্য বর্ব্বরকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমেরিকায় পূর্ব্বে অশ্বের ব্যবহার ছিল না। স্পেনজাতীয়েরা আমেরিকা জয়কালে এই অশ্ব চালনা করিয়া আদিম নিবাসীদের অন্তরে যৎপরোনাস্তি ভয়ের উদ্রেক করিয়া সহজে জয়লাভ করিয়াছিলেন। আদি আর্য্যদের অশ্বচালনা দর্শনে ভারতীয় অনার্য্যজাতীয়েরাও তদ্রূপ ভয়ে অভিভূত হইত, প্রমাণার্থ অশ্বদেবতা দধিক্রার * স্তুতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "লোকে যেরূপ বস্ত্রাপহারক তস্করকে দেখিয়া চীৎকার করে, সেইরূপ সংগ্রামে শত্রুগণ ইহাকে দেখিয়া চীৎকার করে। যেরূপ পক্ষিগণ নিম্নাভিমুখে আগমনকারী ক্ষুধার্ত্ত শ্যেনপক্ষীকে দেখিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ, লোকে এই অন্ন ও পশু লুণ্ঠনকারী দধিক্রাকে দেখিয়া চীৎকার করে। যুদ্ধাভিলাষিগণ দীপ্তিমান্ অশনির ন্যায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দ্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্দ্ধার হইয়া উঠেন।" চতুর্থ মণ্ডল ৩৮ সূক্ত, ৫ ও ৮ ঋক্।

ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখা যায় যে, কুৎস নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন—; তিনি অনেক কৃষ্ণকায় অনার্য্য বিনাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থমণ্ডলের ষোড়শ সূক্তে কথিত আছে, "মায়াবান্ ঋত্বিকশূন্য দস্যুকে বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্র কবি-কুৎসের অভিমুখে ধন প্রসাদের জন্য গমন করিয়াছিলেন" (৯ ঋক্); "ইন্দ্র মনে মনে দস্যুবধে কৃতসংকল্প হইয়া কুৎসের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন এবং কুৎসের সখ্যতার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।" ১০ ঋক। ইন্দ্র কুৎসের সাহায্যে "পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলেন" (১৩ ঋক্)। চতুর্থ মণ্ডলের ২৮ সূক্তে কথিত আছে যে, ইন্দ্র দস্যুদিগকে সমস্ত সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যের নিন্দনীয় করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের বধের জন্যই ইন্দ্র ও সোম মনুষ্যের পূজা গ্রহণ করিতেন। ৪র্থ ঋক্। উক্ত মণ্ডলের ৩০ সূক্ত পাঠে জানা যায়, ইন্দ্র পঞ্চ শতাধিক-সহস্র সংখ্যক দাসকে বিশেষরূপে বধ করিয়াছিলেন। ১৫ ঋক্।

দাস ও দস্যুদের পরাজয় ও বিনাশের কথা পঞ্চ মণ্ডলের ৭০।৩, ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৮।৩, ও ২৫ ১ ও ২ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। দস্যুরা যে অজ্ঞাত গুপ্ত স্থানে বাস করিত, ষষ্ঠ মণ্ডলের সূ ৪৭।২০ ঋকে তাহার বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে। "আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গোচারণভূমি-রহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী দস্যুগণের আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হে বৃহস্পতি! তুমি ধেনুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদিগকে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! এইরূপে পথভ্রষ্ট ত্বদীয় উপাসককে তুমি পথ প্রদর্শন কর।"

ইতিপূর্ব্বে কুয়ব ও আয়ু নামে দুই দস্যুর উল্লেখ করিয়াছি। তাহারা নদীবেষ্টিত গুপ্তস্থানে লুকায়িত রহিয়া সুযোগ পাইলেই আর্য্য গ্রাম সমূহ আক্রমণ করিত। কৃষ্ণ নামে আর একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বোধহয়, ইহার কৃষ্ণবর্ণ হইতে আর্য্যেরা ইহাকে কৃষ্ণ নাম দিয়াছিলেন। একটী সূক্ত এস্থলে অনুবাদযোগ্য;— "দশ সহস্র সৈন্যের সহিত দ্রুত গমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা

* অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। সায়ন।

সেই শব্দকারীকে প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যদিগের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাদিগকে বধ করিলেন। • (ইন্দ্র বলিলেন) দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে ও সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুৎগণ! আমি ইচ্ছাকরি, তোমরা যুদ্ধকর, এবং যুদ্ধে তাহাকে সংহার কর। দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সহায় লাভ করিয়া দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করিলেন।" (অষ্টম মণ্ডল, সূঃ৯৬, ঋঃ ১৩—১৫)।

অনার্য্যদিগকে কেবল চীৎকারপ্রিয় ভাষাহীন জীব বলিয়া আর্য্যেরা ক্ষান্ত হয়েন নাই; অনেক স্থলে অনার্য্যেরা মনুষ্যই নয়, এইরূপ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। "আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ কর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র; তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শক্র সংহারকারী (ইন্দ্র)! তাহাদিগকে নিধন কর; সেই দাস জাতিকে হিংসা কর।" (মঃ ১০, সূঃ ২২, ঋ ৮) দশম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি দস্যু জাতিকে 'আর্য্য' এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।" (ঋঃ ৩), "দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করিয়াছি" (ঋঃ ৬), "যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করিয়া শোধন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাস জাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া দিখণ্ড কবি,এই দশার জন্যই সে জন্মিয়াছে।" ঋঃ ৭।

ঈদৃশ অনার্য্য দস্যুদের সহিত প্রাচীন আর্য্যেরা অশেষ যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্তছিলেন। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া বিজেতাগণ নবার্জ্জিত রাজ্য রক্ষা, ক্রমশঃ কৃষি ভূমি বিস্তার, নবগ্রাম স্থাপন, এবং অরণ্য মধ্যে নূতন শাসন ও অধিবাস পত্তন করিয়া আর্য্য-গৌরব বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনার্য্যদিগকে ঘৃণা করিতেন, সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করিতেন। অনার্য্যেরাও সুযোগ পাইলেই এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইত। তাহারা নদী মধ্যে ও গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রহিয়া আর্য্যদিগকে অসহায় অবস্থায় পাইলেই লুণ্ঠন করিত, গ্রাম আক্রমণ করিয়া গবাদি অপহরণ করিত, নতুবা তাহা বিনাশ করিয়া চলিয়া যাইত। কখন কখন বহু সংখ্যক ব্যক্তি হঠাৎ আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিত। প্রত্যেক সূচ্যগ্র ভূমির জন্য অনার্য্যেরা প্রাণপণে চেষ্টা না করিয়া ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহারা বিজেতা আর্য্যদের হোম যাগাদি কার্য্যে বাধা দিত, আর্য্য দেবতাদিগকে ঘৃণা করিত, এবং আর্য্যদের ধনাদি লুণ্ঠন করিত। কিন্তু এত বাধা বিঘ্ন সত্বেও আর্য্য জাতীয়দের গ্রাম, নগর, অধিবাস, কৃষি চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নিবিড় অরণ্য কৃষি ভূমিতে পরিণত হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও নগর সংস্থাপিত হইল, এবং এইরূপে সমগ্র পঞ্জাবে প্রাচীন আর্য্যদের অধিকার দৃঢ়ীভূত হইল। হয়, এইরূপে পঞ্জাবের সমস্ত অনার্য্য জাতির বিনাশ হইয়া থাকিবে, নতুবা ধ্বংসাবশিষ্ট অনার্য্যেরা, ভারতবর্ষের অসংখ্য গিরিকন্দর

ও অরণ্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে। অনার্য্যদের মধ্যে দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিরা কেহ কেহ যে মৃত্যু বা স্বদেশ নির্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে দস্যুদের বর্ণনার মধ্যেও তাহাদের আর্য্য বশ্যতা স্বীকার করার কথা দেখা যায়।

আর্য্য-অনার্য্য যুদ্ধ বিগ্রহের অনেক উদাহরণ সংগৃহীত হইলেও, পরাক্রান্ত বিজেতা সুদাসের যুদ্ধ বিবরণ সম্বন্ধে ৭ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের কতিপয় ঋক অনুবাদ করিতেছি— "৮। দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করতঃ অদীনা নদীর কূল ভেদ করিয়া দিয়াছিল। সুদাস মহিমাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি পাতিত পশুর ন্যায় শয়ন করিয়াছিল। ৯। নদীর জল গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন করিয়াছিল; অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করে নাই, এবং সুদাসের অশ্বগম্য প্রদেশে গমন করিয়াছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপত্যবিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদিগকে অপত্যগণের সহিত বশ করিয়াছিলেন। ১১। রাজা সুদাস যশোলাভের জন্য দুইটী জনপদের একবিংশ জন সেনাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা (অধ্বর্য্য) যেরূপ কুশাচ্ছেদন করে, সেইরূপ তিনি শত্রুগণকে ছেদন করেন। শূর ইন্দ্র তাঁহার সাহায্যার্থ মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। ১৪। অনুর ও দ্রুহ্যর গবাভিলাষী ষষ্ঠীশত এবং ষট্‌সহস্র ষড়াধিক ষষ্ঠীসংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্য্যাভিলাষী সুদাসের জন্য শায়িত হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রের বীর্য্যসূচক। ১৭। ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এক-কার্য্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগদ্বারা হত করিয়াছিলেন, সূচীদ্বারা কূপাদির কোণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন।"

যে কবি অবিনশ্বর ভাষায় সুদাসের এই কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করিয়াছেন, সুদাস হইতে তিনি তদনুরূপ পুরস্কৃত হইয়া থাকিবেন। কারণ ২২।২৩ ঋকে কবি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছেন যে, দেববান রাজার পৌত্র পিজবনের পুত্র, সুদাসের নিকট দুই শত গো, দুইখানি রথ ও স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট চারিটী অশ্ব পাইয়াছিলেন।

সপ্তম মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে সুদাশ দশজন রাজাকর্ত্তৃক হিংসিত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বশিষ্ঠরচিত সূক্তে আমরা জানিতে পারি। এই সূক্তোক্ত যুদ্ধ বর্ণনায় কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা এস্থলে অনুবাদ করিতেছি। "২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করতঃ মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাহাতে দূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ, ভূমির খণ্ড সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করিতেছে। সৈন্যের শত্রু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে প্রার্থনা পূর্ণকারী ইন্দ্র ও বরুণ! রক্ষা করিবার জন্য আমাদের নিকট আগমন কর। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আয়ুধদ্বারা অনাহত ভেদকে হিংসা করতঃ তোমরা সুদাসকে রক্ষা করিয়াছ, তৃৎসুদিগের

স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছ, যুদ্ধকালে তৃৎসুদিগের পৌরহিত্য সফল হইয়াছিল। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাকে চতুর্দ্দিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসকদিগের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিতেছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর। অতএব যুদ্ধদিনে আমাদিগকে রক্ষা কর। ৬। যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন রাজাকর্ত্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সহিত তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞ-রহিত রাজা মিলিত হইয়াও সুদাসকে প্রহার করিতে সক্ষম হয় নাই। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হইয়াছিল। ইঁহাদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।”

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে যুদ্ধাবসানে দুন্দুভির স্তব রহিয়াছে। এই রণবাদ্য যন্ত্রকে নিজ শব্দদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদিগকে ভীত করিতে এবং শত্রুদিগের অন্তরে ভয় সঞ্জাত করিয়া তাহাদিগকে সুদূরে তাড়িত করিতে প্রার্থনা করিতেছেন। সূক্তের শেষাংশে আছে “দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট সমরকাল ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব করিতেছে। আমাদিগের নায়কগণ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সমবেত হইয়াছেন। হে ইন্দ্র! আমাদিগের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে।”

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে যুদ্ধ সামগ্রী ও যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা রহিয়াছে। প্রাচীন সময় কীদৃশ যুদ্ধাস্ত্র ও বর্ম্ম ব্যবহৃত হইত, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। “১। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে এই রাজা যখন বর্ম্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন জীমূতের ন্যায় তাঁহার রূপ হয়। হে রাজন্! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয় লাভ কর, বর্ম্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক। ২। আমরা ধনুঃদ্বারা গাভী জয় করিব। ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করিব। ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত (শত্রু সেনা) বধ করিব। ধনুঃ শত্রুর কামনা নষ্ট করুক। আমরা ধনুঃদ্বারা সর্ব্বদিক জয় করিব। ৩। এই ধনু-সংলগ্ন জ্যা সংগ্রামকালে যুদ্ধের সময়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যেন প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই ধনুর্দ্ধারীর কর্ণের নিকট আগমন করে। এবং স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে। ৫। এই তূণীর বহুতর বাণের পিতা; অনেকগুলি বাণ ইহার পুত্র। বাণ তুলিবার সময় এই তূণীর চিশ্বা শব্দ করে, এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে বাণ প্রসব পূর্ব্বক সমস্ত সেনা জয় করে। ৬। সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানে সেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছাকরে, সেই খানেই লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে। তাহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন কর। ৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে এবং পলায়ন না করিয়া হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে। ১১। (বাণ) সুপর্ণ ধারণ করে; মৃগ শৃঙ্গ উহার দণ্ড। উহা গাভীচর্ম্ম কর্ত্তৃক* সম্যক রূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয়। নেতাগণ

* গোবিকার স্নায়ুসমূহ অথবা জ্যা।

একত্র ও পৃথক রূপে বিচরণ করেন, বাণ সমূহ আমাদিগকে সেই স্থানে সুখদান করুন্। ১৪। হস্তঘ্ন * জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় শরীরের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। ১৫। যাহা বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহার মুখ লৌহময়, সেই পর্জ্জন্য ‡ কার্য্যভূত বৃহৎ ইষুংদেবতাকে এই নমস্কার।

এই সকল উদাহরণই যথেষ্ঠ। অন্যত্র আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, যোদ্ধারা যে শুধু বর্ম্ম ব্যবহার করিতেন, তাহা নয়। সিপ্রা (শিবঃ মুকুট) ও অংসত্রা নামক এক প্রকার ঢালের ব্যবহার ছিল! বাশী নামে কুঠার ও ঋষ্টি নামে ভল্ল, শাণিত খড়্গধারা ও ধর্নুবাণ তৎকালিক যুদ্ধাস্ত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পুরাকালে যে কোন যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই চতুঃসহস্র পূর্ব্বে আর্য্যদের জ্ঞাত ছিল। দুন্দুভির আহ্বানে সকলে দলবদ্ধ হইয়া পতাকায় অনুগমন করিতেন, এবং রথারোহণ ও অশ্বারোহণে যুদ্ধে প্রবেশ করিতেন।

বৈদিক যোদ্ধা পুরুষেরা যে যুগে যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন, তাহা যে অতিবিপদ-সঙ্কুল সময় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিকে আদিম অনার্য্যের বিরুদ্ধে অশেষ যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, অপর দিকে আর্য্যাধিকৃত দেশ সমূহ বিভিন্ন নেতার অধীন হওয়াতে, যখন যে নেতা পরাক্রান্ত হইতেন, তখনই তিনি অত্যাসন্ন দেশকে করায়ত্ব করিতে চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞলিপ্ত ঋষিরা শত্রুদিগের জয় লাভের জন্য এবং যুদ্ধে জয়কারী বীরপুত্রের জন্য দেবতাদের নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতেন। যৌবন উপস্থিত হইলেই প্রত্যেকে যোদ্ধা সাজিয়া বাহুবলে স্বীয় গৃহ, ভূমি ও গাভী রক্ষা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সিন্ধু হইতে সরস্বতী প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রদেশে যে সকল আর্য্য বংশীয় লোকেরা বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই কর্ম্মঠ, সাহসী, যোদ্ধৃ পুরুষ ছিলেন, এবং অনার্য্যদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াই তাঁহারা জাতীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

এই প্রকার অবস্থার কথা মনে করিতে কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু প্রাচীন কালে এমন জাতি কোথায় ছিল। যাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষা, বা অধিকার বিস্তারের জন্য সর্ব্বদা সমর সজ্জায় সজ্জিত না থাকিতেন এবং এই বর্ত্তমান সময়েও, গৌতম, বুদ্ধ ও যীশু খ্রীষ্টের শান্তি-ধর্ম্ম প্রচারের দুই সহস্র বৎসর পরে, এমন জাতি কোথায় আছে যে, প্রতিবেশীর আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষার্থ সতত সমর-সজ্জা না করিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি ব্যবসা করিয়া নিরাপদে ফল ভোগ করিতেছেন? যদি ইউরোপে পঞ্চাশৎ বৎসরকাল কোন ঘোরতর যুদ্ধ না হইয়া অতিবাহিত হইয়া, থাকে, অনেকে তাহা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের সমস্ত দেশ আপাদ মস্তক যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। বৃহৎ দেশ ও সাম্রাজ্য সমূহে লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তাহারা স্বগৃহ, পরিবার ও ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া

* ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা যায়, তাহার নাম হস্তঘ্ন।

‡ বাণমুখ লৌহে নির্ম্মিত হইত। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা। পর্জ্জন্যইষু বোধ হয় বর্ষাকালে জাত নল।

প্রতিবেশীর সীমন্ত প্রদেশে যাইয়া সপ্তাহ মধ্যে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত! সভ্যতার গুণে মনুষ্য অনেক উপকার লাভ করিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ বা যুদ্ধাস্ত্র এখনও জগতে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রতিবেশী জাতিদের সহিত যুদ্ধ করিতে চির প্রস্তুত না থাকিয়া কোন জাতি শান্তিপূর্ণ কৃষি বাণিজ্যের ফল উপ ভোগ করিত পারে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার প্রণালী।

(রমণীদিগের সামাজিক অবস্থা।)

ভারতভূমির আদিম নিবাসীদের সঙ্গে এইরূপে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া প্রাচীন আর্য্যেরা সিন্ধু হইতে সরস্বতী ভূখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, ঋগ্বেদে সিন্ধুনদ ও তাহার পঞ্চ শাখার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ রহিয়াছে। দশম মণ্ডলে সিন্ধু সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর (৭৫) সূক্ত রহিয়াছে; নিম্নে তাহা সমগ্র অনুবাদ করিতেছি। "১। হে জল সকল! যজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহারা সাত সাত করিয়া তিনশ্রেণীতে চলিল; সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ট। ২। হে সিন্ধুনদি! যখন তুমি অন্নশালী (শস্যশালী) প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে, তখন বরুণদেব তোমার যাইবার পথ কাটিয়া দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়া গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর। ৩। পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইহার প্রবল শব্দ হইতে জ্ঞান হয় যেন মেঘ হইতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সিন্ধু আসিতেছেন, যেন বৃষ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছেন। ৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু-বৎসের নিকট তাহাদের জননী গাভীরা দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল লইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজা সৈন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার সহগামিনী এই দুইটী নদী শ্রেণীকে * লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চলিতেছ। ৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু এবং পরুষ্ণি (রাভি), আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী (চেনাব)-সঙ্গতা মরুৎবৃধা নদী! হে বিতস্তা (ঝিলাম) ও সুসোমা-সঙ্গতা আর্জীকীয়া (বিয়াস্) নদী! তোমরা শ্রবণ কর †। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টমা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্ত্তু ও রসা ‡ ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রুমু (কুরুম্ নদী) ও গোমতী (গোমাল) নদীকে, কুভা (কাবুল নদী) ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি একরথে অর্থাৎ একাত্র যাইয়া থাক। ৭। এই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাইতেছে। তাহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল; তিনি অতি মহৎ; তাহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া

---

* পূর্ব্বদিক হইতে শতদ্রু প্রভৃতি আর পশ্চিমদিক হইতে তৃষ্টমা প্রভৃতি এই দুই শ্রেণী নদী আসিয়া সিন্ধুতে পতিত হইয়াছে।

† পঞ্চম ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বদিকের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ষ্ঠ ঋকে পশ্চিম দিকের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের নাম পাওয়া যায়।

‡ Ramha Araxes (?)

চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। যত গতিশালী পদার্থ আছে, ইহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত; ইনি স্থূলকায়া রমণীর ছায় সৌষ্টব-দর্শন। "৮। সিন্ধু চির যৌবনা ও সুন্দরী; ইহার উৎকৃষ্ট ঘোটক ও উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, ইহার তীরে সীলমা-খড় আছে, ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত। ৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনিয়া দিয়াছেন। ইহার মহিমা অতি মহৎ বলিয়া স্তব করে। ইনি দুর্দ্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ।"

এই সূক্তে কবি সুদূর দৃষ্টিতে যেন তিনটী বৃহৎ নদীশ্রেণী নয়ন গোচর করিতেছেন। একশ্রেণী উত্তর পশ্চিম, আরেক শ্রেণী উত্তর পূর্ব্ব হইতে ধাবিত হইয়া সিন্ধুতে পতিত হইতেছে; তৃতীয় শ্রেণী গঙ্গা যমুনা নানা শাখা প্রশাখা সহ পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিতেছে। বৈদিক কবিদের ভূভাগ যত দূর পরিজ্ঞাত ছিল, এই সূক্ত তাহার পরিচয় দিতেছে। উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে সিন্ধু নদী ও সালিমান পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণে সিন্ধু বা সমুদ্র, পূর্ব্বে গঙ্গ-যমুনা। এতদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ বৈদিক ঋষিদের অজ্ঞাত ছিল।

পঞ্জাব প্রদেশের নদী শ্রেণীকে এক স্থানে সপ্তনদী বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে, আর একস্থলে এই সপ্তনদীর মধ্যে সিন্ধুমাতা এবং সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যদের সেই প্রথম বাস্তু ভূমি পঞ্জাবে অদ্যাপি সিন্ধুনদ ও তাহার পঞ্চ (শাখা) বিতস্তা, অসিক্নী, পরুষ্ণি অর্জ্জিকিয়া ও শতদ্রু) প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন নদী সমূহ মধ্যে পবিত্রতমা ও দেবতা-সম্মান-প্রাপ্তা সরস্বতী নদীর লোপ হইয়াছে। সরস্বতীর স্রোত রাজপুতানার মরুভূমে লীন হইয়াছে।

রাজা সুদাস দত্ত রথ, অশ্ব ও অন্যান্য পুরস্কার লইয়া ঋষি বিশ্বামিত্র বিপাস ও শুতুদ্রী উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর ক্রোধ প্রশমনার্থ এক সহস্র স্তব প্রণয়ন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সুদাস নৃপতি মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন, দশজন রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অনেক সূক্তে বর্ণিত আছে। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও বিদ্যা চর্চ্চায় উৎসাহ দিতেন, এবং বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়বংশীয় ব্যক্তিদিগকে সমভাবে আদর ও সম্মান করিতেন। এজন্য এই দুই বংশের মধ্যে যথেষ্ঠ দ্বেষ চলিত; ইহারপর তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা যাইবে।

ঋগ্বেদে পঞ্জাবীয় 'নদীসমূহের উল্লেখ পুনঃ ২ মিলে বটে, কিন্তু গঙ্গাযমুনার উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়।

পঞ্জাবই যে ভারতীয় আর্য্যদের আদি স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে তাঁহারা পাঁচ জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। মঃ ১।৭।৯, মঃ ১।১৭৬।৩, মঃ ৬।৪৬।৭ ঋকে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে "পঞ্চক্ষিতির" বা পাঁচটী দেশের উল্লেখ আছে। মঃ ২।২।১০, মঃ ৪।৩৮।১০, ঋকে অন্যান্য স্থানে পঞ্চকৃষ্টি

বা পঞ্চ "কৃষক" সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এবং মঃ ৬।১১।৪, মঃ ৬।৫১।১১, মঃ ৮।৩২।২২, মঃ ৯।৬৫।২৩ ঋকে "পঞ্চজন" বা পঞ্চজাতির উল্লেখ পাইতেছি।

এই সবল হৃদয়, সাহসী, উদ্যমপূর্ণ পঞ্চবংশের লোকেরা পঞ্জাবীয় নদীসমূহের উর্ব্বরকূলে কৃষি ও গোচারণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র আর্য্য হিন্দুগণ এই পঞ্চজন হইতে উৎপন্ন।

পঞ্জাবের এই পঞ্চ জাতির সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন জীবন পর্য্যালোচনারূপ কুতূহলজনক ও আনন্দজনক কার্য্যে আমরা এখন প্রবৃত্ত হইতেছি। এক মনুষ্য হইতে অনেক মনুষ্যকে এবং এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীকে স্পষ্টরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য পরবর্ত্তী সময়ে যে জন্মগত জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, ঋগ্বেদের সময় সেই অশুভকর নিয়ম বিধির কোনও চিহ্ন দেখা যায় না, এবং তৎকালে গোমাংস ভোজনে কোন আপত্তি ছিল না, এবং বনিকগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সমুদ্র পথে গমন করিতেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সময়ের ঋষিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান তপস্যায় জীবন যাপন করিতেন না, পরন্তু ঋষিরা বিষয়ী লোক ছিলেন, বহু গো ও কৃষিভূমি অধিকার করিয়া যুদ্ধে দস্যুদের দণ্ডবিধান করিতেন এবং গোধন ও যুদ্ধে জয়লাভ ও বীরপুত্র লাভ, স্ত্রী ও পুত্রের কল্যাণের জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন। বস্তুতঃ গৃহীমাত্রেই একপ্রকার ঋষি ছিলেন; স্বগৃহে, সাধ্যানুসারে সপরিবারে, স্বীয় দেবতার স্তুতি করিতেন। এই দেবকার্য্যে পুত্রকন্যা সকলেই সাহায্য করিত। এই গৃহি-সমাজের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্র রচনার ও কেহ কেহ যজ্ঞের আড়ম্বরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ সমাদর করিতেন। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র প্রণেতারাও কোন জন্মগত বা ব্যবসায়গত জাতিভুক্ত ছিলেন না। তাঁহারা সাংসারিক লোক ছিলেন, আর্য্যজাতীয় সমস্ত লোকের সঙ্গে মিশিতেন, তাহাদের সহিত বিবাহাদি আদান সম্প্রদান হইত, তাহাদের সঙ্গে একত্রে ধন ও গাভী অধিকার করিতেন, তাহাদের জন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন, বস্তুতঃ তাহাদিগের অন্তর্গত লোক ছিলেন।

একজন বীর ঋষি (মঃ ৫।২৩।২) অগ্নির নিকট "সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ" একটী পুত্রের জন্য স্তব করিতেছেন। অন্যত্র (মঃ ৬।২০।১) ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট "সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটী পুত্রের" জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। অন্যত্র (মঃ ৯।৬৯।৮) সংসারী ঋষি হিরণ্য স্তব করিতেছেন "হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা ধনসম্পত্তি, সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী, যব ও সন্তান সন্ততি প্রাপ্ত হই।" যোদ্ধা ও কৃষক সম্প্রদায় ভিন্ন ঋষিরা, এক ভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন, সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে কুত্রাপি তাহার প্রমাণ নাই।*

* ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ মণ্ডলের ৯০ সূঃ ১২ ঋকে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতির উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু সূক্তটী আধুনিক, ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশের সমসাময়িক নহে, তাহা ভাষাবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন। ঋগ্বেদের দশ সহস্র মন্ত্রের মধ্যে অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দ গুলি কুত্রাপি জাতি বিশেষ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণ

সে সময়ে জাতি বিভাগ ছিল না, তাহা ঋগ্বেদে উহার উল্লেখ না থাকা হইতেই প্রমাণীত হইতেছে। পাঁচ কি ছয়শত বৎসর ব্যাপিয়া ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ প্রণীত হইয়াছিল; ইহাতে আর্য্যদের আচার নীতির ব্যবহার বিশ্বাসের বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে; আর্য্যদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধসংগ্রাম, বিবাহ ও গার্হস্থ্য রীতিপ্রণালী, স্ত্রীলোকের অবস্থা ও কর্ত্তব্য, যজ্ঞাদি ধর্ম্মাচার, জ্যোতিষ—সকলই বর্ণিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সময়ে জাতভেদ ছিল, তথাপি ঋগ্বেদের দশ সহস্র ঋকের কোনও একটী স্থানে এই বিস্ময়কর জাতিভেদ প্রথার কথাটা নাই, তাহা কি সম্ভব? আকারে ঋগ্বেদের এক দশমাংশমাত্র এইরূপ কোনও অধুনিক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে কি, যাহাতে জাতিভেদের উল্লেখ নাই?

ঋগ্বেদের সময়ে জাতিভেদের নাস্তিত্ব সম্বন্ধে এই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর প্রমাণ ঋগ্বেদে লক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় যে "বর্ণ" শব্দ জন্মগত জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্যের (গৌর ও কৃষ্ণের) বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যেরা তিন "বর্ণে" বিভক্ত ছিলেন, এমন কুত্রাপি উল্লেখ নাই। (মঃ ৩। ৩৪। ৯)। ক্ষত্রিয় শব্দ পরবর্ত্তী সংস্কৃতে জন্মগত জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু ঋগ্বেদের ইহা বিশেষণ মাত্র, অর্থ "বলশালী"; দেবতাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা আছে। ৭।৬৪।২ ঋকে মিত্র ও বরুণকে 'সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়' ৭।৮৯ সূক্তের প্রথম চারি মন্ত্রের শেষে বরুণ দেবকে 'সুক্ষত্র' বলিয়া সম্বোধন রহিয়াছে। পুরোহিত জাতি বুঝাইতে আধুনিক সংস্কৃতে বিপ্র শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু ঋগ্বেদে "জ্ঞানী" "বিজ্ঞ" এই খানে অর্থে বিপ্র শব্দ দেবতাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ৮।১১।৬ ঋকে "বিপ্রং দেবং অগ্নিং" আছে, অর্থাৎ মেধাবী অগ্নিদেব। পুরোহিত জাতি-বোধক ব্রাহ্মণ শব্দ ঋগ্বেদের শত শত স্থানে শুধু 'ঋক্ প্রণেতা কবি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৭।১০৩।৮ ঋকে "ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ" আছে অর্থ "স্তুতিকারী স্তোতৃগণ।" ১০।৭১।৯ ঋকে আছে—"যাহারা দেব স্তুতি করেনা এবং সোমযাগ করেনা, তাহারা পাপযুক্ত হইয়া কেবল লাঙ্গল চালনার উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা ইহকাল পর্য্যালোচনা করিত ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোতা হইত, জন্মগুণে স্তোতা হইত না! যাহারা ঐ ধর্ম্মক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষক বা তন্তুবায় হইত, জন্মদোষে কৃষক বা তন্তুবায় হইত না।

এইরূপ অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায় স্থানাভাবে বিরত রহিলাম। কিন্তু একটী উদাহরণ এস্থলে সংগ্রহ না করিয়া পারিলাম না। ঋগ্বেদ-সুলভ নিষ্কপট ভাবে এক ঋষি সকরুণচিত্তে বলিতেছেন, "দেখ, আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে তৃণ কামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব, হে সোম! ইন্দ্রের

বিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। এই সূক্তের ভাবও আধুনিক।

জন্ত ক্ষরিত হও।" যাঁহারা বৈদিক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিল মনে করেন, তাঁহারাই বলুন, যে পরিবারে পুত্র মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য, এবং মাতা ময়দা-ওয়ালী, তাঁহারা কোন্ জাতি ভুক্ত? আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, ঋগ্বেদীয় ঋষিরা বলবান্ যোদ্ধা ছিলেন। বিশ্বামিত্র যেমন মন্ত্র-প্রণেতা ঋষি, তেমনি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। পরবর্ত্তী হিন্দুরা ঋষি আবার যোদ্ধা, এই কথায় স্তম্ভিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন,পরে গুণবলে ব্রাহ্মণ হইলেন, এইরূপ অতি মনোরঞ্জক পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্য সঙ্গোপনের বৃথা চেষ্টা! আসল কথা এই, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিভেদ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালীন ঋক্‌বেদীয় ঋষি, একাধারে পুরোহিত ও যোদ্ধা।

ঋগ্বেদের কুত্রাপি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অথবা প্রতিমা রক্ষা করিবার জন্য মন্দির, অথবা পূজাদি সম্পাদন করিবার জন্য বিশেষ স্থানে সমবেত হইবার উল্লেখ নাই। প্রত্যেক গৃহই স্বগৃহে গৃহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে সরল ও মনোহর স্তব কীর্ত্তন করিতেন। ঋগ্বেদীয় স্তব আর্য্য জাতীয় সকল ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি ছিল। স্ত্রীলোকেরা এই সকল যজ্ঞে সাহায্য করিতেন, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিতেন, উদূখলে তাহা পেষণ করিতেন, সোমরস বাহির করিতেন, এবং কখন হস্তে মেষলোমে তাহা ছাকিয়া পরিষ্কৃত করিতেন। অনেক স্থানে স্বামী স্ত্রী একত্রে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া প্রার্থনা করিতেন, যেন তাঁহারা এক সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারেন।* এতৎ সম্বন্ধে একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ঋষির (বৈবস্বত মনুর) কয়েকটী কথা পাঠকবর্গের কুতূহল নিবৃত্ত্যর্থ উদ্ধৃত করিতেছি। "৫। ৬ হে দেবগণ! যে দম্পতী একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে, এবং মিশ্রণ দ্রব্য দ্বারা সোম মিশ্রিত করে, তাহারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তাহারা অন্নার্থ কোথাও গমন করে না। ৭। তাহারা দেবগণকে অবলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্ন দ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করে। ৮। তাহারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমার বিশিষ্ট, স্বর্ণ ভূষিত হইয়া উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে। ৯। প্রিয় যজ্ঞ বিশিষ্ট এই দম্পতীর স্তুতি দেবগণ কামনা করেন; ইহারা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করে। অমরত্বের জন্য অর্থাৎ সন্ততি লাভার্থ পরস্পর আলিঙ্গন করেন এবং দেবগণের পরিচর্য্যা করেন।" অষ্টম মণ্ডল ৩১ সূক্ত। এইরূপে একত্রে যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন ও সংসার সুখ লাভের কথা ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র রহিয়াছে।†

বিদুষী রমণীগণ নিজেই ঋষি, স্তোত্র-মন্ত্র নিজে প্রণয়ন করিয়া পুরুষদের ন্যায় হোম করিতেন, এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে কোন্ হিন্দুর হৃদয়ে আনন্দ না হয়? প্রাচীন

* ১। ১৩১। ৩ ঋকে আছে "তোমার সেবক ও পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী তোমার (ইন্দ্রের) তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণে হব্যপ্রদান করতঃ * * * যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে। তাহারা গোধন ইচ্ছা করে এবং স্বর্গ গমনে উৎসুক।" ৫। ৪৩। ১৫ ঋকে আছে "হে অগ্নি! তুমি বলশালী; পরিণীত দম্পতী ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা জীর্ণ হইয়া তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করিতেছে।"

† স্ত্রীলোকেরা স্তোত্র মন্ত্রে-অনাধিকারিণী, নিরিন্দ্রিয়, শীলস্নেহশূন্য মিথ্যা পদার্থ, এই পৈশাচিক মত অতি আধুনিক।

কালে স্ত্রীলোকদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে কোন অনিষ্টকর অন্তরায় ছিল না, তাহাদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ বা অশিক্ষিত রাখিয়া সমাজে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার কোন চেষ্টা করা হইত না। অন্তঃপুরবদ্ধ রমণীর কথা সমস্ত ঋগ্বেদে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরন্তু সেকালের নারীগণ সমাজে তাহাদের প্রাপ্য স্থান অধিকার করিয়া মর্য্যাদা সহকারে যজ্ঞ সম্পাদনে সহায়তা করিয়া এবং সমাজে স্ব স্ব পবিত্র মহিমা বিস্তার করিয়া কালযাপন করিতেন। যে বিদুষী "ঋষি" বিশ্ববারা ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, হিন্দু মাত্রেই সমাদরে তাঁহার চিত্র হৃদয়ে ধারণ করিবেন। ধর্ম্মানিষ্ঠ বিশ্ববারা নিজে ঋক্-স্তোত্র প্রণয়ন করিয়া নিজে যজ্ঞাহুতি করিতেন এবং দম্পতিরা দেহমনোবাক্-সংযত হইয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করুক, নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অগ্নিদেবের নিকট এই প্রকার স্তুতি করিতেন। (৫।২৮।৩)* ঋগ্বেদে এইরূপ অনেক রমণী 'ঋষির' প্রমাণ রহিয়াছে।

সেকালে কন্যামাত্রেরই বিবাহ দিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। পরন্তু কন্যারা কেহ কেহ আমরণ পিতৃগৃহে অনূঢ়াবস্থায় থাকিত, এবং পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিয়া তাহার অংশভাগী হইত, এইরূপ অনেক প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।† অন্যত্র (১।১২৪।৪) উষা "যেমন জগতী-জনকে জাগরিত করেন" গৃহিণী তেমনি সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হইয়া সকলকে জাগরিত করিতেন এবং গৃহস্থিত সকলকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতেন। এইরূপ গৃহিণীপনার জন্য হিন্দুরমণী সেই প্রাচীন সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত। তথাপি গুপ্তপ্রসবিনী (২।২৯।১) ভ্রাতৃরহিতা বিপথগামিনী ও পতি-বিদ্বেষিণী দুষ্টাচারিণী ভার্য্যার (৪।৫।৫) উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলের ৩৪।৪ ঋকে কথিত আছে, "পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কাহার ধনের প্রতি পাশার লোভ-দৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার পত্নী পর্য্যন্ত ব্যভিচারিণী হয়।"

পিতামাতারা কন্যাদিগকে স্বামিমনন বিষয়ে অধিকার দিতেন; একবারে তাহাদিগের অভিমত না জানিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতেন না। কিন্তু সকল স্থানেই যে কন্যারা সৎ বরে স্বয়ংবর করিতেন, তাহা অনুরক্ত হয়। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ভদ্র,

* প্রথম ঋকে আছে 'বিশ্ববারা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণ পূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া অগ্নির অভিমুখে গমন করিতেছে।" অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী এই সূক্তের ঋষি। তিনি ৩ ঋকে বলিতেছেন "হে অগ্নি আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর, তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর, এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর।" বিশ্ববারা স্বদেশ-হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত।

† ২।১৭।৭ ঋকের সায়ন ব্যাখ্যা করিতেছেন, "পতিং অলভমানা সতী দুহিতা সমানাৎ আত্মনঃ পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদসঃ গৃহাৎ * * * যথা ভাগং যাচতে।" ইহা হইতে সপষ্ট অনুমান হয়, অনূঢ়া কন্যা পিতৃসম্পত্তির অংশ পাইতেন। প্রাচীন মনুস্মৃতিতে 'কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ গৃহে থাকুক, তথাপি পিতা তাহাকে গুণহীন বরে সম্প্রদান করিবেন না' এবং অন্যত্র "ভ্রাতারা অনূঢ়া ভগিনীদিগকে স্ব স্ব অংশ হইতে এক চতুর্থাংশ প্রদান করিবেন, না দিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন" এইরূপবিধি আছে।

নয। কেহ কেহ "কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারীসহবাসাভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ভদ্র যাহার শরীর সুগঠন, সেই (কন্যা) অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয়পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিবে।" (১০।২৭।১২) এক সময়ে হিন্দুদের মধ্যে যে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, আমরা উদ্ধৃত ঋকে তাহারই পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। তথাপি কন্যা স্বামিবরণে পিতা মাতার আদেশ উপদেশে চালিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং তাহা হওয়াও পিতৃবৎসলা কন্যার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এখনকার ন্যায় সেই প্রাচীন সময়েও পিতা মাতা কন্যাকে রত্নালঙ্কারভূষিতা করিয়া সম্প্রদান করিতেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বিবাহ সম্বন্ধীয় আচার এবং স্বামিস্ত্রী প্রতিজ্ঞা বন্ধন সর্ব্বপ্রকারে বিবাহোচিত বলিয়া বোধ হয়। যে প্রণালীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত, ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ মণ্ডল (৮৫ সূক্ত) হইতে তাহার মনোহর বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকবর্গ প্রথম ঋকে দেখিবেন যে, অস্বাভাবিক বাল্যবিবাহ প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। পরন্তু কন্যাদের যৌবন উপস্থিত হইলে বিবাহ হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। "২১। হে বিশ্ববসু (বিবাহের দেবতা)! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্ববসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন কর*; সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও। ২২। হে বিশ্ববসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কারদ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামি-সংসর্গিনী করিয়া দাও। ২৩। যে সকল পথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়। অর্য্যমা এবং ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ! পতিপত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়। ২৪। হে কন্যা! সুন্দর মূর্ত্তিধারী সূর্য্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আধারস্থানস্বরূপ, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি। ২৫। এই নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে।† ২৬। (হে কন্যা) পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এ স্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভুত্ব কর। ২৭। এই স্থানে সন্তানসন্ততি লাভ করিয়া তোমার প্রীতি লাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর। ৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস, এ সৌভাগ্যবতী অর্থাৎ স্বামীর প্রিয়পাত্রী হউক, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ

* বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিবাহ হইয়া গেলে তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না।

† অর্থাৎ পিতৃকুল হইতে মোচন করিয়া স্বামিকুলে গ্রথিত করিলাম।

নিজ গৃহে প্রতিগমন কর। ৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। যে ব্রহ্মনামা ঋত্বিক বিদ্বান,সে বধূর বস্ত্র পাইতে পারে (১) ৩৯। অগ্নি, লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনিতাকে প্রদান করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবে। ৪০। (হে কন্যা) প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্য সন্তান তোমার চতুর্থ পতি। (২) ৪১। (বর বলিতেছেন) সোম সেই নারী গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধন-পুত্রসমেত এই নারী আমাকে দিলেন। (৩) ৪১। হে বরবধূ! তোমরা এই স্থানেই উভয়েথাক, পরস্পর পৃথক হইও না ; নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে আসিয়া পুত্রপৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর। ৪৩। (বরবধূ বলিতেছেন) প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্য্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলন করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাসদাসী এবং পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। ৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও, পশুদিগের মঙ্গল-কারিণী হও ; তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্র-প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাসদাসী ও পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। ৪৫। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশপুত্র সংস্থাপন কর। পতিকে লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর। ৪৬। বধূর প্রতি) তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশকর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও। ৪৭। (বরবধূ বলিতেছেন) তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয় মিলিত করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।"

উদাহরণটী সুদীর্ঘ হইলেও পাঠকের পক্ষে তাহা বিরক্তিকর হইবে না। বিবাহ দিনে যে সমুচিত আচার ব্যবহার হইত, এবং যুবতী নববধূ স্বামি-গৃহে ও স্বামি-হৃদয়ে যে অধিকার প্রাপ্ত হইতেন, এই মন্ত্র হইতে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি।

অপরাপর জাতি এবং আপরাপর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রাচীন সময়ে হিন্দু রাজা ও ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সপত্নী বিদ্বেষ বহু বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল ; এবং ঋগ্বেদের শেষভাগে দশমমণ্ডলের ১৪৫ ও ১৫৯ সূক্তে স্ত্রীরা সপত্নীদিগকে অভি-সম্পাত করিতেছেন,তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ ভাগে এই কুপ্রথা প্রবল হইয়া থাকিবে, কারণ প্রথম নয় মণ্ডলে কদাচিৎ বহু বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) ঋকবেদের সময়ে আচার এই ছিল। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সেই বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।

(২) মনুষ্য জীবনের সীমা ঋগ্বেদের শতবৎসর বর্ষ। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে। সহস্র বৎসর ঋষিদের পরমায়ুর গল্প পৌরাণিক সময়কার সৃষ্টি।

(৩) কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত।

দশম মণ্ডলের ১৬২, ১৮৩, ও ১৮৪ সূক্তে গর্ভাধানের উল্লেখ আছে। ৫।৭৮।৭ ঋকে জাত কর্ম্মের কথা রহিয়াছে। ৩।৩১ সূক্তে উত্তরাধিকারের বিধি সম্বন্ধে যে দুইটী ঋক্ আছে, তাহা আজ গুরুতর বিবেচনায় এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি "১। পুত্রহীন পিতা রেতোধা জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসন ক্রমে দুহিতাজাত পৌত্রের নিকট গমন করে। (অপুত্র) পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে বিশ্বাস করতঃ প্রসন্ন মনে শরীর ধারণ করে। * ২। ঔরস পুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেয় না। তিনি উহাকে বিবাহ দিবেন। যদি পিতা মাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া কর্ম্ম করেন, এবং অন্য সম্মানিতা।" তৃতীয় মণ্ডলের ৩১ সূক্ত।

হিন্দুদিগের দায়ভাগের এই প্রথম অঙ্কুর। পুত্র ও কন্যা উভয় বর্ত্তমানে পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, আর পুত্রাভাবে দৌহিত্র অধিকারী। দেখিতে নিম্নোদ্ধৃত ঋকে দত্তক গ্রহণ করিবার সূত্রপাত পাওয়া যায়। "৭। অঋণী ব্যক্তির ধন পর্য্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্যধনের পতি হইব। হে অগ্নি। যেন অপত্য 'অন্যজাত' না হয়। অবেত্তার পথ জানিও না। ৮। অন্যজাত পুত্র সুখকর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে বা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে। অতএব অন্নবান্ শত্রু নাশক নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন করুক।" সপ্তম মণ্ডল ৪র্থ সূক্ত।

এই পরিচ্ছেদে বিবাহ ও দায়ভাগের কথা লিখিয়াছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা আনুষঙ্গিক হইবে না। ঋগ্বেদের যম নরকের দেবতা নহেন, তিনি ন্যায়বান্ ব্যক্তিদের স্বর্গের দেবতা, এবং মৃত্যুর পরে সৎ লোকের পুরস্কার দাতা। দশম মণ্ডলের ১৪ সূক্ত হইতে কতিপয় ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি—"৭। (যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি) আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পথ দিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা যম আর অরুণ, তাঁহারা সুধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর। ৮। সেই চমৎকার স্বর্গধাম পিতৃলোকের সঙ্গে মিলিত হও, ও যমের সহিতও ধর্ম্মানুষ্ঠান ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর। ৯। (শ্মশানদাহ কালে উক্তি) হে ভূত প্রেতগণ! দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবা দ্বারা, জল দ্বারা, আলোক দ্বারা শোভিত। যম এই স্থান মৃত ব্যক্তিকে দিয়া থাকেন। ১০। হে মৃত! এই যে দুই [যম দ্বারবর্ত্তী] কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র, ইহাদের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর। ১১। হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর

*পূর্ব্বকালে পুত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত যে, ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হইবে। কন্যার পুত্র দৌহিত্র হইয়াও পৌত্রের কার্য্য করিবে।

আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে, যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজা! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।'" বৈদিক যুগে পরকালের সুখসম্বন্ধে লোকের যে প্রকার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল, পূর্ব্ব উদ্ধৃত সূক্ত হইতে তাহা জানা যাইতেছে।

প্রাচীনকালে মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাধি করিত, এমন কথা কোন্ কোন্ মন্ত্রে পাওয়া যায়? "১০। হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর। ইনি সর্ব্বব্যাপিনী। ইহার আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে রাশাকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ। ইনি যেন নিঋতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন। হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাঁকে পীড়া দিও না। ইহাঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর। ১২। পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপ অবস্থিতি করুন। সহস্র ধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক। প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হউক।" দশম মণ্ডল ১৮ সূক্ত।

বৈদিকযুগে যে শবদাহ করা হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়—"হে অগ্নি! এই মৃত ব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও না। ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই ইহাঁকে ইহলোকের নিকট পাঠাইয়া দাও।"১০।১৬।১

দশম মণ্ডলের ১৮ মন্ত্রে বিধবা বিবাহ বিধেয়, তৎসম্বন্ধে যে সুবিখ্যাত দুইটী ঋক্ রহিয়াছে, এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "৮ হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল! গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু হইয়াছে, চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছেন এবং বিবাহ করিতে প্রস্তুত, সেই পতির পত্নী হও।"

সায়নাচার্য্য তৈত্তিরিয়া আরণ্যকে এই ঋক উদ্ধৃত করিয়া তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাহার অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম। উক্তস্থলে যে দিধীষু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় তাহার একভিন্ন দুই অর্থ নাই—স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় স্বামীকে "দিধীষু" বলে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহাপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের এক প্রবন্ধের শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "বৈদিকযুগে যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক অকাট্য যুক্তি ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অতি প্রাচীন সময় হইতে বিধবাবিবাহকারী পুরুষকে "দিধীষু", দ্বিতয়-পতি বিবাহকারিণী বিধবাকে পরপূর্ব্বা, এবং বিধবার দ্বিতীয়-পতির ঔরসজাত পুত্রকে 'পৌনর্ভব' বলে। এই সকল প্রমাণই যথেষ্ট।"

নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার সহিত উপসংহারকালে আমরা এই সূক্তের অন্যতম ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। এই ঋকের কোন্

অপরাধ নাই; কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন ও দুষ্ট অর্থ কল্পনা করিয়া সতীদাহ নামক বিধবা দাহ-প্রথার সমর্থন চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথা ঋগ্বেদ সম্মত কার্য্য নহে। ১০।১৮।৭ ঋকটী এস্থানে অনুবাদ করিতেছি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর গৃহস্থ নারীগণের পুনরায় গৃহে আসিবার কথা বলিয়াছে মাত্র। "এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রু পাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম বস্ত্র ধারণ করিয়া (সকলের) অগ্রে আগমন করুন।"

মূলে "আরো হন্তু জনয়ঃ যোনিমগ্রে" আছে। বিধবা দাহের কথা কুত্রাপি নাই। উদ্ধৃত ঋকের শেষোক্ত "অগ্রে" শব্দকে "অগ্নে;" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া, মূলের পরিবর্ত্তন এবং কদর্য্য কল্পনা পূর্ব্বক বাঙ্গালা-দেশের পণ্ডিতেরা জঘন্য বিধবাদাহ প্রথার সমর্থন চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপথাগুলি সংরক্ষণার্থ কপট ব্যবসায়িগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অন্যথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

সরস্বতীপূজা। (১)

এক সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আমরা মাটির সরস্বতী পূজা করি কেন? এ দেশে কি এইরূপই সরস্বতীর পূজা হইত? আমি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলাম,—না মহাশয়। এই ভারতভূমি যত দিন প্রকৃত সারস্বত আশ্রম ছিল, তত দিন ভগবতী মৃণ্ময়ী ছিলেন না, চিন্ময়ী ছিলেন। যতদিন মা সরস্বতী,—

"পুণ্যদা পুণ্যজননী পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী।
পুণ্যবদ্ভির্নিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং সদা।
তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী।
কৃতপাপেন্ধদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী।
জ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে মগ্নং যৈর্মানবৈর্ভুবি।
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি॥"

পুণ্যদাত্রী, পুণ্যজননী ও পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী ছিলেন, যত দিন মা পুণ্যাত্মা সাধুগণের আরাধ্যা ও স্থিতিরূপিণী ছিলেন, যত দিন তিনি তপস্বিগণের তপস্যারূপিণী ও তপস্যার মূলপ্রকৃতি ছিলেন, তত দিন ভারতবর্ষে তাঁহার চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির পূজা হইত, ভক্তগণ সেই জ্বলদগ্নিরূপিণী ব্রহ্ম-ময়ীর তেজঃপ্রভায় তৃণকাষ্ঠের ন্যায় সমস্ত কলুষরাশি দগ্ধ করিত; সেই জ্ঞানময় সরস্বতী-সলিলে নিমগ্ন হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন-

(১) এ প্রস্তাবে যে সকল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পাষণ্ডগণেরই পক্ষে, আর যাঁহারা ভক্তিভাবে বিদ্যাদেবীর পূজা করিয়া থাকেন, সেই পূজনীয় আচার্য্যগণ আমাদের পরমারাধ্য গুরু।

পূর্ব্বক অনন্তকালের জন্য শ্রীহরির সহবাস লাভ করিত। ক্রমে অদৃষ্টচক্রে ভারতবর্ষ সারস্বত আশ্রম ঘুচিয়া পাষণ্ড-ভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল, মা সরস্বতীও আমাদের দুর্দ্দশা ভাবিয়া ভাবিয়া 'মাটি' হইলেন, তাই আমরা এক্ষণে মাটির সরস্বতী পূজা করিয়া থাকি।

খ্যাতনামা স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের দারুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥"

এক ভার্য্যা স্বভাবত বড়ই প্রবলা,
আর ভার্য্যা স্বভাবত বড়ই চপলা;
পুত্র এক বিশ্বজয়ী দুরন্ত মদন,
সমুদ্রে সর্পের শয্যা, বিহঙ্গ বাহন; (২)
এ সব ঘরের দুঃখ দিবা বিভাবরী,
ভাবিয়া ভাবিয়া কাষ্ঠ হয়েছেন হরি।

এইরূপে আমাদের হাতে পড়িয়া সকল দেবতাই মাটি হইয়াছেন, কেহ কাষ্ঠ হইয়াছেন, কেহ বা পাথর হইয়াছেন।

ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছিলেন,—

তুলসী পিঁদনে হরি মেলে তো,
মের্ পেঁদে কুঁদা আউর্ ঝাড়্;
পাথর্ পূজনে হরি মেলে তো,
মেয়্ পূজে পাহাড়্" ॥

"কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা"

পূজার পরদিনেই আমরা মা সরস্বতীকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকি; এটা মড়ার উপর খাড়ার ঘা, কেন না আমরা বহুকাল হইতেই মাকে অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছেন; তিনিই বৎসর বৎসর মৃণ্ময়ীরূপে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের টোলে আসিয়া দর্শনী কুড়াইয়া থাকেন। পূজার পরদিনেই ভোঁ ভাঁ, কা কস্য পরিদেবনা, টোলে আর সন্ধ্যা দেওয়া হয় না। স্থানভ্রষ্ট শৃগাল, কুক্কুর ও বিড়াল প্রভৃতিরা পুনরায় আসিয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করে। ঐ সকল কৃতজ্ঞ জন্তুরাই আশ্রয়দাতা ভট্টাচার্য্যদিগের নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করে, 'যজন' 'যাজন' 'অধ্যয়ন' 'অধ্যাপন' ও 'দান' প্রকারান্তরে উহারাই সম্পন্ন করে, ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে কেবল 'প্রতিগ্রহ' কার্য্যটি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্যেরা অতি দয়ালু, বৎসরের মধ্যে একটি দিন মাত্র ঐ সকল জন্তুর আশ্রমপীড়া উৎপাদন করেন।

আমাদের পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পঠদ্দশায় অধ্যাপকের অনুরোধে মৃণ্ময়ী সরস্বতীর একটি স্তব লিখিয়াছিলেন। সত্যপ্রিয় সুরসিক অধ্যাপক ঐ সুমিষ্ট স্তবটি দেখিয়া আমোদ করিয়াছিলেন। স্তবটি এই,—

মৃণ্ময়ী সরস্বতীর স্তব।

"লুচী-কচুরী-মতিচুর-শোভিতম্
জিলেপি-সন্দেশ-গজা-বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্॥"

কিন্তু সেই ফলারইবা এখন কোথায়?

(২) 'স্বভাবত বড়ই প্রবলা' ভার্য্যাটি সরস্বতী; 'স্বভাবত বড়ই চপলা' ভার্য্যাটি লক্ষ্মীঠাকুরাণী, ইনি কোথাও স্থির থাকিতে পারেন না। জগন্নাথ অর্থাৎ নারায়ণের এই দুইটি ভার্য্যা। বিহঙ্গ অর্থাৎ গরুড়-পক্ষী ইঁহার বাহন। শিবের ভাগ্যে তবু একটা ষাঁড় জুটিয়াছিল, কিন্তু ইঁহার ভাগ্যে একটা চতুষ্পদও জুটে নাই।

লুচি মুচির বাড়ী পাইলেও খাই; কচুরি চুরি করিতেও রাজি আছি; মতিচুর প্রচুর খাইলেও আশ মিটে না; এ ক্ষুদ্র লিপি জিলিপির মহিমা কি বর্ণিবে? সন্দেশে দ্বেষ কোনও কালেই নাই; বলিতে কি, পেটে ঠাঁই না হইলেও মিঠাই খাইতে পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু পাই কোথা? এখনকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যে দর্শনীটি হস্তগত করিয়াই বিদায় করেন। তুমি নিমন্ত্রণে যাও আর নাই যাও, দর্শনীটি কিন্তু তোমাকে দিতেই হইবে, বরং নীলের দাদন হইতে পরিত্রাণ আছে, কিন্তু পূজার দর্শনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।

বঙ্গদেশে কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে এরূপ দুর্দ্দশা ছিল না; নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সকলই তাহার সাক্ষী। এস্থলে তৎকালের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপে রামনারায়ণ নামে এক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রম-কুটীরের (৩) চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল থাকায় তাঁহাকে সকলে 'বুনো রামনারাণ' বলিত। পণ্ডিতকুলজীবন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্যগণের কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্বচক্ষে তাঁহাদের অধ্যাপনাকার্য্য দেখিয়া গুণোচিত দানে মানে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া আসিতেন। তিনি একদিন বুনো রামনারায়ণের গৃহে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীর বহিঃ প্রাঙ্গণে ছাত্রমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপনায় এরূপ উন্মত্ত যে, সম্মুখে স্বয়ং পৃথ্বীপতি আসিয়া দণ্ডায়মান, তাঁহার উদ্বোধই নাই, তিনি তখন বাহ্য নেত্র নিমীলিত করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। রাজা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার পদপ্রান্তে গিয়া প্রণাম করিলে, তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা তাঁহার অধ্যাপনা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া পুরস্কার দিবার মানসে জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! আপনার কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি আছে? রাজার অভিপ্রায় এই যে, সাংসারিক কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি অর্থাৎ অভাব থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করেন। কিন্তু

(৩) 'কুটীর' শব্দে কুঁড়ে ঘর। একালে 'কুটীর' বলিলে আর কুঁড়ে বুঝায় না। এখন অভিধান উল্টাইয়াছে, এখন 'কুটীর' শব্দে অট্টালিকা; যথা,—'কমল কুটীর', 'শান্তি-কুটীর' 'আর্য্যকুটীর' প্রভৃতি। যদি এখন আচার্য্যদিগের বেশভূষা হ্যাটকোট হয়, তবে তাঁহাদের কুটীর সাহেবী বাড়ী না হইবে কেন? পূর্ব্বকালে আচার্য্যেরা কিন্তু ঐশ্বর্য্যভোগে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। যে চাণক্যের ভ্রূকুটীমাত্রেই পৃথিবীর রাজারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, যিনি নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সার্ব্বভৌমপদে স্থাপন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বেসর্ব্বা মন্ত্রীর নিজগৃহের ঐশ্বর্য্য দেখ। কঞ্চুকী চাণক্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া মনে মনে কহিলেন, আহা! এই রাজাধিরাজের মন্ত্রী মহাশয়ের গৃহের কি ঐশ্বর্য্য!!

"উপলশকলমেতদ্ ভেদকং গোময়ানাম্
বটুভিরুপহৃতানাং বর্হিষাং কূটমেতৎ।
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমাণাভিরাভিঃ
বিনমিতপটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্॥"

শুষ্ক গোময় ভাঙ্গিবার জন্য এই প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে; দ্বিজবালকগণের আনীত এই স্তূপাকার কুশ পড়িয়া আছে; ঘরের দেওয়ালটি জীর্ণ হইয়াছে; চালের উপর যজ্ঞকাষ্ঠসকল শুকাইতে দেওয়ায় তাহার ভারে চালের ধারগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

(মুদ্রারাক্ষস)

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি অন্য দিকে, তিনি শাস্ত্রই ভাবিতেছিলেন, উত্তর করিলেন,—হাঁ মহারাজ! আমার পঠদ্দশায় অধীতশাস্ত্রের অনেক স্থলে অসঙ্গতি ছিল বটে, কিন্তু ক্রমাগত সেই সকল বিষয়ের চিন্তা ও অনুশীলন করায়, এক্ষণে আর কোনও স্থলে অসঙ্গতি নাই, যাহা পূর্ব্বে অসঙ্গত বোধ হইত, তাহা এক্ষণে বিশদ হইয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক বিষয়ে কি কোনও অভাব আছে? ভট্টাচার্য্য তখন গদগদকণ্ঠে কহিলেন, আমার আবার অভাব! মহারাজের দত্ত যে নিষ্কর ব্রহ্মত্র আছে, তাহা হইতেই আমার স্বচ্ছন্দে জীবিকা চলে। যে ধান্য পাই, আমার গৃহিণী তাহা স্বহস্তে কণ্ডন ও রন্ধন করিয়া উপাদেয় অন্ন প্রস্তুত করেন। গৃহিণী প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিবার সময় বাটীর পার্শ্বস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষ (তেঁতুলগাছ) হইতে পত্র চয়ন করিয়া আনেন, এবং তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব জুষ (ঝোল) প্রস্তুত করেন। আহা! সেই অন্নব্যঞ্জন অমৃত! অমৃত! অমৃত! আমি, গৃহিণী ও আমার এই ছাত্রগণ তাহা পরমানন্দে ভোজন করি; এবং পুলকিত হইয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করি!

হায় রে! সে শাস্ত্রচর্চ্চা, সে সরস্বতীপূজা কি এদেশে আর হইবে? সে জ্ঞানবুভুক্ষা, সে তন্ময়তা, সে আত্মবিস্মৃতি কি আর দেখিব? "তে হি নো দিবসা গতাঃ" আমাদের সে দিন গিয়াছে।

চিন্ময়ী সরস্বতীর স্তব।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্বাবিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥১॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং পরম্।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ ॥২॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥৩॥
হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমোনমঃ ॥৪॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥৫॥
যয়া বিনাত্র সংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ ॥৬॥
ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ ॥৭॥
স্মৃতিশক্তিজ্ঞানশক্তিবুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমোনমঃ ॥৮॥
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা।
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥৯॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা কবীনামিষ্টদেবতা।
সচ্চিদানন্দরূপা চ তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥১০॥

(ইতি যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রম্)

যিনি ব্রহ্মময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, যিনি সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বরী, সেই পরাৎপরা বাগ্‌দেবীকে বারবার নমস্কার। ১। যাঁহার বিহনে এ বিশ্বসংসার জীবন্মৃত হয়, যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই সরস্বতীকে বারবার নমস্কার। ২। যাঁহার অধিষ্ঠান বিনা সমস্ত জগৎ মূক ও উন্মত্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দব্রহ্মের অধিদেবতাকে বারবার নমস্কার। ৩। তুষার, চন্দন, কমল, কুমুদ, কহ্লার ও চন্দ্রমার ন্যায় যিনি মাধুর্য্যময়ী, যিনি বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই অক্ষয়াদেবীকে বারবার নমস্কার। ৪। বিসর্গ, বিন্দু ও মাত্রা প্রভৃতির মধ্যে যাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান, সেই বর্ণমালার অধিদেবতাকে বারবার নমস্কার। ৫। যাঁহার বিহনে কিছুরই সংখ্যা করা যায় না, কিছুরই ইয়ত্তা হয় না, সেই কালরূপিণী সংখ্যারূপিণী পরম

দেবতাকে বারবার নমস্কার। ৬। যিনি নিখিল বাঙ্ময়ের ব্যাখ্যাস্বরূপা এবং নিখিল ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সমস্ত ভ্রান্তিজালের সিদ্ধান্তস্বরূপা, সেই দেবীকে বারবার নমস্কার। ৭। যিনি স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি, যিনি প্রতিভা ও কল্পনাশক্তি, সেই মহাশক্তিকে বারবার নমস্কার। ৮। যিনি সমস্ত শ্রুতি ও সমস্ত শাস্ত্রের সর্ব্বোপরি বিরাজমানা, প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই বাণীকে বারবার নমস্কার। ৯। যিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ী, কবিকুলের ইষ্টদেবতা, সচ্চিদানন্দরূপিণী, সেই বীণাপাণিকে বারবার নমস্কার। ১০।

কস্যচিৎ

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

(চতুর্থ প্রস্তাব)

রাজা আদিশূর।

সেন রাজগণের পূর্ব্বতন কালে পূর্ব্ববঙ্গে আদিশূর নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা অভ্যুদিত হন। জনপ্রবাদের নির্দ্দেশ অনুসারে, রামপাল নগরীতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বপ্রকাশিত সংস্কৃত বেনীসংহার নাটকের ভূমিকায় পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সর্ব্বপ্রথম এই বিষয় প্রচারিত করেন। তিনি কোন্ সময় কিভাবে কোথা হইতে আগমন করেন, বা তাঁহার শাসিত রাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল,—আজিও তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে মীমাংসিত হয় নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদের মত সংগৃহীত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব এবং আমাদের নিকট যে মত অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিব।

যদিও মহারাজা আদিশূরের সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে, যদিও তাঁহার আবির্ভাব কাল-সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কোন সময় নির্দ্দেশ করা যায় না, যদিও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোনও কথা জানা যায় নাই, যদিও পাল ও সেন রাজবংশের ন্যায় তাঁহার নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা, প্রস্তর-লিপি বা তাম্রশাসন এই সময় পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই—তথাপি প্রাচীন প্রবাদও কুলজী লেখকদিগের মত অনুসারে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আদিশূরের অভ্যুত্থানে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি সংঘটিত হয়। প্রবল ধর্ম্মবিপ্লব আদিশূরকে বঙ্গের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ বাঙ্গলার শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিল। আদিশূরের অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উন্মূলনের সবিশেষ চেষ্টা করে। তিনি গৌড় (পশ্চিম বাঙ্গালা) ও বঙ্গ (পূর্ব্ববাঙ্গালা) এই উভয় অঞ্চলেই আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে সক্ষম হইয়া-

ছিলেন কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিবার কোনও উপায় নাই। গৌড়ের অন্তর্গত বরেন্দ্র অঞ্চলে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত না হইলে, জনপ্রবাদ অনুসারে তিনি বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে তথায় স্থাপিত করিতে পারিতেন না। আদিশূর শব্দটী নাম কি উপাধি, তাহাও নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। ইহা নামবাচক শব্দ না হইয়া উপাধিবাচক হওয়াই সম্ভবপর।

আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সহায় ও আশ্রয়-দাতা প্রবল-পরাক্রান্ত কান্যকুব্জপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া বঙ্গে পাঁচজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহচর পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। কান্যকুব্জ হইতে আনীত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই বঙ্গদেশীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ। কুলজীকারদিগের মধ্যে এই ঘটনার কারণ-সম্বন্ধে বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের "আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে চারিটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই স্থলে লিখিত হইল। আদিশূরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে পশ্চাৎ কৈলাস বাবুর প্রবন্ধের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(১) আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে উৎসাহ অভাবে বাঙ্গলায় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে। (২) রাজপ্রাসাদের উপরি গৃধ্রপাত ও রাজ্যে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবোৎপাতের শান্তি কামনায় যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে রাজার সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। (৩) তিনি কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন, এবং রাজ্ঞীর চান্দ্রায়ণব্রত নিষ্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ অসমর্থ হইলে রাজা পত্নীর অনুরোধে সদ্বিদ্বান বেদ-বিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণের নিমিত্ত কনোজপতি বীরসিংহকে পত্র লিখেন। (৪) কাশীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আদিশূর বারাণসী হইতে করস্বরূপ পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। (৫) পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কাম্বোজ (ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তরস্থিতগান্ধার) হইতে আনীত হয়। এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে আদিশূরের সময়ে হিন্দুধর্ম্মের আদিম বাসস্থল উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে একদল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আগমন করিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হয়।

সভৃত্য ব্রাহ্মণগণ রাজধানী রামপালে উপনীত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে বহু সম্মাননা করেন এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও চটগ্রাম নামক পাঁচটী গ্রামে তাঁহাদের বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গলার আদিম নিবাসী "সপ্তশতী" ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহ করিয়া যে পাঁচটী সন্তান লাভ করেন, তাঁহারাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ। কিছুকাল পরে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের স্বদেশীয়া পত্নীগণের গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করিলে, আদিশূর তাঁহাদিগকে বরেন্দ্রদেশে সংস্থাপিত করেন। ইহাদের সন্তানগণই বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী ঘটকচূড়ামণি

দেবীবরের মতে ক্ষিতীশ (শাণ্ডিল্যগোত্রজ), সুধানিধি (কাশ্যপগোত্রজ), বীতরাগ (বাৎস্যগোত্রজ), তিথিমেধা (ভরদ্বাজগোত্রজ), সৌভরি (সাবর্ণগোত্রজ)—এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আগমন করেন। কুলজীগ্রন্থ 'কুলরাম' প্রণেতা বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই পঞ্চগোত্রজ পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্র ও ভৃত্যসহ ৯৫৪ শকাব্দে (১০৩২ খ্রীঃ) কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। নবদ্বীপের রাজবংশের ইতিহাস 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' মতে ৯৯৯ শকাব্দে (১০৭৭ খ্রীঃ) এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ (রাঢ়ীয়) ও দামোদর (বারেন্দ্র), সুধানিধির পুত্র ছান্দড় (রাঢ়ীয়) ও ধরাধর (বারেন্দ্র), বীতরাগের পুত্র দক্ষ (রাঢ়ীয়) ও সুষেণ (বারেন্দ্র), তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ (রাঢ়ীয়) ও গৌতম (বারেন্দ্র), এবং সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ (রাঢ়ীয়) ও পরাশর (বারেন্দ্র) হইতে যথাক্রমে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রকুল উদ্ভূত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ উভয়েই সুকবি ছিলেন। ভট্টনারায়ণ "বেনীসংহার" নাটক এবং শ্রীহর্ষ "নৈষধচরিত" নামে মহাকাব্য ও "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" নামে দর্শনশাস্ত্রীয় ছয় প্রধান দর্শনের সমালোচনা পুস্তক রচনা করেন। এইরূপে আদিশূরের রাজত্বকালে পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর সমাজবিপ্লব সংঘটিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সবিশেষ চর্চা আরম্ভ হয়, বাঙ্গলাদেশের ভাষা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইতে থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এই সর্ব্ববিধ বিপ্লব কালক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়। তাঁহারই সময়ে সমাজপতি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গে আনীত হইয়া বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সমাজবন্ধনের সূত্রপাত করেন। যে রাজা এই সকল বিপ্লবের সূত্রপাত করেন, তিনি অবশ্যই অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ (সৌকালিন গোত্রজ), দশরথ বসু (গৌতমগোত্রজ), কালিদাস মিত্র (বিশ্বামিত্রগোত্রজ), বিরাট গুহ (কাশ্যপগোত্রজ), ও পুরুষোত্তম দত্ত (মৌদ্গল্যগোত্রজ) নামে কায়স্থদিগের পঞ্চ সমাজপতি পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ বঙ্গজ কায়স্থ নামে পরিচিত। তাঁহাদের একশাখা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দক্ষিণরাঢ়ে গিয়া কালক্রমে বসতি করিতে থাকেন, তাঁহারাই দক্ষিণরাঢ়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কায়স্থগণ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী, এই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, আদিশূরের রাজধানী যে রামপালে ছিল, প্রকারান্তরে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে।

মহারাজ আদিশূরের সম্পর্কে প্রচলিত জনপ্রবাদ ও কুলজীগ্রন্থ লেখকদিগের বিভিন্ন মত হইতে কি পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুমান বলে পাওয়া যাইতে পারে, সংক্ষেপে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। 'সম্বন্ধনির্ণয়' নামক বংশাবলীর বিবরণ পুস্তকে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বরেন্দ্রদেশীয় একটী প্রবাদ অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, আদিশূরের পর তাঁহার পুত্র ভূসুর, তদনন্তর ভূসুরের দৌহিত্র অশোক সেন, সুরসেন ও বীরসেন ক্রমান্বয়ে বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। এই প্রবাদ তিনি মুরসিদাবাদের কোন কুলজ্ঞ ঘটকের নিকট অবগত হন বলিয়া ডাক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের নিকট প্রকাশ

করেন। লেখকচূড়ামণি বঙ্কিম বাবুর কোন আত্মীয়ের দ্বারা সম্পাদিত "ভ্রমর" নামে এক খানি মাসিক পত্রিকায় আদিশূর ও তাঁহার বংশধরগণের নামের একটী তালিকা বাহির হইয়াছিল, তাহা লেখকের স্বকপোল-কল্পিত বা সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুলফাজলের রচিত "আইনি আকবরি' কি অন্য কোন পুস্তক হইতে গৃহীত—এই সম্পর্কে কোনও কথা তথায় লিখিত ছিল না। আদিশূরের বংশধরদিগের অন্য কোন বৃত্তান্ত আমরা জানি না। বাবু পার্ব্বতীশঙ্কর রায়ের প্রণীত 'আদিশূর ও বল্লাল সেন' নামক পুস্তকে প্রচলিত কিংবদন্তীর বিবরণাদি ভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে কি না, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

এক্ষণে আমরা আদিশূরের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। পণ্ডিতকুলতিলক ডাক্তর রাজেন্দ্র মিত্রের মত, ডাক্তর হার-নলির 'শতাব্দী সমালোচন' নামক কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটীর শতবার্ষিকী কার্য্যবিবরণী পুস্তকে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উৎকৃষ্ট 'বাঙ্গলার ইতিহাসে,' ও শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্তের ও রজনীকান্ত গুপ্তের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' পরিগৃহীত হইয়াছে। এই মত এতদূর সুপ্রচলিত হইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপ-হাসাস্পদ হইব বলিয়া শঙ্কিত হইতেছি। এই অভিমত ১৮৭৮ খ্রীঃ ডাক্তর মিত্র কর্ত্তৃক 'পাল ও সেন রাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক পণ্ডিতগণ তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ পুরঃসর সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়াছেন। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ ডাক্তর মিত্রের মতের তথ্যাতথ্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীন গবেষণার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ প্রশংসার কাজ করিয়াছেন। আমরা যত দিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান কার্য্যে বিজ্ঞলোকের মত স্বাধীনভাবে, ধীরতা, গাম্ভীর্য্য, বিনয় ও সুযুক্তির সহিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া অভ্রান্ত বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে থাকিব, যত দিন পর্য্যন্ত যথোচিতরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া অন্যের গ্রন্থ হইতে অপহরণ অথবা কোন অনুবাদ ও অনুকরণ মাত্রে আমাদের ইতিহাস আলোচনা নিবদ্ধ থাকিবে,—তত দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রকৃত ইতিহাসের জন্ম এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানের উৎপত্তি ও সমাদর অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। দাম্ভিকতা, বাগাড়ম্বর; বৃথা আস্ফালন, সুযোগমতে বহুভাষাধিকারের পরিচয় প্রদান, স্বকীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনার্থ অন্যায়রূপে অন্যকে তৎকৃত ভ্রমের জন্য আক্রমণ, কঠোর ও নির্দ্দয় ভাবে লেখনী সঞ্চালন প্রভৃতি বহু দোষ কৈলাস বাবুর লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া তিনি যে সত্যানুরাগ ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করি। যথা-যোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বথা সমর্থ ও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারের উদ্যমকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা না করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা

হয়। ইতিহাস লেখকের পক্ষে সত্যানুরাগ, অপক্ষপাত, নিরহঙ্কার, সরলতা, সমদর্শিতা ও সুযুক্তিপ্রিয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতি কথায় নিজের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য, অহম্মুখতা ও কপটতা প্রদর্শনের চেষ্টা না পাইয়া, অভিমানশূন্য চিত্তে তাহার সমস্ত প্রমাণ যথাযথরূপে একত্র সংগৃহীত করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। অপর পক্ষের মত অকাট্য প্রমাণ ও সুদৃঢ় যুক্তিতর্কের বলে খণ্ডন করিয়া ধীরভাবে স্বমতের পরিপোষক যাবতীয় প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক নিজের মত সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিচারকের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষের অযথা নিন্দা কুৎসা প্রকাশ দ্বারা স্বীয় পদের অবমাননার সহিত ইতিহাসের গৌরব ও মাহাত্ম্য নষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। কঠোর ও নির্দ্দয় ভাবে লেখনী সঞ্চালনে নিরপেক্ষ পাঠকের প্রীতি না জন্মিয়া বরং বিরক্তি জন্মে, এবং প্রতিপাদিত সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা জন্মে। যৎসামান্য ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভিমানে স্ফীত হইয়া, কোনও ভ্রমপূর্ণ মত প্রচারের জন্য বিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ কোনও লেখককে বিদ্রূপ ও উপহাস করা কদাপি উচিত নহে। অনুবাদ ও অনুকরণ এবং পরমুখাপেক্ষিতা ছাড়িয়া কবে আমরা দেশীয় ও বিদেশীয় ইতিহাসের যথোচিত আলোচনাদ্বারা স্বদেশের ইতিহাস পড়িতে ও লিখিতে শিখিব,—কবে আমরা নাটক উপন্যাস, টীকা টিপ্পনী ও বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রণয়নে সমস্ত শক্তি ও বিদ্যা বুদ্ধির নিয়োগে দেশ প্লাবিত না করিয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চায় মনোযোগী হইবেন; কবে এই পতিত জাতি বর্ণ,ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভারতের অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্যের অনুশীলন দ্বারা আত্মবল বিক্রমের পরিচয় পাইয়া বহুশতাব্দীর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে,—কবে এই হতভাগ্য দেশের অধিবাসীগণ স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বিরোধ ভুলিয়া একতার মহামন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ নবজীবন লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে এক বিশাল জাতিতে পরিণত হইবে, এবং এই পতিত জাতির ভাবী সৌভাগ্য ও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কেবল অতীত কালেই যে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যবসিত হয় নাই, জগৎকে তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক জাতীয় জীবনে নবযুগের অবতারণা করিবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণ পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত আদিশূরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদিশূর সেনরাজবংশের সংস্থাপক বীরসেন হইতে অভিন্ন ব্যক্তি। এই বীরসেন বা আদিশূর সম্ভবতঃ ৯৮৬ খ্রীষ্টীয় অব্দে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করেন। সেনবংশের প্রথম রাজা বলিয়া এই বীরসেন বা শূরসেন আদিশূর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বীরসেন ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্র সামন্ত ও হেমন্ত সেনের রাজ্য পূর্ব্ববঙ্গেই নিবদ্ধ ছিল। তদনন্তর বিজয় (সুখ) সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, মাধব সেন, কেশব সেন এবং লাক্ষ্মণেয় (অশোক) সেনের আধিপত্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ

(পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ)

১। গোপাল (৮৫৫-৭৫ খ্রীষ্টীয়াব্দ)
২। ধর্ম্মপাল (৮৭৫-৯৫ খ্রীঃ)
৩। দেবপাল (৮৯৫-৯১৫ খ্রীঃ)
৪। বিগ্রহপাল (প্রথম) (৯১৫-৩৫)
৫। নারায়ণপাল (৯৩৫-৫৫)
৬। রাজ্যপাল (৯৫৫-৭৫)
৭। ——পাল (৯৭৫-৯৫)
৮। বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়) (৯৯৫-১০১৫)
৯। মহীপাল (১০১৫-৪০)
১০। নরপাল (১০৪০-৪৬)

(বিহার)

১০। নয়পাল (১০৪৬)
১১। বিগ্রহপাল (তৃতীয়)
স্থিরপাল
বসন্তপাল
মহেন্দ্রপাল
মদনপাল
গোবিন্দপাল

(সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণ)

(পূর্ব্ব বঙ্গ ও অনুগঙ্গ বঙ্গ)

১। বীরসেন (আদিশূর) (৯৮৬-১০০৬)
২। সামন্তসেন (১০০৬-১০২৬ খৃঃ)
৩। হেমন্তসেন (১০২৬-৪৬)

(সমগ্র বঙ্গদেশ)

৪। বিজয়সেন (১০৪৬-৬৬)
৫। বল্লালসেন (১০৬৬-১১০৬)
৬। লক্ষ্মণসেন (১১০৬-৩৬)
৭। মাধবসেন (১১৩৬-৩৮)
৮। কেশবসেন (১১৩৮-৪২)
৯। অশোক (লাক্ষ্মণেয়)সেন (১১৪২-১২০৫)

(বিক্রমপুর)

১০। বল্লালসেন (দ্বিতীয়)
১১। সুষেণ
১২। সুরসেন

স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ও রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহাদের প্রণীত বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে ডাক্তর মিত্রের এই মতই নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছেন। রজনী বাবু আদিশূরের সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কোনও কথা উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি বিক্রমপুর ও গৌড়ে সেনরাজগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিয়াংসাঙের সময় হইতে সেনরাজগণের সময় পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) উত্তরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও দক্ষিণে সমতট (রামপাল-বিক্রমপুর) এই দুইটী স্থলে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল,গৌড় নগরীতে অথবা রাঢ়দেশের দক্ষিণভাগে কস্মিন কালেও যে প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিন্দু সময়ে বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, এবম্বিধ কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙের ভারতবর্ষে অবস্থান কালে বাঙ্গালার রাজধানী সমতট (রামপাল) সাগর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নৈষধচরিত রচনা কালেও কবিবর শ্রীহর্ষ বাঙ্গলার রাজধানীর অনতিদূরে সমুদ্র দর্শন করেন—কৈলাস বাবু কোথা হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ অনুসারে বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগে সাগর অবস্থিত ছিল।

রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে আদিশূর বা বীরসেনের রাজ্যারম্ভ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ-

ভাগে ঘটে। রমেশ বাবুর মতে বাঙ্গলার পাল রাজবংশ ৮৫০—১১৫০ খ্রীঃ এবং সেনরাজবংশ ১০০০-১২০৪ খ্রীষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সেনবংশের প্রথম রাজা আদিশূর। তাঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন। পক্ষান্তরে ডাক্তর হারনলি অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর নারায়ণ পালের সময়ে (১০০৬-২৬খ্রীঃ) সেনবংশীয় সামন্ত ও হেমন্ত সেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ মতে নারায়ণ পাল বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এদিকে রাজা মহীপালের অধীনে বিহার, বারানসী ও অযোধ্যাতে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল থাকে। রাজা নারায়ণ পালের উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেন বাঙ্গলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিজয়সেনই আদিশূর নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রচলিত কিম্বদন্তীকে অগ্রাহ্য করিয়া আদিশূরের সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে যে অভিনব মত নব্যভারতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার প্রদত্ত যুক্তি ও প্রমাণ নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট না হইয়া থাকিলেও প্রচলিত জনপ্রবাদ ও পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যে নির্ভীকতা ও স্বাধীন গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। বৎসরাজদেব, তাঁহার পিতা দেবশক্তিদেবের মৃত্যুর পর ৭৮০খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮০৫ খ্রীঃ (৭০২-২৭ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে কণোজ রাজ্যের সীমা কাশ্মীর ও মালবদেশ হইতে গৌড় দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, কনোজপতিদিগকে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান নরপতি করিয়া তোলে। ১৮৩৭ খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় নাসিকের এক খানি ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খ্রীঃ) লিখিত তাম্রশাসনের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাষ্ট্রকোটার অধীশ্বর গোবিন্দরাজের পিতা গৌররাজ গৌড়বিজেতা বৎসরাজকে পরাজিত করেন। এই বৎসরাজকে কান্যকুব্জপতি বৎসরাজ দেব হইতে অভিন্ন অনুমান করিয়া আরও কয়েকটী অপ্রামাণিক অনুমানের সাহায্যে কৈলাস বাবু আদিশূর সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কনোজপতি এই বৎসরাজ গৌড় দেশ আক্রমনপূর্ব্বক তত্রত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় রণবিজয়ী কাম্বোজবংশীয় শিবোপাসক হিন্দু সেনাপতিকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কনোজরাজের এই সেনাপতির নামই আদিশূর। কনোজ ও মগধের গুপ্ত সম্রাটগণ উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধ রাজবংশকে দূরীভূত করিয়া নবনিয়োজিত হিন্দুরাজার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও রাজ্য শাসনের নিমিত্ত যেমন ব্রাহ্মণ ও করণ কায়স্থদিগকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন, সেইরূপ বৎসরাজও গৌড় জয় করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আদিশূরের সহিত গৌড়ে প্রেরণ করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই বঙ্গীয় ও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বৎসরাজ শৈব ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশূরও

শৈব হওয়াই সম্ভব। এই দুইটী অনুমানের কোনও প্রমাণ প্রদর্শন কৈলাস বাবু আবশ্যক বোধ করেন নাই। দিনাজপুর জিলার কোনও অজ্ঞাত স্থানের শিবমন্দিরের স্তম্ভোলিপি হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, তাহা আদিশূর বা তাঁহার উত্তর পুরুষ কোন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, অনুমান করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে "কাম্বোজান্বয়েন গৌড়পতিনা" বাক্যাংশ দৃষ্টে বৎসরাজের কল্পিত সেনাপতি আদিশূরকে কাম্বোজবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথেষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কেবল অনুমানের সাহায্যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া, কৈলাস বাবুর প্রবন্ধের সারাংশ এবম্বিধ স্বকপোল কল্পিত কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং লেখকের সমস্ত আয়াস নিষ্ফল করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি ৪৭৯ হইতে ১১১৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত (৫৫৭-১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) কনোজের নৃপতিবর্গের নামমালার যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বীরসিংহ নামে কুলাচার্য্যগণের উল্লিখিত কোনও নাম দৃষ্ট হয় না। এই সম্বন্ধে এত সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনার বক্তব্য শেষ না করিয়া, বা বান্ধব পত্রিকার পাঠককে বরাত না দিয়া, বিস্তৃতভাবে কনোজরাজবংসাবলীর যথোচিত আলোচনা পূর্ব্বক কুলজিলেখকদিগের ভ্রম প্রদর্শন করা উচিত ছিল। হিন্দু শাসনকালে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে কায়স্থজাতি যে হিন্দু রাজন্যবর্গের শাসন সংক্রান্ত প্রধান পদ গুলি অধিকার করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন, কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় প্রধানত (কদাচিৎ দুই এক জন ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য) রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন—আদিশূরের অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে কায়স্থজাতি ভারতের রাজন্যবর্গের প্রধান মন্ত্রী ও মহাসন্ধিবিগ্রহী প্রভৃতি বিশেষ সম্মানিত পদগুলি অধিকার করিয়াছিলেন—রাজসভায় কায়স্থগণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে উপস্থিত থাকিতেন,—বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, স্মৃতি, জীবনচরিত, ইতিহাস, প্রস্তরলিপি, মুদ্রালিপি, কি তাম্রশাসনাদি হইতে বিশিষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই সকল কথার যথার্থতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক পাঠকবর্গের নিকট কায়স্থজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি স্বরচিত প্রবন্ধের অঙ্গহীনতা ও অসম্পূর্ণতা কেন দূরীভূত করেন নাই, বুঝিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, আদিশূর কোথা হইতে আসিয়া গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকার করেন, তৎসম্পর্কে কৈলাস বাবুর প্রদর্শিত যুক্তি ও অনুমান সম্পূর্ণ ও যথেষ্ঠ না হইলেও, আদিশূর ও বীরসেন যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আদিশূরের সময়ে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলপতিরূপে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গলায় উপনিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হন, কুলজিকারদিগের প্রদত্ত বংশাবলী অনুসারে দেখা যায় যে, কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্ত্তক মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের সহিত সেই সমাজপতিদিগের ৮ হইতে ১৫ পুরুষ এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৩৪ হইতে ৩৯ পুরুষ অন্তর হইতেছে। ইহা হইতে কৈলাস বাবু আদিশূরকে বল্লাল সেনের অন্ততঃ ৯ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান সময়ের ৩৮।৩৯ পুরুষ পূর্ব্বতন অনুমান করিয়া, বল্লালের তিন শত বৎসর ও বর্ত্তমান সময়ের এগার শত বৎসর

পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় অব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আদিশূরের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিয়াছেন। এক স্থলে ৯ পুরুষে ৩০০ বৎসর ও অন্যত্র ৩৯ পুরুষে ১৩০০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১১০০ বৎসর কেন গণনা করিতে হইবে, কৈলাস বাবু তাহার যথোপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। কুলজিকারদিগের মতে আদিশূর এক বৌদ্ধ রাজবংশ জয় করিয়া গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, ৬৯৫ শকাব্দে (৭৭৩খ্রীঃ) গৌড়ে এক জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বৌদ্ধ রাজার পরে তাঁহার বিজেতারূপে আদিশূরের আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে। ডাক্তর মিত্র ও হারনলি সাহেব আদিশূরের যে সময় অবধারণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কুলজীকার ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত বংশাবলী হইতে কৈলাস বাবু যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, উহা অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে।

সম্রাট আকবরের প্রিয় বয়স্য ও প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ আবুলফাজল আকবরের সময়ের ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ ও জনপ্রবাদাদি অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সময়ের ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস স্বরচিত 'আইনি আকবরী' গ্রন্থের ভূমিকারূপে লিখিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের বিবরণে বাঙ্গলার যে রাজবংশাবলী প্রদান করেন, তাহাতে আদিশূর ও তাঁহার বংশধরদিগের পর বৌদ্ধ পাল রাজগণের বংশাবলী এবং তদনন্তর বিজয় (সুখ) সেন রাজবংশের স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি যে কেবল স্বকপোলকল্পিত কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যে তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহারও কথায় কোনও কালে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বহু আয়াস ও পরিশ্রমে তিনি যে সকল লিখিত ও প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণ ও জনশ্রুতি অবলম্বনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বৃতান্ত ও রাজবংশাবলী সংগ্রহ করিয়া স্বরচিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা বিভিন্ন জাতির ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ও বিষম রাষ্ট্রবিপ্লবে—ভারতবর্ষের জলবায়ুর দোষে ও মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে—বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। সেই সকল লিখিত ও প্রচলিত বিবরণ এক্ষণে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, মহাত্মা আবলফাজলের ন্যায় অতি উচ্চদরের এক জন ইতিহাস লেখকের কোনও কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত একবারে অগ্রাহ্য বা বিশ্বাসের অযোগ্য বলা যাইতে পারে না। আবুলফাজলের লিখিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অনেক ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু তিনিই ভারতবিজেতা মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংগ্রহে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া যে মহত্ত্ব ও উদারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য এই মহাত্মার নিকট সর্ব্বতোভাবে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যদি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল রাজগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আদিশূর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই অনুমান কোনক্রমে অযৌক্তিক ও অসম্ভব নহে।

কোন কোন কুলজ্ঞ ও কুলজীলেখক জনশ্রুতি অবলম্বনে সেনবংশীয় মহারাজ

বল্লাল সেনকে আদিশূরের দৌহিত্র, কেহ কেহ বা তাঁহাকে আদিশূরের কন্যাকুল হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে এই জনপ্রবাদকে অমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করার কোনও কারণ দেখিতেছি না। আদিশূর ও সেন রাজগণ বিভিন্ন বংশে না জন্মিলে প্রবাদ মতে তাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন ঘটিতে পারিত না।

এই সমস্ত কারণে বীরসেন ও আদিশূর যে অভিন্ন ব্যক্তি, অথবা আদিশূর যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়েশ্বর পাল রাজগণের ১৩০ বৎসরের পরে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—বহুমানাস্পদ ডাক্তর মিত্র মহাশয়ের এই কাল্পনিক মত সুযুক্তির অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে চোলরাজ্যের রাজা কুলোত্তুঙ্গের সেনাপতিরূপে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের বাঙ্গলা অধিকার এবং কনোজের অধীশ্বর বৎসরাজ দেবের সেনাপতিরূপে কাম্বোজবংশীয় আদিশূরের বঙ্গের রাজাসনে অধিষ্ঠান—বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কৈলাস বাবুর এই দুই অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার কোনটাই যথাযোগ্য প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে বোধ হয় না। বিশিষ্ট যুক্তি প্রমাণ ভিন্ন কেবল ব্যক্তিগত অনুমানের উপর কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের * রচিত কায়স্থ-কারিকায় লিখিত আছে, আদিশূরের শাসন কালে পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচ জন কায়স্থ ভিন্ন আরও দ্বাবিংশতি জন কায়স্থ বাঙ্গলায় আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। আদিশূর তাহাদিগের ২৭ জনকে বসতি করিবার জন্য

* প্রায় দুই শত বৎসর গত হইল শাণ্ডিল্য-গোত্রজ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে এই ঘটকচূড়ামণি ধ্রুবানন্দ মিশ্রের জন্ম হয়। তিনি বঙ্গজ কায়স্থদিগের সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আশ্রয়দাতা রাজার আদেশে বঙ্গজ কায়স্থদিগের বংশাবলী সহ বিশেষ বিবরণ এই 'কায়স্থ-কারিকা' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। কৈলাস বাবু "চন্দ্রদ্বীপের আদি রাজবংশ যে বাঙ্গলার সেন রাজ-বংশ হইতে উদ্ভূত—এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ প্রাপ্ত" হইয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার প্রতিশ্রুত ও নব্যভারতের 'ত্রিপুরা রাজ্য' নামক প্রবন্ধের বিজ্ঞাপিত বাঙ্গলার ইতিহাস প্রকাশের পূর্ব্বে তাহা প্রচারিত করিয়া উহার নূতনত্ব বিলোপ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। এই প্রবন্ধ লিখার পর কৈলাস বাবু দনুজমর্দ্দন দেবের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আমরা এস্থলে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব ১৮৭৪খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় বাঙ্গলার 'দ্বাদশ ভৌমিকের' অন্যতম চন্দ্রদ্বীপ পতির যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা লিখিয়া কৈলাস বাবুর অনুমানের কারণ আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, উহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

১২৮০খ্রীঃ সুলতান মঘিস উদ্দিন তোগরলের বিদ্রোহ দমনার্থ দিল্লীশ্বর ঘিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীর অনুসরণক্রমে সোনারগাঁয় উপনীত হইলে, দনুজ রায় সম্রাটের অভ্যর্থনা করিয়া বিদ্রোহীর দমন বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। তুগ্রল যাহাতে পশ্চিমে পলাইয়া না যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রতীকার করিতে সম্রাটের নিকট প্রতিশ্রুত হন। চন্দ্রদ্বীপের অধিকার মেঘনা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে এবম্বিধ অঙ্গীকারের অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। মঘিসউদ্দিন তোগরল সোনারগাঁয় বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রাজধানীতে কোনও হিন্দু নৃপতিকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে দিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণীর উল্লিখিত সোনারগাঁর

২৭ খানি গ্রাম প্রদান করেন। কৈলাস বাবুর প্রবন্ধ হইতে এস্থলে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল। দেবদত্ত ও মহৌজা নাগ, চন্দ্রভানু নাথ, চন্দ্রচূড় দাস, জয়ধর সেন, ভূমিঞ্জয় কর, ভূধর দাস, জয়পাল পাল, চক্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ট কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু

দনুজরায়কে পূর্ব্বোক্ত স্বযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, ডাক্তর ওয়াইজ চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি দনুজমর্দ্দন দে বলিয়া অনুমান করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি বিক্রমপুরবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামক ভগবতীর প্রিয় উপাসক জনৈক অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত সেই সময়ে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। একদা সভৃত্য চন্দ্রশেখর সাগর যাত্রায় বহির্গত হইয়া স্বপ্নাবেশে ভগবতীর সন্দর্শন লাভ করেন। ভগবতীর আদেশে কতিপয় দেবমূর্ত্তি উদ্ধারার্থ চন্দ্রশেখর ভৃত্যকে নৌকার নিকটে সারগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে আজ্ঞা দেন। দুইবারে যে দুইটী প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি দনুজমর্দ্দন প্রভুর আদেশে উত্তোলন করেন, তাহা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ কর্ত্তৃক কুলদেবতারূপে পূজিত হইতেছে। চন্দ্রশেখর ভৃত্যকে কহিলেন যে, 'শীঘ্রই সাগর শুষ্ক হইয়া স্থলে পরিণত হইবে এবং তুমি তথায় রাজা হইবে। আমার নাম অনুসারে এই স্থলের নাম চন্দ্রদ্বীপ রাখিও'। ইহা হইতে চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি হয়।

বর্ত্তমান জিলা বাখরগঞ্জ (সলিমাবাদ পরগণা ভিন্ন) লইয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সংগঠিত হইয়াছিল। আদিশূরের আনীত পঞ্চ প্রধান কায়স্থের আবাসস্থল এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজাগণ বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা দনুজমর্দ্দন খ্রীষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী কচূয়া নামক স্থানে যে চন্দ্রদ্বীপের বহু সম্মানিত রাজবংশের স্থাপন করেন, ঘটকদিগের মতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রদ্বীপে ১৭ জন নরপতি আবির্ভূত হইয়াছেন। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণের ২৩ পুরু[illegible] হইয়াছে বলিয়া ডাক্তর ওয়াইজ ঢাকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে লিখিয়াছেন। জন প্রবাদ মতে দনুজমর্দ্দন দে বিক্রমপুর হইতে আগমন করেন। রাজা বল্লাল সেনের পর তিনি পুনরায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়া কায়স্থ কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ ঘটকদিগের বাসস্থল ইদিলপুরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কুলীন কায়স্থদিগের সম্বন্ধ বন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহের ভার ঘটকদিগের প্রতি অর্পিত হয়। রাজকীয় নিমন্ত্রণে ও সভাতে সমবেত হইয়া সম্মান অনুসারে যে কোন স্থানে উপবেশন করিতে অধিকারী হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া সেই সকল নিয়ম যথাবিহিত মতে পালিত হইতেছে কি না, উহা দেখিবার ভার এক দল কায়স্থের প্রতি প্রদান করেন। আজিও তাহাদের বংশধরগণ রাজা দনুজমর্দ্দনের বিধান অনুসারে ঘটকদিগের ন্যায় কায়স্থসমাজে বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত হইতেছে।

রাজা দনুজমর্দ্দনের পর তাঁহার পুত্র রমাবল্লভ রায় চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। রমাবল্লভের পর তাহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ, তৎপর কৃষ্ণবল্লভের পুত্র জয়দেব রায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার কায়স্থদিগের সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। জয়দেবের সহোদরা কমলা রাজধানী কচুয়াতে যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেব রায়ের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত দিহুরঘাটা নিবাসী বসুবংশজ কুলীন পরমানন্দ রায় মাতুলের রাজ্য ও সমাজপতি পদ প্রাপ্ত হন। আবুলফাজলের 'আইনি আকবরী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৫৮৩ খ্রীঃ ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত হইতে পরমানন্দ রায় সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান। ১৫৭৮ খ্রীঃ আকবরের সেনাপতি মুরাদ খাঁ চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তাহা দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরমানন্দের পর তাঁহার পুত্র জগদানন্দ ও পৌত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় যথাক্রমে চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ ইংরেজ পর্য্যটক রালফফিচ বাকলার রাজা এই কন্দর্প-

সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু অঙ্কুর, লোম-পাদ বিষ্ণু, বিশ্বচেতা আঢ্য, মহীধর নন্দন, সমুদয়ে এই ২২ জন কায়স্থ বঙ্গদেশে উপনীত হন। কোনও যুক্তি কি প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কৈলাস বাবু কিরূপে যে সকল "মিত্র, নাগ, পাল, সেন, দত্ত, বর্দ্ধ নবংশীয় প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত বাঙ্গলার ঐ সকল উপাধিধারী কায়স্থগণের অবশ্যই কোনরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে" বলিয়া অদ্ভুত সিদ্ধান্ত দ্বারা বাঙ্গলার কায়স্থগণের। ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া উঠিলেন,—স্থূল বুদ্ধিতে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইতিহাসের আলোচনায় তাঁহাকে এবম্বিধ কবিকল্পনার আশ্রয় লইতে দেখিয়া, আমাদের ন্যায় 'নব্যভারতের' (অষ্টম খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা) অন্য কোনও স্থূলবুদ্ধি পাঠক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

আবুলফাজলের মতে আদিশূর কায়স্থ ছিলেন। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের উপক্রমণিকায় তাঁহাকে দালভ্য মুনির বংশধর ক্ষত্রিয় জাতীয় কায়স্থ বলা হইয়াছে এবং গিরিধর, পৃথ্বীধর, সৃষ্টিধর, প্রভাকর ও জয়ন্ধর নামে কয়েক জন কাল্পনিক রাজাকে আদিশূর বংশীয় বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। কৈলাস বাবু তাঁহাকে কাম্বোজ বংশীয় ক্ষত্রিয় ও শৈব নরপতি কান্যকুব্জের অধীশ্বর বৎসরাজ দেবের সেনাপতি বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

নারায়ণের সভায় উপস্থিত হন। কন্দর্পনারায়ণ কি তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র রায়ের সময়ে, চট্টগ্রামের পর্ত্তুগিজ ও মগদস্যুদিগের ভীষণ উপদ্রবে কচুয়া হইতে মাধবপাশায় রাজধানী নীত হয়। রামচন্দ্র রায় যশোহরের রাজা সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৫৯৩ খ্রীঃ প্রতাপাদিত্যের রাজা মানসিংহের হস্তে পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার পতিব্রতা তনয়া স্বামী রামচন্দ্র রায়ের দর্শন মানসে পৈতৃক রাজবাটী হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীর আদেশ প্রতীক্ষায় পথিমধ্যে যেস্থলে অবস্থিতি করেন, তথায় সেই ঘটনার চিরস্মারকরূপে যে হাট প্রতিষ্ঠিত হয়, অদ্যাপি তাহা "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণনারায়ণ দুর্দ্দান্ত মগ ও পর্ত্তুগিজদিগের বিরুদ্ধে অনেকানেক যুদ্ধে ঢাকার নবাবকে বিশেষ সাহায্য করেন। কৃষ্ণনারায়ণ স্বীয় কনিষ্ঠভ্রাতা বাসুদেব রায়ের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। বাসুদেবের পৌত্র নিঃসন্তান হওয়াতে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃস্বসার কি মাতুলের পুত্র ঢাকার নিকটবর্ত্তী উলাইলের উদয় নারয়ণ মিত্র মজুমদার চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। মুরসিদাবাদের নবাব তাঁহার সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে উদয় নারায়ণ মুরসিদাবাদে নবাবের আদেশ দ্বন্দ্বযুদ্ধে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য পুনরায় প্রাপ্ত হন। উদয়নারায়ণের পৌত্র জয়নারায়ণ অতি শৈশবে জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার দুরাচার ও বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী শঙ্কর বক্সী ৭ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। তদনন্তর তাঁহার মাতা দুর্গারাণী দেওয়ান গোবিন্দ সিংহের সাহায্যে জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করিয়া নষ্টোদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। জয়নারায়ণের পরবর্ত্তী রাজা নৃসিংহ সৌন্দর্য্যের জন্য বাঙ্গলায় সুবিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু শাসনকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীঃ বাকী খাজানার জন্য জমিদারীর কিয়দংশ বিক্রীত হয়। মাধবপাশার রাজবংশ এক্ষণে সামান্য সিকিমি তালুকদারে পরিণত হইয়া, অতীত গৌরবের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে।

ভালবাসা-কালকূট।

ভালবাসা-কালকূটের কথা আমাকে বলিও না, ভাব তার দাসী, চঞ্চলা নদীর তীরে কলঙ্ক-চন্দন-বৃক্ষমূলে সেই কুসুম-দেহী কোমলাঙ্গীর বাস। সে কালকূট পান করিয়া আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি,—আর আমাকে তার কথা বলিও না। সে না করিতে পারে এমন কাজ নাই,—সে যে কি নেশায় ভুলায়, জানি না, কিন্তু জগৎ তার জন্য পাগল। শিব পাগল সতীর জন্য, সীতা পাগলিনী শ্রীরামের জন্য,—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাগল এবং পাগলিনী। কেন, কি জন্য, আমি তাহা বুঝিলাম না। দর্শন নাস্তিবাদ লইয়া, বিজ্ঞান অস্তি বা জড়বাদ লইয়া কতরূপে প্রতিপন্ন করিল, মনুষ্যের শরীরের অবয়ব নাই, সে মায়া, সে ছায়া, সে পরমাণু সমষ্টি—অথবা শ্মশানের ছাই। মৃত্যুর অপেক্ষা আর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কোথায় পাইবে? সে প্রত্যক্ষবাদ চক্ষের সম্মুখে ঘুরাইয়া চমক ভাঙ্গিয়া দেখাইল, বাস্তবিকই মানুষ শ্মশানের ছাই; তবুও, কি জানি কেন, তবুও মানুষের জন্য মানুষ পাগল। শ্যাম বাঁশরী আর বৃন্দাবনে নাই, কিন্তু তবুও শ্রীরাধার কুল ডুবাইল, মান ডুবাইল, জীবন ডুবাইল; হায় হায় আর রহিল কি? আমার সম্মুখে কেহ নাই, পশ্চাতে কেহ নাই—চতুর্দ্দিকে কেবল ফাঁপা নীরবতা, কেবল অনন্তপুরের অনন্ত তৃষ্ণা, আমি বিষে জর্জ্জরিত, আমার প্রাণ দিবানিশি হু হু ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। লোকে বলে "আমি মানুষের ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছি, কিন্তু কাহাকেও ভালবাসা দেই নাই—আমি সজাগ কবি, আমি মাতাইতে জানি, কিন্তু মাতি না। আমি যশের কুহকে, স্বার্থের ধাঁধায়, প্রলোভনের ছলনায় আমি ঘুরি, ফিরি, উঠি, বসি।" বাস্তবিকও আমি তাহাই। বন্ধু, আমাকে ক্ষমা করিয়া, পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাও, আর বৃথা ভালবাসার কথা বলিও না।

বাল্যকাল হইতে আমার বড় অহঙ্কার ছিল, তাই দম্ভ-সহকারে বলিতাম, "লোকের জন্য আমি পাগল হ'ব? না—তা কখনই হইবে না।" এজন্য আমি প্রেমের ঘর বাঁধি নাই—এজন্য ছেলে খেলায় ভুলি নাই। বড় হইয়াও কঠোর তপস্যায়, কর্ত্তব্যের সেবায় পিতা মাতা গুরুজনের স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহ, স্কুলের সমপাঠিগণের স্নেহ, যৌবনে বন্ধুদিগের স্নেহ, সব স্নেহ ভুলিয়াছি। মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন, পিতা নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইলেন,—আর যাঁহারা গুরুজন তাঁহারা অনেক করিলেন, অনেক সহিলেন, শেষে আর পারিলেন না, আমাকে বিদায় দিলেন। কলেজে বা স্কুলে পড়িবার সময়ে সকলে আমার বাড়ী আসিত, আমি কাহারও বাড়ী যাই নাই;—ইহাতেই সব কথা বুঝিতে পারিবে। বাল্য-সুহৃদ "কাও গো" সহোদর "র", যৌবন-সুহৃদ্ "চ, অ, পা, ও অ"—সকলে নিরাশ হইয়া অন্ধকারে কায়া ডুবাইয়া চলিয়া গেল! তাঁহারা সকলে আজ অদৃশ্য পুরে মনপ্রাণ বাঁধিয়াছেন। হায়, হায়, আমি কি পাষাণ? আমি আজও স্বপ্নে তাহাদের ছবি দেখিয়া অবাক হই, কিন্তু ধরা ছোঁয়া দেই না। হায়, আমি কি মানুষ? না আমি সত্যই পাষাণ। এতদূর পর্য্যন্তও

পাষাণ। কিন্তু অনন্তপুরের অনন্তদ্বারে তপস্যা করিয়া—"ক" হইতে "অ" সকলে মিলিয়া বিশ্বেশ্বরের যোগ ভাঙ্গিয়া মন গলাইয়া অবশেষে প্রেম-বিষ আমার প্রাণে ঢালিয়াছে। "অপরাজিতা" আমাকে কি করিয়া কোন্ তীর্থে কোন্ নৌকায় যেন উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে! সত্যই সে আসিয়াছিল—আর আজ সত্যই সে গিয়াছে? হায় হায়, আমি মানুষ হইলাম, পাখী হইলাম না কেন? আমি উড়িতে অক্ষম, সীমায় আবদ্ধ—অসীম অনন্তপুর কতদূর, কিছুই বুঝিলাম না। সে আমার প্রাণ কাঁদাইল! এতদিন পরে আমি কলঙ্ক-সাগরে ডুবিলাম। মানুষ শ্মশানের ছাই, তাত বেশ বুঝিয়াছি, কিন্তু তবুও আমি তার জন্য পাগল। বন্ধু, তুমি ঠাট্টা করিলে, মুখ বক্র করিলে, কিন্তু আমার প্রাণ ত বুঝিলে না! প্রাণ বুঝা—তোমার কাজ নয়। ঠাট্টা, তিরস্কার, যশ, নিন্দা, প্রশংসা—তোমার হাসিমাখা মুখ বা চক্ষের জল, ওসব আমার নিকট সমান। বন্ধু, বল নগরে—"ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্কসাগরে।" দেখিলাম ত আরো দেখিলাম না কেন? পাইলাম ত আরো পাইলাম না কেন? তার কথা শুনিলাম ত আরো শুনিলাম না কেন, এ সকল বুলি আমার নিকট শুনিবে না। আমার ভাষা—"কি দেখিলাম!" "কি দেখিলাম!" সে অমৃত সাগরের ঢেউ, সে সুধা-সিন্ধুর নবনী, সে চাঁদ ছাঁকিয়া অমিয়া, সে কুসুমজগতের সুষমা, অথবা সে যে কি, আমি তা জানি না। মানুষ, মানুষকে ভুলিয়া তারপর স্বপ্নে দেখে। আমি তাকে আর স্বপ্নেও দেখি না। সে প্রত্যক্ষ, চিরপ্রত্যক্ষ, চির উজ্জ্বল, চির নিকটস্থ। সে দেবীপুরের দেবী-মুর্ত্তি, মাতৃমূর্ত্তি।

ছি, ছি, ছি—মানুষীকে দেবী বলিলাম? ছি, ছি, ছি—এই বলিয়া সব বন্ধু, সব ভাই আজ দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাগলের বাণী, প্রলাপের উক্তি শুনিতে কেহ আজ কাছে নাই। স্বার্থের পর স্বার্থ, তার পর স্বার্থ—সপ্তম স্বার্থ-দেশের পর তাঁহারা বাড়ী বাঁধিয়াছেন। আমি শুনিতেছি, তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করিয়া এখন ভালই আছেন। আমি শুনিতেছি, তাঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম এখন ভালই হইতেছে। কেহ তোষামোদে, কেহ যশে, কেহ প্রশংসা স্তুতিবাদে তাঁহারা দশের মধ্যে একজন হইয়া আজকাল ভাল ভাবেই দিন কাটাইতেছেন। আর আমি? ভবপুরে ভবঘুরে—যেই একাকী, সেই একাকী—কোলে সেই মাতৃমূর্ত্তি! নিমতলার ঘাটে মায়ের রূপ ভাসাইয়াছি—আমার মা এখন নিরাকারা—চিন্ময়ীমূর্ত্তি। তিনি রূপের অতীত—অরূপা, অথবা রূপ জমিয়া মহামায়ার মহারূপ মা আমার, আমি মায়ের, এই একটী কথায় আমার সব বেদ, বাইবেল, কোরাণ পরিসমাপ্ত। তোমার ব্রহ্মাণ্ডবেদ, রাশি রাশি পাঁজাপুথি আমার এই একটা কথায়। আমি তর্কযুক্তি জানি না, দর্শনবিজ্ঞান ধুঁইয়া যাহা পান করিতে হয়, তোমরা কর, আমি আর কিছুরই নই, কেবল মায়ের। মা আমার কথা বলেন না, হাসেন না, কিছু দেন না, এইরূপ যত যুক্তি তর্ক থাকে, আমার নিকট লইয়া আসিয়া ভুলাও, আমি অলড়, আমি দেখিয়াছি, পাইয়াছি, তাঁর কথা শুনিয়াছি, আমি কিছুতেই তোমার ঐ সকল কথায় ভুলিব না। তোমার জন্য অবিশ্বাস থাকে, ভাই তুমি তাই লইয়াই থাক; আমি তাহা চাই না। আমার যাহা, আমি তাই লইয়াই থাকিতে চাই। আমি চাই। সেই স্নেহ

বিগলিতা, পাপ-প্রলোভনের অস্পৃশ্যা, পুণ্য-সলিলা ভাগীরথিতে দেহ মন ডুবাইতে। সেই সংসারের অতীতা, অপরাজিতা মাতৃ-মূর্ত্তি লইয়া আমি পাগল হইতে চাই। আমি নিমেষ-হারা যোগী, ভাব-হারা কর্ম্মী, জ্ঞান-হারা শিশু,—আমি সব হারা হইয়া মায়ের হইতে চাই। আমি ছুটিতেছি, ফিরিতেছি, —আমি অস্থির হইয়াছি। আর আমাকে ভালবাসার কথা বলিও না, আমি তার জ্বালায় সংসারে থাকিয়াও সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী।

তোমাদের ভালবাসার মায়ায় আমাকে আর পায়ে জড়াইও না। ভাই, তুমি অনেক দিয়াছ, এখন একটু ক্ষমা কর। আমি তোমাদিগকে ধরিয়া অনন্তপুরে যাইব, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু স্বার্থের হাটে আসিয়া হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিয়াছে, এখন দূর হও। আমি আর ভালবাসিব না। ভালবাসিলে কি হয়, বুঝিয়াছি। আমি সব দিয়াছি, সত্য বলিতেছি, আমি হৃদয়ের সব ঢালিয়াছি, বৃথা শূন্যেরদিকে আর তাকাইও না। যে প্রেম-সিন্ধুতে সকলের প্রীতি, সকলের ভক্তি, বিমিশ্রিত, সেই সিন্ধুরদিকে নয়ন ফিরাও। আর বৃথা মজিও না। বৃথা হলাহল পান করিও না। অনন্তে সান্তকে ডুবাইয়া নির্লোভী, নিস্পৃহ, নিষ্কর্ম্মাযোগী হও। ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবে, অনন্তের আস্বাদন পাইবে। সান্তে,—সাকারে,—এ ভবপুরে তাহা পাইবে না। আলোকের অতীত ধামে, রূপের অতীত নামে একবার আসক্ত হও, আমি যাহা বলিতেছি, বুঝিবে। আর যশ-মান, দর্শন বিজ্ঞান চাও, সংসারের বাজারে অন্বেষণ কর। ভক্তির শ্রীঅঙ্গন সেখান হইতে অনেক দূর।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪২)

ভক্ত সমাগম।

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলে উৎকল রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র এক দিন কটক হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম গৌড় দেশ হইতে এক মহাত্মা নীলাচলে আসিয়া আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন ও আপনাকে নাকি বহুকৃপা করিয়াছেন? আমি কি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি না?" ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন, সকলই সত্য; কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জ্জন স্থানে থাকেন। রাজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রাণান্তেও রাজ সমীপে যান না। তথাচ কোন কৌশলে আপনাকে দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "জগন্নাথ দর্শন ছাড়িয়া দক্ষিণে যাইবার কারণ কি?"

সর্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, তিনি সামান্য মহাপুরুষ নহেন; সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তীর্থ সকলকে,

পবিত্র করিতেই তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন।

রাজা বলিলেন, আপনি মহা বিজ্ঞ ব্যক্তি; আপনি যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতেছেন, তখন আপনার কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, তিনি আসিলে যেন একবার তাঁহার দর্শন পাই।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন "তিনি অল্প কালেই প্রত্যাগত হইবেন, কিন্তু তাঁহার জন্য একটী বাঁসার প্রয়োজন। শ্রীমন্দিরের নিকট অথচ নির্জ্জন স্থান হইলেই ভাল হয়। আপনাকে এরূপ একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।"

রাজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার ইষ্টদেব কাশী মিশ্রের বাড়ীতে তাঁহার সুন্দর বাঁসা হইতে পারিবে। আপনি আমার নামে মিশ্র মহাশয়কে বলিয়া সেই স্থান ঠিক করিয়া রাখুন।"

ভট্টাচার্য্য রাজ সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া রাজার ইচ্ছা কাশী মিশ্রকে নিবেদন করিলে কাশী মিশ্র আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিয়া বাঁসার স্থান ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখিলেন।

প্রতাপ রুদ্র গঙ্গাবংশের শেষ রাজা; ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ছিলেন। কিন্তু পরে বৈষ্ণব হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে একবারে উৎকল হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রভাবে ইঁহার ধর্ম্মানুরাগ আরও সুদীপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য তীর্থ যাত্রা হইতে আসিয়া প্রথম রজনী সশিষ্যে সার্ব্ব ভৌমের আলয়ে যাপন করিলেন। রজনী প্রভাতে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশী মিশ্রের ভবনে লইয়া যাইয়া বলিলেন, এই বাড়ী তোমার জন্য বাঁসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। ইহা তোমার পছন্দ হয় তো?

শ্রীচৈতন্য বাসস্থান দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। বাড়ীটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি নির্জ্জন, অথচ জগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকট। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'প্রভু! এই বাঁসা অঙ্গীকার করিয়া কাশী মিশ্রের আশা পূর্ণ কর। এই সময়ে কাশী মিশ্র সগোষ্ঠিবর্গে আসিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃপা করিলেন। এবং বলিলেন, 'আমার এই দেহ তোমাদেরই, তোমরা ইহাকে যেমন করিয়া রাখিতে চাও, রাখ, আমার তাহাতে মতামত কি?'

এই সময়ে নীলাদ্রির প্রধান২ লোক শ্রীচৈতন্যের নিকট পরিচিত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে উপবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একে একে এই সকল ব্যক্তির পরিচয় দিয়া দিলেন। যথাঃ—জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, স্বুবর্ণ বেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখনাধিকারী শিখি মাহিতি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে বৈষ্ণব, জগন্নাথের মহাশোয়ার দাস নামক ব্যক্তি, শিখি মাহিতির ভ্রাতা মুরারি মাহিতি, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি নামক ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুদাস, প্রহররাজ মহাপাত্র এবং পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি। এই সকল লোক এইক্ষণ হইতে শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত হইয়া থাকিলেন। এই সময়ে রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় চারি পুত্র সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য

তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভবানন্দ প্রণাম করিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানন্দের ন্যায় রত্ন যাঁহার পুত্র, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি? তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ডু, তোমার স্ত্রী কুন্তী দেবী ও তোমার পাঁচ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব। ভবানন্দ বলিলেন, 'আমি শূদ্রাধম, তাহাতে আবার বিষয়ী, তবে যে তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে স্পর্শিলে, সে কেবল তোমার ঈশ্বর লক্ষণ। যাহা হউক, পঞ্চপুত্র সহ তোমায় আত্ম সমর্পণ করিলাম। এই বাণী নাথ তোমার সমীপেই থাকিবে, যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আপনার জন বিবেচনায় ইহাকে আদেশ করিও, সঙ্কোচ করিলে মহা দুঃখিত হইব। মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমাদের কাছে আর সঙ্কোচ কি? তোমরা তো আমার পর নও। দিন পাঁচেকের মধ্যে রামানন্দ আসিবেন, তখন আমার আনন্দ বাজার পূর্ণ হইবে।" ইহার পর ভবানন্দকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য বাণীনাথকে নিকটে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর সকল লোক বিদায় হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিকটে ডাকাইলেন এবং ভট্টমারীতে তাঁহাকে ছাড়িয়া কামিনী কাঞ্চনের লোভে যেরূপে সে পলাইয়া গিয়াছিল ও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া বলিলেন 'এখন আমি ইহাকে দেশে আনিয়া দিলাম ও বিদায় দিতেছি। উহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, আমার নিকট থাকিতে পাইবে না।' এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস কাঁদিতে লাগিল। সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন করিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দাদি কৃষ্ণদাসের ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া নিকটে রাখিলেন এবং সময়ান্তরে শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'তোমার দক্ষিণ গমন সংবাদে শচী মাতা ও অদ্বৈতাদি নবদ্বীপের ভক্ত সকল উৎকণ্ঠিত আছেন। তোমার আগমন বার্ত্তা দিতে গৌড় দেশে একজন লোক পাঠাইতে চাই; ইহাতে কি অভিপ্রায় হয়? গৌরচন্দ্র বলিলেন, 'তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর'। তখন প্রচুর মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন সংবাদ দিতে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে বঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচী মাতাকে ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে সংবাদ সহ মহা প্রসাদ দিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যকে সমাচার প্রদান করিলেন। শুভ সংবাদ পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, আচার্য্য রত্ন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্য নিধি, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, বিজয় দাস, খোলা বেচা শ্রীধর, রাঘব পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত মণ্ডলী এই আনন্দের সংবাদে আচার্য্য গৃহে উপনীত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য এতদুপলক্ষে দুই তিন দিন উৎসব করিলেন। তখন সকলে নীলাচলে যাইতে যুক্তি দৃঢ় করিয়া একত্রে নবদ্বীপে শচী মাতার ভবনে যাইয়া তাঁহার আজ্ঞা লইলেন। কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ প্রভৃতি ও শ্রীখণ্ড বাসী মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া নীলাচলে প্রভু দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাদিগের

সহিত একত্রিত হইলেন। গৌর বিরহে মৃতপ্রায় নবদ্বীপ যেন আবার নব জীবন পাইয়া উঠিল। এই সময়ে পরমানন্দপুরী দক্ষিণাপথ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শচী-গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শচীমাতা তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত সেবা করিতে ছিলেন। তিনি গৌরের নীলাচলে আগমন শুনিতে পাইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে গৌরের জনৈক ভক্ত কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া ভক্তমণ্ডলীর গমনোদ্যোগ না হইতে হইতে অগ্রসর চলিয়াগেলেন এবং অচিরে নীলা-চলে পৌঁছিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করি-লেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে পাইয়া প্রণাম করিয়া মহানন্দে বলিলেন 'আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা, এখন কৃপা-করিয়া নীলাদ্রি আশ্রয় করুন।' পুরী উত্তর, করিলেন 'বঙ্গদেশে তোমার আগমন বার্ত্তা পাইয়া শচীদেবী ও ভক্তগণ মহাসুখী হইয়াছেন। ভক্তগণ এখানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া আমি ত্বরিতে চলিয়া আসিয়াছি। তখন গৌরচন্দ্র পুরীর জন্য কাশীমিশ্রের সেই বাড়ীর মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর ও সেবার জন্য একটী কিঙ্কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

দিন দিন কাশীমিশ্রের বাড়ী জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নানা ভক্ত-গণ গৌরাঙ্গ সভায় বসিয়া নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। একদিন এমনি সময় স্বরূপ দামোদর আসিয়া গৌরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার নিবাস নবদ্বীপে, পূর্ব্বাশ্রমে নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইলে ইনিও অনুরাগে বারাণসী নগরীতে যাইয়া শিখা সূত্র ফেলাইয়া সন্ন্যাসী হইলেন, কিন্তু যোগ-পট্ট গ্রহণ করিলেন না। ইনি পরম বিরক্ত, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত এবং শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনু-রাগী। সন্ন্যাসাশ্রমে ইহার নাম স্বরূপ হইল। বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্রে ইহার ন্যায় পণ্ডিত আর দেখা যায় না। ভক্তিশাস্ত্রে, রসশাস্ত্রে ও কাব্যশাস্ত্রেও ইনি অদ্বিতীয়। ইহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, ইনি সঙ্গীতশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব সম। শ্রীগৌরের নীলাচল আগমন সংবাদ পাইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া এই সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি আজ চৈতন্যচন্দ্রের দল আলোকিত করিতে মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য পদ-তলে পতিত স্বরূপকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল উভয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে গৌর বলিলেন, 'তুমি যে আসিবে, তাহা আজ স্বপ্নে দেখি-য়াছি। ভাল হ'ল। আমি অন্ধ ছিলাম, আজ চক্ষুরত্ন লাভ করিলাম।'

স্বরূপ কাঁদিয়া বলিলেন, 'প্রভু! আমি তোমার চরণে ঘোর অপরাধী। তা নইলে তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব কেন? আমি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু তুমিতো ছাড়িলে না, তাই কৃপাপাশ গলায় জড়া-ইয়া বাঁধিয়া আনিলে। এখন আমার অপ-রাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দাও।' তখন স্বরূপ দামোদর নিত্যানন্দাদির চরণ বন্দনা করিলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ও পরমানন্দপুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। স্বরূপ যথাযোগ্য সকলের পাদ-বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য স্বরূপের জন্য কাশীমিশ্রের বাড়ীর নিভৃত স্থানে একখানি

ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া পরিচর্য্যার্থ একটী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন হইতে স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের প্রধান সভাসদ্ হইলেন। কেহ কোন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট দেখাইতে আনিলে, ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া না দিলে প্রভুর নিকটে উহা যাইতে পাইত না। স্বরূপ সর্ব্বদা নির্জ্জন সাধনে রত থাকিতেন, বড় একটা কথা কহিতেন না; কেবল নিভৃতে বসিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীত গোবিন্দের সুললিত পদ মহাপ্রভুকে শুনাইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন। অল্পদিন, মধ্যেই স্বরূপ সকল ভক্তগণের প্রিয়তম ও মহাপ্রভুর যেন দ্বিতীয় স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

আর একদিন গৌরচন্দ্র সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার নাম গোবিন্দ, আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য। সিদ্ধি প্রাপ্তকালে পুরী গোঁসাই আমাকে কৃষ্ণ চৈতন্যের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাই আপনার নিকট আসিলাম। পুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বরও তীর্থদর্শন করিয়া শীঘ্র আসিবেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'পুরীশ্বর নাকি আমাকে বড় কৃপা করেন, তাই তোমাকে পাঠাইয়াছেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'পুরী গোঁসাই মহাবিজ্ঞ হইয়া শূদ্রসেবক রাখিলেন কেন?' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ভগবৎপরায়ণ মহানুভবদিগের চরিত্র সাধারণের বোধগম্য নহে। তাঁহারা বেদধর্ম্ম হইতে প্রেমের ধর্ম্মই গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন, ও স্নেহসেবা পাইলে বেদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। এই বলিয়া তিনি গোবিন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ও সকলের সহিত যথাযোগ্য পরিচয় করিয়া দিয়া সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট্টাচার্য্য! বল দেখি এখন উপায় কি? গুরুর ভৃত্য আমার মান্য ব্যক্তি, তাঁহাকে কি প্রকারে আপন সেবায় নিযুক্ত করি; অথচ গুরুর আজ্ঞাই বা কিরূপে অবহেলা করি? ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া গুরুর আজ্ঞাই পালনীয় বলিয়া স্বীয়মত প্রকাশ করিলে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে নিজ সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। সেই হইতে গোবিন্দ গৌরের মহা প্রিয়পাত্র ও প্রধান সেবক হইয়া সকল ভক্তের সমাধান করিতে লাগিলেন। রামাই ও নন্দাই নামে আর দুই ব্যক্তি ও ছোট হরিদাস ও বড়হরিদাস দুই কীর্ত্তনীয়া তাঁহার সাহায্যার্থে নিযুক্ত হইয়া সেবার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

অপরদিনে মুকুন্দ দত্ত গৌরকে সংবাদ দিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। গৌরচন্দ্র সম্ভ্রমে বলিলেন 'কোথায়? তিনি গুরু, আমিই তাঁহার নিকট যাইব। এই বলিয়া মুকুন্দের সহিত তিনি ব্রহ্মানন্দের সমীপে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভারতীর মৃগচর্ম্ম পরিধেয় দেখিয়া গৌরচন্দ্র মনে মনে কিছু দুঃখিত হইলেন এবং দেখিয়াও যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাবে মুকুন্দকে কহিলেন 'তিনি কোথায়?' মুকুন্দ বলিলেন 'এই দেখ সম্মুখে বিদ্যমান।'

গৌর বলিলেন, 'মুকুন্দ! তোমার কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে যে একজনকে আর একব্যক্তি বলিতেছো? ভারতী গোঁসাই চর্ম্মাম্বর পরিবেন কেন? 'এই কথায় গৌরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভারতী মনে

মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, সত্যইতো আমি বড সন্ন্যাসী, এই মনে করিয়াই কি কেবল, দাম্ভিকতার জন্য চর্ম্মাম্বর পরি না।' ইহাতে ধর্ম্মপথে কিছু সাহায্য হয় না। তবে আর ইহা পরিব না। এই ভাবিয়াব্রহ্মানন্দ ভারতী তখনই মৃগচর্ম্ম ছাড়িয়া বহির্ব্বাস পরিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলে তিনি গৌরকে আলিঙ্গন দিলেন। তখন উভয়ে শিষ্টাচার আলাপ হইতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দ গৌরকে সচল ব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করিলে গৌর ও তাঁহাকে সচল ব্রহ্ম বলিলেন ইহাতে উভয়ের মধ্যে কৌতুক তর্ক বাধিলে সার্ব্বভৌম ভারতীর দিক হইয়া গৌরের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন। গৌর বলিলেন 'বিষ্ণু। বিষ্ণু। ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছে'? অতিস্তুতি সর্ব্বনাশের কারণ। সাবধান এরূপ স্তব আর করিও না। ইহার পর ব্রহ্মানন্দ সম্প্রদায় ছাড়িয়া গৌর সন্নিধানে বাস করিলেন। ভগবান আচার্য্য ও রাম ভট্টাচার্য্য নামে দুই ব্যক্তিও সর্ব্ব-কার্য্য ছাড়িয়া গৌরের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতকদিন পরে ঈশ্বর পুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বর আসিয়া উপনীত হইলেন। ইনি অতি বলবান্ ছিলেন। লগুড হস্তে লোকের ভিড ঠেলিয়া গৌরকে জগন্নাথ দর্শন করান তাঁহার সেবার কার্য্য নিরূপিত হইল।

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'যদি অভয় দাও, তাহা হইলে একটী নিবেদন করিতে চাই।' গৌর উত্তর করিলেন, 'নির্ভয়ে বল, উপযুক্ত হইলে শুনিব, নচেৎ নয়।' সার্ব্বভৌম সঙ্কিতভাবে বলিলেন 'রাজা প্রতাপ রুদ্র তোমাকে দর্শন করিতে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য কর্ণে হস্তদিয়া বলিলেন, 'বিষ্ণু! বিষ্ণু। ভট্টাচার্য্য! এরূপ অযোগ্য কথা বলিলে কেন? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী। আমার পক্ষে রাজদর্শন স্ত্রীদর্শনের ন্যায় অতীব গর্হিত। সার্ব্বভৌম বলিলেন 'কিন্তু রাজা জগন্নাথ সেবক এবং পরমভক্ত।' শ্রীচৈতন্য। তথাচ রাজা কালসর্পের ন্যায় পরিত্যাজ্য। কাষ্ঠনির্ম্মিত রমণী মূর্ত্তি দেখিলে যেমন বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তেমনি ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি দর্শনে ধনতৃষ্ণা প্রবল হইয়া প্রলোভন জন্মিতে পারে। এরূপ কথা আর যেন তোমার মুখে না আইসে। পুনরায় বলিলে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না। সার্ব্বভৌম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

কথিত আছে রাজা প্রতাপ রুদ্র শ্রীচৈতন্যের দর্শন জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি সার্ব্বভৌমকে একপত্রে লিখিলেন যে, ভট্টাচার্য্য যেন গৌরভক্তদিগকে তাঁহার নামে অনুনয় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া মহাপ্রভুর সম্মতি করান্। এই পত্রে তিনি আরও লিখিলেন যে, যদি গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দর্শন না দেন, তাহাহইলে তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। সার্ব্বভৌম ঐ পত্র নিত্যানন্দাদিকে দেখাইলে তাহারা প্রথমত এসম্বন্ধে কোন কথা গৌরকে জানাইতে সাহসী নহেন বলিলেন। পরে সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরের নিকট কেবল এইকথা মাত্র, বলিলেন কোন অনুরোধ করিবেন না বলিয়া নিত্যানন্দ অঙ্গীকার করিলেন। তদনুসারে ভক্তবৃন্দ ঐ পত্রের কথা গৌরের নিকট বলিলে তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তবে তোমাদের ইচ্ছা

যে আমি রাজসেবী হইয়া বিষয় ভোগ করি ?' নিতাই বলিলেন, 'তা নয়, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু রাজা বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা নিবারণ জন্য তোমায় একখানি বহির্ব্বাস পাঠাইতে চাই' গৌর তাহাতে সম্মত হইলে একখানি বহির্ব্বাস রাজসমীপে পাঠান হইল। রাজা নাকি মহাপ্রভুর পরিধেয় বলিয়া সখানিকে মাথায় রাখিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজা রামানন্দ রায় দ্বারা পুনরায় অনুরোধ করিলে গৌর সেবার সম্মত হইয়া রাজার পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং রাজা সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দ রায়ও আসিয়াছিলেন। রামানন্দ নীলাচলে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে গৌরসমীপে যাইয়া দণ্ডবৎ করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং সকল ভক্তের সহিত তাঁহার যথা-যোগ্য মিলন করাইয়া দিলে রামানন্দ বলিলেন, তোমার পরামর্শানুসারে বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে তোমার চরণে অবস্থিতি করিব। রাজাকে জানাইলে, রাজা তোমার নাম শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। আমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট বেতন দিবার অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণসেবা করিতে বলিয়াছেন, আর তিনি তোমার দর্শনলাভের জন্য কত মিনতি করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি ভক্ত, তোমাকে যে রাজা এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন।' ইহার পর শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, 'রায়! কমলনয়ন দেখিয়াছ তো?' রামানন্দ বলিলেন 'না'। গৌর বলিলেন, 'বড় অন্যায় করিয়াছ, আগে জগন্নাথ দেখিয়া এখানে আসা উচিত ছিল, যাও এখন দর্শন করগে।' রামানন্দ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'কি করিব, চরণ-রথ, হৃদয়-সারথি যেখানে লইয়া যায়, জীবরথী সেইখানেই যায়।' এখন হইতে রামানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে আসিয়া রাজা প্রতাপ রুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার বিষয় প্রভুকে বলিয়াছিলে কি?' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'হাঁ' কিন্তু তিনি রাজদর্শন করিবেন না। অধিকন্তু আবার যদি বলি, তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, ইহাও বলিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, জগাই মাধাই প্রভৃতি পাপীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, কেবল প্রতাপ রুদ্র ছাড়া আর সকলেই কি তাঁর দয়ার পাত্র? আচ্ছা তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমায় দর্শন দিবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহাকে না দেখিয়া ছাড়িব না। সার্ব্বভৌম রাজার অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, 'দেব! বিষাদ ছাড়ুন। অবশ্যই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আপনার গাঢ় প্রেমের নিকট অবশ্যই পরাজিত হইবেন। আজও রামানন্দ রায় আপনার জন্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে মন অনেক নরম হইয়াছে। তবে আপনি এককাজ করিবেন, রথ যাত্রার দিনে প্রভু জগন্নাথ

বল্লভ উদ্যানে যখন বিহার করিবেন, তখনই দীনভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া ভাগবত আবৃত্তি করিবেন। রাজা বলিলেন, স্নানযাত্রা কবে? ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, আর তিনদিন বাকী আছে! রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য বিদায় হইয়া আসিলেন।

স্নানযাত্রা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য কে জানে কি ভাবিয়া ভক্তমণ্ডলী ছাড়িয়া বিরহ বিহ্বলচিত্তে একাকী আলালনাথে চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম এই সংবাদ পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিয়া গৌরের ভক্তগণ আসিতেছে ইত্যাদি অনুনয় বিনয় করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া রাজসমীপে উপনীত হইয়া গৌরের প্রত্যাগমন সংবাদ রাজাকে জানাইলেন। এই সময়ে গোপীনাথ আচার্য্য রাজসভায় আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বঙ্গদেশ হইতে মহাপ্রভুর দুইশত ভক্ত বৈষ্ণব আসিয়া নগরে উপসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য বাসার স্থান ও মহাপ্রসাদ চাই। রাজা বলিলেন, 'পড়িছাকে আদেশ পাঠাইয়া দাও সে যেন সব সরবরাহ করে।' এই বলিয়া প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে কহিলেন, 'মহাপ্রভুর ভক্তদিগকে একে একে আমাকে চিনাইয়া দাও দেখি।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'তবে চলুন, প্রাসাদশিখরে আরোহণ করা যাউক, গোপীনাথ সকলকে চিনাইয়া দিবেন। আমি সকলকে চিনিনা। ভক্তদল এই পথ দিয়াই যাইবেন।'

তখন প্রতাপ রুদ্র, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ তিনজনে অট্টালিকার উপর উঠিলেন। এমন সময় বৈষ্ণবদলও নিকটস্থ হইল ও পথের অপর পার্শ্বদিয়া স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহাদিগকে আগবাড়াইয়া লইতে আসিলেন। স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের গলায় মালা দিয়া প্রণাম করিলেন ও গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিলেন। আচার্য্য গোবিন্দের দিকে তাকাইলে স্বরূপ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীবাস পণ্ডিত আদি সকলকেই মালা প্রসাদ দিয়া স্বরূপ গোসাই অগ্রসারি লইয়া চলিলেন। গোপীনাথ অট্টালিকার উপর হইতে রাজাকে একে একে সকলের পরিচয় দিয়া দিলে রাজা বলিলেন, 'এইরূপ তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণব আর কোথায়ও দেখি নাই, ইঁহাদের প্রেমচেষ্টা, নৃত্যকীর্ত্তন সকলই অদ্ভুত।

সার্ব্বভৌম উত্তর দিলেন, 'এই প্রেমিকদল ও প্রেমসংকীর্ত্তন চৈতন্যের সৃষ্টি। কলিযুগের ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রভু এবারে পাপী আর রাখিবেন না।'

রাজা। যদি চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, তবে পণ্ডিতগণ তাঁহাতে বিতৃষ্ণ কেন?

ভট্টাচার্য্য। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তো তাঁহাকে চেনা যায় না!'

রাজা। আচ্ছা এই সব বৈষ্ণব জগন্নাথ না দেখিয়া চৈতন্যের বাসারদিকে কেন চলিল?

ভট্টাচার্য্য। প্রেমের রীতিই এই। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। তাই আগে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিবেন। এইরূপ আলাপের পর রাজা অট্টালিকা হইতে নামিয়া কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে ডাকাইয়া ভক্তগণের জন্য বাসা ও মহাপ্রসাদ সরবরাহ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে ভক্তদল কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সে হরিধ্বনি, হুঙ্কার, গর্জন ও উৎসাহ দেখিলে মৃতপ্রাণেও উৎসাহ সঞ্চার হয়। গোপীনাথ ও সার্ব্বভৌম রাজসমীপ হইতে বিদায় লইয়া ভক্তদলের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য পথিমধ্যে আসিয়া ভক্তদিগকে দর্শন দিলেন। তখন একটা যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিল, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণকে এক এক প্রেমালিঙ্গন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া সুখী করিলেন।

মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্তকে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার জন্য ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত দুই পুঁথি আনিয়াছি, উহা স্বরূপের নিকটে আছে; চাহিয়া লইয়া পাঠ করিও।' সকলের সঙ্গে মিলন করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, আমার হরিদাস কোথায়? কোন ভক্ত উত্তর করিল, 'হরিদাস রাজপথে পড়িয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, আমি নীচ জাতি। মন্দিরের নিকটে আমার যাইবার অধিকার নাই; কেমন করিয়া প্রভুর দর্শন পাইব? এই সময় কাশীমিশ্র ও পড়িছা আসিয়া বলিলেন, ভক্তগণের বাসা ঠিক হইয়াছে ও মহাপ্রসাদান্ন প্রস্তুত। শ্রীচৈতন্য গোপীনাথকে বলিলেন, 'তুমি বৈষ্ণবদিগকে লইয়া বাসায় যাও ও বাণীনাথ! তুমি মহাপ্রসাদ আনাইয়া আমার বাসায় রাখ। সকলে একত্র ভোজন করিব। ভক্তদিগকে গৌর বলিলেন, 'এখন বাসায় গিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া সমুদ্র স্নানান্ত আমার এখানে ভোজন করিতে আসিবে।' এই বলিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি রাজপথে যেখানে হরিদাস পড়িয়া ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিলেন, 'ছি প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমাকে ছুঁইও না।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'তোমাকে স্পর্শ করি পবিত্র হইতে।' এই বলিয়া কাশী মিশ্রকে বলিলেন, 'আমার বাসার নিকট পুষ্পোদ্যানের মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর আছে, আমাকে সেইখানি ভিক্ষা দিতে হইবে।' কাশীমিশ্র বলিলেন, 'তোমারই সব, যা ইচ্ছা লইবে। তাহাতে আমাকে জিজ্ঞাসা কেন?' তখন শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া বাসা দিলেন ও বলিলেন, এইখানে থাকিয়া হরিনাম করিবে। গোবিন্দ তোমার জন্য প্রত্যহ এখানে প্রসাদ দিয়া যাইবে। আমাকেও এখানে রোজ দেখিতে পাইবে।' নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ প্রভৃতি হরিদাসকে পাইয়া মহা সুখী হইলেন।

এদিকে গৌরচন্দ্র সমুদ্র স্নান করিয়া বাসায় আসিয়া বৈষ্ণবদিগের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাদিও বাসা লইয়া স্নানান্তে ভোজনের জন্য গৌরের আবাসে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে যোগ্যক্রম করিয়া বসাইয়া স্বহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি না বসিলে কেহ খাইতে চাহেন না, নিত্যানন্দ, পুরী, ভারতী সকলে তোমার অপেক্ষায় হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন, তুমি ভোজনে বসো, আমি পরিবেশন করিতেছি।' শ্রীচৈতন্য তখন গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া ভোজনে বসিলে স্বরূপ, দামোদর ও জগদানন্দ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলে হরিধ্বনি দিয়া

মহানন্দে ভোজন করিয়া আচমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে মাল্য চন্দন দিয়া বিশ্রামার্থে বাসায় পাঠাইয়া আপনিও বিশ্রাম করিলেন। স্বায়াহ্নে সমস্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গ সভায় সমাগত হইলে রামানন্দ রায় উপনীত হইলেন। গৌরচন্দ্র রামানন্দের সহিত অদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় করিয়া দিলে সকলে আনন্দে হরিকথায় ও প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শ্রীচৈতন্য সর্ব্বভক্ত সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ মন্দিরে গমন পূর্ব্বক সন্ধ্যারতি অন্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আজ গৌরের উৎসাহ দেখে কে? বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে উৎকলের ভক্তগণের মিলনে যে আনন্দ তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই তরঙ্গে গৌর আজ মাতোয়ারা হইয়া উন্মাদে কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। আটখান খোল ও বত্রিস জোড়া করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনের স্বর নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। নিলাদ্রিবাসী নর নারী ধাইয়া দেখিতে আসিল, রাজা প্রতাপরুদ্র অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের সম্প্রদায় মধ্যে জগন্নাথ-মন্দির বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং অশ্রু কম্প পুলকে ভাসিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। লোক সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। নৃত্যাবসানে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের সম্প্রদায় লইয়া মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া গান করিতে আদেশ দিলেন এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও বক্রেশ্বরকে এক এক সম্প্রদায়ে নাচিতে বলিলেন। তাঁহাদের মহানৃত্যে মন্দিরের প্রাঙ্গণ যেন কম্পিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেদিনকার সংকীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া স্ব স্ব বাসায় বিশ্রামার্থে বিদায় দিলেন। বৈষ্ণবেতিহাসে এই কীর্ত্তন বেড়া-কীর্ত্তন নামে অভিহিত হইয়াছে।

নীলাদ্রির পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের হাট বসিয়া গেল। নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে অল্প সংখ্যক ভক্ত লইয়া এত দিন যে লীলা হইয়া আসিয়াছে, তাহাই এখন বৃহদাকারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে অভিনীত হইতে চলিল। চারিদিক হইতে নদীসকল প্রধাবিত হইয়া যেমন সমুদ্রে সম্মিলিত হয়, তেমনি ভারতের নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া উৎকলের জগন্নাথ ক্ষেত্রে গৌর-সাগরে মিলিতে লাগিল। বঙ্গের ভক্তগণ এখন হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া ৪।৫ মাস গৌরের সঙ্গে একত্র থাকিয়া কার্ত্তিক মাসে দেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। যাবৎ গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে ছিলেন, তাবৎ তাহাদের ইহা ব্রতের ন্যায় হইয়া গেল। ইহার পর তাঁহাদের স্ত্রী বালকগণও আসিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন গদাধর, হরিদাস, মুকুন্দ প্রভৃতি একেবারেই নিলাদ্রি আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। ইচ্ছা করে, এই লীলার হাটে মিশিয়া জনমের ন্যায় আত্ম বিক্রয় করিয়া থাকি।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পাখী কি গায়—কি চায়?

১

আসে আর যায় পাখী
কি গায় কি চায়,—
গাহিয়া চাহিয়া চলে যায়।
অস্ফুট ভাষায় কিবা
কহে দিশে দিশে,—
কহিয়া আঁধারে যায় মিশে।

২

রবির উদয়ে আর
রবির গমনে,
একই স্বরে গায় গান
আকুল নয়নে,
ছুটে যায় সুদূর গগনে।

৩

রবির সোণার ভূষা
হেরি নিতি নিতি
যেন আর জেগে ওঠে
সে দিনের স্মৃতি,—
ভেসে যেন আসে কত গীতি।

৪

যেন তার মনে হয়
কি-যেন-কি নাই,
যেন তার বোধ হয়
কি-যেন-কি চাই,—
পাইয়ে যেন বা নাহি পাই।

৫

যেন তাহা মনে হয়
এক দিন ছিল,
যেন তাহা ওই ঠাঁই
ফেলে এসেছিল;—
ফেলে দিয়ে হেথায় পশিল।

উষার তপন আর
সাঁঝের তপন
যেন তার সে দিনের
এক এক জন,—
যেন সে স্মৃতির নিকেতন।

৭

যেন সে ওখানে কোথা
কবিতার বাস,
যেন সে গাহিত গান
হোথা বারমাস—
অতীতের বিজন আবাস।

৮

যেন তাহাদের মাঝে
পরাণের আশা,
যেন তার সে দিনের
কত ভালবাসা,
কতই মদিরাময় ভাষা।

৯

যেন কত হাসি, অশ্রু,
কত সুখ দুখ,
ওইখানে হারায়েছে
যেন কার মুখ—
অভাবে আকুল যার বুক।

১০

যেন রবি প্রতিদিন
সেই ছায়া কোলে
নিতি নিতি আসে পাশে
তাই দিবে ব'লে,—
নিতি নিতি যায় পুনঃ ছ'লে।

১১

তাই পাখী প্রতিদিন
দুখ গান গায়, —
গাহিতে গাহিতে উঠে ধায়,
রবির চরণে শুধু
সে দিনটি চায়,—
চাহিতে চাহিতে ডুবে যায়,
অনন্তের আঁধার কোলেতে
কেঁদে কেঁদে আপনা লুকায়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

যেতে চাই।

"O! to make a pilgrimage
Into Apollo's snug domain
With a friendly jovial heart
Form a part in the fervent train.

সকলে চলেছে দেখে আমিও যে যেতে চাই।
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' অই পথ পানে চাহি'।
সাজিয়া সুন্দর বেশে অই সবে হেসে হেসে
ত্রিদিবের কোন দেশে চলিয়াছে গান গাহি।
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' ভরসা বেঁধেছে বুকে,
যাত্রিদের পাছু পাছু যাইবে তীর্থের দিকে,—
কিন্তু সে সামান্য প্রাণী বড়ই লাজুক মেয়ে,
চাহিতে অন্যের মুখে লাজে মুখ পড়ে ছেয়ে!
পাছে লোকে কিছু বলে ভয়ে ভয়ে সরে না পা,
—লোকে যদি রাগ করে, আঁধারে সে থাক্ চলা।
এক পা ফেলিতে গিয়ে দুই পা পিছা'য়ে আসে।
লাজে ভয়ে জড় সড় দাঁড়া'য়ে দোরের পাশে,
বাহিরে আসিতে যেন করে বুক দুরু দুরু,
একটু একটু যেন কাঁপে পদ কাঁপে উরু—
অঞ্চলে মু'খানি চাপি' চাহিয়া পথের পানে—
অই সবে চলে যায় অই পথে প্রাণ টানে!
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' যেতে চায় গান গায়ি'
পেছনে থাকিয়া দূরে আমিও যে যেতে চাই!
বাসন্তী নীলিমা মাঝে বিমল চন্দ্রমা ভাসে,
মলয়ের সনে মিশি ধরায় চন্দ্রিকা আসে,
কলিকার পাশে গিয়ে বাসতার কা'য়ে মাখি'
ঘুমন্ত কোকিল স্বরে স্বরগে তুলিছে ডাকি;—
প্রকৃতি মাধুরিময়ী; অসীম সুষমা যেন
সসীম শরীর ধরি' কবিতার বেশে শোভে!
প্রকৃতির মাধুরিতে বিভল হৃদয় গুলি
পূর্ণ প্রেম অন্বেষণে চলিছে আপনা ভুলি'।
দূরে—অই বহুদূরে কবিতা নন্দন বন
বিকচ কুসুমচয়ে আমোদিত অনুখন;
একটু সুরভি কণা এ ধরায় ছুটে আসি'
ডাকিছে সে বন পানে বিভোরি' মরত বাসী
যত তথা ধায় তারা তত মুগ্ধ, আমোদিত,
তত লুব্ধ, তৃপ্ত আশা ভীতি-ভক্তি-যুত চিত।
আমরা মরতে নব অমর নগর মাঝে,
পাইনা দেখিতে দিব্য কবিকুঞ্জবন রাজে,
অবনীতে শুধু তার মাধুরির সিত ছায়া
আবরি' মানব হৃদ' ধরিয়া প্রেমের কায়া।
হৃদি গুলি বুক বাঁধি ধাইতেছে সে নন্দনে,
কেহ পায়, কেহ ফিরে অর্দ্ধপথে ক্ষুণ্ণমনে,
বিরাম বিশ্রাম নাই—পূর্ণতার দিকে ধায়—
আপনার মাঝে তারা আপনা হারা'য়ে যায়।
স্বরগের সম্ভাষণ আমিও শুনিতে পাই,
সকলে চলেছে দেখে আমিও যে যেতে চাই!

শ্রীপ্রিয়নাথ।

আঁধারের কীট।

আঁধারের কীট! আঁধারে ডুবিয়া
কতকাল র'বি বল্।
যাবি কি আলোকে আঁধার ছাড়িয়া?
যাবি যদি আয় চল্।
আঁধারের ছায়া পড়িয়াছে মুখে,—
আঁধারে হৃদয় মাখা;
উপরে আঁধার, ভিতরে আঁধার—
আঁধারে আছিস ঢাকা।

যাবি যদি আয়, আঁধারের কীট।
ছাড়িয়া আঁধার কারা।
দেখিবি আলোক কেমন মধুর—
প্রেমের জোছনা ধারা।
দেখবি আলোকে কতই সুন্দর—
কতই মধুর ছবি।
তৃষিত নয়নে দেখিতে দেখিতে
আনন্দে বিভোর হ'বি।
শুনিবি মধুর সুস্বর লহরী—
অমিয়া মাখান গীত।
শুনিতে শুনিতে সুমধুর গান—
পুলকে পূরিবে চিত।
হ'বি আত্মহারা ভক্তের সহিত
গাহিবি তুইও গান।
বিভুগুণগানে মোহিত হইবি।
মাতিবে তোরও প্রাণ।
ঝর ঝর ঝর ঝরিবে নয়ন—
বহিবে প্রেমের ধারা।
বিভুগুণ গান করিবি কেবল।
পাগল প্রেমিক পারা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি গাবি একমনে
আনন্দে বিভুর গান।
সুখ, শান্তি হৃদে বিরাজিবে সদা
মোহিত হইবে প্রাণ।
আলোকে না গিয়া আঁধারে আছিস—
আঁধার হৃদয় ল'য়ে!
আঁধারের কীট! যাবি যদি আয়—
কি হ'বে আঁধারে বসে?
আয় আয় আয়, আঁধারের কীট।
ত্যজিয়া আঁধার কারা।
দেখিবি আলোক কেমন মধুর—
বিমল প্রেমের ধারা!!

শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন।

কপাল ভাঙ্গা।

কপাল ভেঙেছে যার সংসারে কি আছে তার?
কবন্ধের দাদা সেই মুখের করম সার।
রবি তার তরে নয় কিরণ যে অন্ধতর,
চন্দ্র তার তরে নয় জোছনাও নিরুত্তর,
তারা অন্ধকারময় প্রকৃতি নীরবতর,
সাধের সংসার খানি মরুভূমি ভয়ঙ্কর।
সুকোমল অনুভূতি হিমাদ্রি পাষাণবৎ,
সুমেরুর সামুদ্রিক নিয়ত তুষারবৎ,
পাশব শার্দ্দূল বৃত্তি সাহারার মরুপ্রায়,
রাবণের চিতাসম উল্কাগ্নুৎপাতময়,
আকাশের ধূমকেতু প্রচণ্ড অনলময়,
পণ্ডিতের গণীকৃত, কবির উচ্ছ্বাসময়,
স্বর্গের যন্ত্রণা নাশে শত পাশুপত জ্বলে,
সহস্র খাণ্ডব দাহ হৃদয়ের অন্তস্তলে।
ভয়ে ভয়ে কাঁপে মন ত্রিজগত অন্ধকার,
হাসিহীন রবহীন ত্রিজগতে হাহাকার;
দারুণ অগ্নির তাপে পুড়েছে-মুকুলকুল,
ঝরে গেছে পাতাগুলি বরিয়া পড়েছে ফুল।
সলিল শুকায়ে গেছে, চারিদিক অগ্নিময়,
আগুনের রাজ্যসৃষ্টি আগুন আকাশময়।
ছোট ছোট প্রাণীশত ছুটিয়া পড়েছে তায়,
আশার বিশাল গাথা চূর্ণ তুর্ণ রেণুময়,
আশাহীন, শান্তিহীন, আগুনের হুহুরব,
জগৎ পরাণী শত ঘনীকৃত রাশি শব।
স্থিরতর মেরুদণ্ড কাঁপিয়া উঠিছে যেন,
সুমেরু কুমেরু গত কুমেরু সুমেরু হেন।
দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা চিরতরে গেছে চলে,
প্রলয়ের মহানাদে বিশাল সমুদ্রোথলে!
সকলি প্রলয় তার, প্রলয়ে আবাস তার?
প্রলয়ের মাঝে শুধু উচ্চতর হাহাকার!!
প্রলয়ে ডুবিবে যদি তবে কোন ভয় আর?
সংসারের মহাজ্বালা বহিতে হবে না আর;

খ্যাতি, মান, গানসহ পরাণ আকাশে মিলে,
ভূতদেহ ভূতে মিলে আলোকে আঁধারে মিলে'
ভেঙেছে কপাল, তবে ভেঙেযাক্ এই কায়া ;
প্রলয় আঁধারে আত্মা হোক আঁধারের ছায়া !!

শ্রীজ্ঞি, সেন।

জীবন-গতি।

অনন্ত আকাশ তলে,
শত উর্ম্মি দলে দলে,
উঠিতেছে, পড়িতেছে, হইতেছে লয়।
এ সংসার পারাবারে,
কে তার গণনা করে,
কে ভাবে জীবনগতি চির স্থির নয়।
কোথা হ'তে এ জীবন,
অনন্তের প্রস্রবণ,
কোথা হ'তে বাহিরিল, কেমন সে ঠাঁই।
কোথা হতে আসিয়াছি,
কোথা ভেসে চলিয়াছি ;
জীবনের আদি অন্ত ভাবিয়া না পাই।
কি এক অজ্ঞাত বাস,
বিষম এ মোহ পাশ,
এ জীবন প্রহেলিকা বুঝিতে না পারি।
কি এক মায়ার ডোরে,
বাঁধা জীব চরাচরে ;
কে বুঝিবে সে অগম্য মহিমা তাঁহারি।
কে জানে কেমনে পার,
হইব এ পারাবার,
কে জানে কোথায় প্রাণ মিশাইবে শেষে !
জানি না তবুও কেন,
প্রাণপণ করি হেন,
অনন্ত সিন্ধুর পানে চলিয়াছি ভেসে।
এ মরত ভূমে আসি,
সময়ের স্রোতে ভাসি,
ছুটেছি অনন্ত পানে গতি অবিরাম।
কিন্তু কেন আসিলাম,
কেন ভেসে চলিলাম,
কোথা গিয়ে এ জীবন লভিবে বিরাম॥
জানিনা এসব কিছু
শুধু মরণের পিছু
আগ্রহে চলেছি ছুটে—অনন্ত পিয়াস।
প্রকৃতির অন্তরালে,
অনন্ত সমাধি তলে,
কি অপূর্ব্ব মহাশক্তি রয়েছে প্রকাশ' !

শ্রীশ্যামাচরণ দে।

সরস্বতী পূজা।

ভারতী আসিছে দেশে, নবীন বাসন্তি বেশে
উদ্গত নব কিশলয়,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটে ফুল, গুঞ্জরিছে অলিকুল
মৃদুমন্দ বহিছে মলয়।
কোহেলার উচ্চতান উল্লাস উন্মত্ত প্রাণ
হৃদে জাগে নব সমাচার
ভারতীর বীণা যন্ত্রে মাধুরী বিলাস তন্ত্রে
উথলিছে ভূমানন্দ, আবেশ ঝঙ্কার।
যেদিকে নয়ন যায় শৈশব সঙ্গীত প্রায়
জাগে ভূত আনন্দ কাহিনী।
নিয়তি বন্ধন টুটি প্রাণ যেতে চায় ছুটি
দেখিতে সে স্বপন রজনী।
বাতুল কল্পনা নয় সত্য সত্য সুনিশ্চয়
প্রকৃতির স্ফূরতি মাঝারে,
আদি ভূত স্মৃতি রেখা জলন্ত রয়েছে লিখা
ন'লে কেন জাগিবে অন্তরে ?
নীরব প্রকৃতি মাঝে,এখনো সে বীণা বাজে,
ভারতির স্ফূরতি নিক্বন ;
অভিব্যক্তি অনুভূতি, আনন্দ মাধুরী স্মৃতি
আদি কাব্য উচ্ছ্বাস কীর্ত্তন।

কাবন কলিকা টুটি যেদিন হৃদয় ছুটী
সমুদিত প্রথম সংসারে,
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে, আবেশে উন্মত্ত হয়ে,
আত্মহারা প্রণয় পাথারে।
সেই আত্ম বিনিময় নব প্রেম পরিচয়
প্রকৃতির আদি ভূত, সে প্রেম সঙ্গীত
প্রকৃতির আদি প্রাণে, মিশে আছে সেই তানে,
কত যুগ হয়েছে অতীত।
সৃষ্টি স্থিতি পরিলয়, প্রকৃতির অভিনয়
নিতি নব উৎসব বিলাস,
সেই অনুভূতিময় অনাদি সঙ্গীতলয়
কাল চক্রে নিয়ত বিকাশ।
প্রলয় বিরত দেহে, আজি ঐ ঐ বহে
সঞ্জীবনী মলয় পবন,
নবীন জীবন দেশে, ডাকে পিক শাখে শাখে,
উলসিত নিকুঞ্জ কানন।
কুসুমে কুসুমে হাসি, সৌরভ সৌন্দর্য্য রাশি
গুঞ্জে মত্ত মধুপ আকুল,
সপ্ত স্বরে বাঁধি লয়, বাসন্তি সঙ্গীত হয়
শুষ্ক শাখে মুঞ্জরে মুকুল।
দেবতা ত্রিদিব ছেড়ে, পঞ্চমী কৌমুদী ঘেরে
শুনিছে সে অনাদি সঙ্গীত,
প্রেমের জনম কথা, অনন্ত মাধুরী গাথা
আবেশে হৃদয় পুলকিত।
নবীন পীরিতি রাগে প্রকৃতি উঠেছে জেগে
পিক কণ্ঠে প্রেম আবাহন,
কুহু কুহু কুহু ডাকে প্রেমের প্রতিমা জাগে
প্রেমাবেশে পূর্ণিত ভুবন।
দাও আত্ম বলিদান, মিশাও পরাণে প্রাণ
বিশ্ব প্রেমে ছুটিছে জোয়ার;
জাতি ধর্ম্ম ভুলে যাই, এস সবে ভাই ভাই,
খুলে গেছে স্বর্গের দুয়ার। •
হিংসা দ্বেষ অভিমানে, ঈর্ষা বিক্ষোভিত প্রাণে,
কেন যত্নে পোষিছ নরক;
পীরিতি স্বর্গের দ্বার, সুখ-শান্তি সবাকার,
প্রেমময় বিশ্ববিনায়ক।

শ্রীরেবতীমোহন রায় মৌলিক।

শিশুর বল।

মরি কি সুন্দর শিশু। প্রফুল্ল আনন,
সরলতা পরিপূর্ণ, জুড়ায় নয়ন।
না জানি কি শক্তি আছে নিকটে উহার,
দুঃখ বিনোদন যাহে হয় সবাকার।
ক্ষুধায় কাতর হলে যবে শিশু কাঁদে,
তখনো কি বল দিয়ে মনপ্রাণ বাঁধে।
কিছুতেই ভীত নয় সদাই নির্ভয়,
জানেনা বোঝেনা কিছু সে যে অসহায়।
অস্ফুট বাক্যেতে তার শক্তি বিরাজিত,
শুনিলে কাহার প্রাণ না হয় মোহিত?
হাসি হাসি মুখখানি বড়ই নির্ম্মল,
দেখি বিমোহিত চিত্ত স্রষ্টার কৌশল।
পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি আছে প্রাণে তার,
তাহাতেই পরাজিত অখিল সংসার।

উৎকল-ভ্রমণ।

(উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চিল্‌কাহ্রদ)

পুরী হইতে কটক ৫৩, চিল্‌কাহ্রদ ২৮ এবং অর্কক্ষেত্র বা কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। পুরী হইতে কটক পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বাঁধা রাস্তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু চিল্‌কা বা কণারক যাইতে হইলে সৈকতময় সমুদ্র তীর ধরিয়া যাইতে হয়,—বাঁধা রাস্তা

নাই, কোনরূপ চটী বা আশ্রয় নাই—মধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে, কিন্তু অনেক সময় পরিষ্কার পানীয় জল পর্য্যন্ত পাওয়া দুষ্কর। আমরা চৈত্র মাসের প্রারম্ভেই চিল্‌কা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাত্রের আহারান্তে আমরা দুই বন্ধু গো যানে আরোহণ করিলাম। অল্পসময়ের মধ্যেই পুরী অতিক্রম করিলাম। বিশাল বিস্তৃত পাতাল স্পর্শী বালুরাশির ভিতর দিয়া অতি ধীরে ধীরে, শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিল। এমন ভীষণ পথ আর কখনও দেখি নাই। গাড়ীর চাকা বালিতে পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, গরু আর চলিতে চাহে না। অতি কষ্টে, গাড়োয়ানের তীব্র কষাঘাতে সমস্ত রাত্রি মৃদু মৃদু ভাবে গরু দুটী চলিল বটে কিন্তু তাহাতে অতি অল্প রাস্তা অতিক্রান্ত হইল এই পথে ভ্রমণ করিয়া পুরীজেলার কয়েকটী সুন্দর পল্লী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে, দুই ধারে সমশ্রেণীতে পরস্পর সংলগ্ন বহু মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ অপূর্ব্ব ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রতি পল্লীর শেষে হরিসঙ্কীর্ত্তনের জন্য সাধারণের ব্যয়ে নির্ম্মিত ধর্ম্ম-মন্দির—তাহার ধারেই তুলসী মণ্ডপ, এতদ্ভিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মুখেই একটী একটী তুলসী মণ্ডপ বিদ্যমান। আমরা বাঙ্গালার যত পল্লী পরিদর্শন করিয়াছি, সর্ব্বত্রই শাক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়াছি। এমন যে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, সেখানেও শাক্তধর্ম্মের প্রাধান্য বিদ্যমান। এ সকল স্থান দেখিয়া ধারণা হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালীকে আজও পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন কি, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর নর নারীদিগকে বাদ দিলে অতি অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব পরিবার দেখা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্ম, মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমমূলক ধর্ম্ম যেন জ্ঞানীর জন্য নয়—কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য? উৎকল পরিভ্রমণ করিলেও এ কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে ধর্ম্ম বাঙ্গালীকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সে ধর্ম্ম উড়িষ্যাকে অতি সুকৌশলে পরাজয় করিয়াছে। ইহাতে উড়িষ্যার শিক্ষাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উৎকলবাসী নরনারী যে বাঙ্গালী অপেক্ষা চরিত্রবান, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা সাধারণ একজন অশিক্ষিত উৎকলবাসী যে অধিক ধর্ম্মপিপাসু, সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ভাল বল, আর মন্দ বল, উড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এখনও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। আর বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণী অশিক্ষার ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়াও উচ্চশ্রেণীর অনুকরণে শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মহীনতার রাজ্যে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গলার মিথ্যা মকদ্দমার বৃদ্ধিতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র প্রহেলিকা সাধারণ নরনারীর চরিত্রকে অতি কঠিন সমস্যায় নিমগ্ন করিতেছে। একথা কলিকাতার নিম্নশ্রেণী সম্বন্ধেও খাটে। শুনিয়াছি, কলিকাতাতে যে সকল উৎকলবাসী থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি ঘৃণিত কাজে লিপ্ত। কলিকাতা-নিবাসী নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী যে কতদূর অধঃপতিত, যাঁহারা স্থির চিত্তে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর উড়েদিগকে ঘৃণা করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়েও, পাণ্ডাদিগকে বাদ দিলে, উৎকলবাসীরা অনেক বিষয়ে উন্নত। অনেক লোকের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই, অনেকের মধ্যে

বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বাঙ্গালার সমাজ সমূহ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ সমূহ যে কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, স্থির চিত্তে অনুসন্ধান করিলে গভীরদুঃখে প্রাণ সমাচ্ছন্ন হয়। ভ্রূণ-হত্যা বল, অসম বিবাহ বল, ব্যভিচার বল এ সকল কলঙ্ক বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও নীতিকে কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইয়া দিতেছে। বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তবুও অন্তঃপুর প্রথা বিদ্যমান, সুতরাং বিধবাগণ কতক সুরক্ষিতা, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কতক স্ত্রী-স্বাধীনতা বা অন্তঃপুর প্রথা হীনতা বর্ত্তমান, তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর বিধবা বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে বাল বিধবাদিগের ধর্ম্ম বা চরিত্র রক্ষার আর উপায় কোথায়? ২৪ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক নিম্নশ্রেণীর পুরুষ সাধারণতঃ বাঙ্গলার ৮।১০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করে। যৌবনের মত্ততায় নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক চরিত্রহীন। যাহারা হরিমাইতির ন্যায় নয়,তাহারা প্রায়ই গুপ্ত প্রণয়ে অন্যত্র আবদ্ধ। সহর বা উপ-সহর, হাট বা বাজার ভিন্ন বেশ্যা অতি অল্প স্থানে থাকে, সুতরাং অশিক্ষিত ধর্ম্মহীন যুবকের যৌবন-মত্ততার জন্য এদেশের হতভাগিনী বালবিধবা বিদ্যমান। যাহাদের মুখের দিকে চাহিতে এ সংসারে কেহ নাই, এমন হতভাগিনী বালবিধবা পিতৃকূলে অবহেলিতা, শশুরকুলে পরিত্যক্তা। হায়! তাহাদের আশ্রয় কোথায়? বলিতে লজ্জা হয়, তাহাদিগকে ভাল কথা শুনাইতে বা মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে এ সংসারে যৌবন মত্ত নররূপী পশু- গণ যেন কেবল বিদ্যমান।' হায়! হায়! পুরুষের অত্যাচারে যাহারা বাল বিধবা, পুরুষের প্রলোভনেই তাহারা স্বৈরিণী, কলঙ্কিনী, কুলটা। বালিকাবিবাহ পুরুষ প্রচলন করিয়াছে, সুতরাং বাল-বিধবার স্রষ্টা তাহারা। বিপত্নীক পতি দশবার বিবাহ করিবে, সমাজে নিন্দা নাই; দশবার বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিবে, সমাজে কলঙ্ক নাই—আর বাল-বিধবা—এজীবনে কেবল ব্রহ্মচর্য্য করিবে!! হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য প্রমত্ত-রিপু যুবকগণ যে দেশে অহঃরহ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছে, পরিত্যক্তা, অবহেলিতা বিধবা সে দেশে কেমনে অবিচলিত ভাবে থাকিবে? সে যখন পাপে ডুবে, তখন তাকেই বা রাখে কে? পুরুষের সাত খুন মাপ, আর রমণীর কথা, রমণীর অবস্থা কে না জানেন? মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কলিকাতার প্রায় বারো আনা বেশ্যা—বাল বিধবা। রমণী পতিতা হইলে আর সমাজে থাকিবার স্থান পায় না! এমন হৃদয়-বিদারক পক্ষপাতী ব্যবস্থা যে দেশে, সে দেশের পরিণাম কে গণনা করিতে পারে? উড়িষ্যাবাসী নরনারী অশিক্ষিত বলিয়া বাঙ্গালীর নিকট ঘৃণিত, উপেক্ষিত, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, কাজে কর্ম্মে উৎকলবাসী বাঙ্গালীর আদর্শ। একটী উদাহরণ দেখ—সম্মতির আইনের ঘোরতর আন্দোলনে, রমণী অবহেলার চূড়ান্ত নিদর্শন বাঙ্গলায় দেখিয়াছি; কিন্তু ধন্য উৎকল-ভূমি! উৎকল-ভূমি আইনের পোষকতা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উৎকল রমণীর অবনতিতে ব্যথিত। আর একটী উদাহরণ দিব। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, "কামিনীর কোল, মুখে হরিবোল" মতের জীবন্ত শিষ্য,

কিন্তু যতদূর জানিয়াছি, এমন নেড়ানেড়ীর কাণ্ড উৎকলে নাই। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে; এমন কি, বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভিক্ষুকশ্রেণী দেখা যায়; কিন্তু উৎকলের বৈষ্ণবভিক্ষুক কলিকাতায় বা বাঙ্গালার অন্য কোথাও অতি বিরল। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি, উৎকলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী এক শ্রেণীকে ভিক্ষাকেও সম্বল করিয়া জীবন কাটাইতে দেখা যায় না। উড়িষ্যার বৈষ্ণব গৃহী, সদাচারী, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান। আর বাঙ্গলার বৈষ্ণব বৈরাগী, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন। বাঙ্গলার সহিত উৎকলের তুলনা করিলে, একদিকে ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার, ধর্ম্মের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় প্রভৃতি কার্য্যে যেরূপ উৎকল দেশীয় রাজাদিগের মহত্ত্ব দেখা যায়, বাঙ্গলায় সেরূপ বিরল; অন্যদিকে ধর্ম্মকে বজায় রাখিতে, পুণ্যকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে উৎকল যেমন লালায়িত, বাঙ্গলা কদাচ সেরূপ নহে। বাঙ্গলার অনেকেই ভেকধারী, গেরুয়া বা নামাবলী পরিধায়ী কপট সন্যাসী, ধর্ম্মকে পরিচ্ছদের ন্যায় ব্যবহার করেন, আর উৎকলের অনেকেই ধর্ম্মকে জীবনগত করিয়া স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা। চৈতন্য মহাপ্রভু শেষ জীবন উৎকলে যাপন করেন, একথা সকলেই অবগত আছেন। ইহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গলার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, ধর্ম্মসুহৃদ্ নিত্যানন্দকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনের প্রতি কোনই আশা নাই। বাঙ্গালা, উৎকল, দাক্ষিণাত্য, ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি উৎকলকেই ধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কবীর, নানক, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, বোধ হয়, ইঁহারা সকলেই উৎকলের প্রতি এই কারণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অন্যের কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে না পারিলেও, মহাপ্রভু সম্বন্ধে এ কথা নিঃসংসয়ে বলিতে পারি। তিনি উৎকলের নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মের এক অপরূপ বিমল জ্যোতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা উৎকল সম্বন্ধে যে অভিমত আজ সাহস পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি, মহাপ্রভুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ দিতে বিদ্যমান। বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎকলকে পরাজিত করিয়া আজও কতক পরিমাণে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের স্বর্গীয় মধুর ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইতেছে। উৎকলের মন্দির সমূহ দেখিয়া আমরা যেরূপ মোহিত হইয়াছি, উৎকলের ধর্ম্মজীবন দেখিয়া তেমনি বিমুগ্ধ হইয়াছি। এমন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-মাতোয়ারা প্রেমিক জীব পৃথিবীতে বিরল। তবে পুরীর পাণ্ডাদের কথা স্বতন্ত্র। পুরোহিত শ্রেণী সর্ব্বত্রই কলুষিত-চরিত্র। কাশী, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, কামাখ্যা, তারকেশ্বর, সর্ব্বত্রই পাণ্ডারা দুরাচারী। উৎকলের পল্লীর দৃশ্য অতি মনোরম। বহু পল্লীতে ধর্ম্মের ছায়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে কি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা মৃত, উৎকল আজও জীবিত। ধন্য উৎকল! ধন্য পুণ্যভূমি!

চিল্কার পথের পল্লীর বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া আমরা অনেক অবান্তরিক কথার সমাবেশ করিলাম। অনেক পল্লীই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক পল্লীতে সুন্দর নারিকেল বৃক্ষ পরিশোভমান। আমাদের

আশা ছিল, সাতপাড়ার লবণ-আফিসে বেলা দুই প্রহরের সময় পৌছিতে পারিব, কিন্তু ক্রমে যখন দুই প্রহর অতীত হইল, তখন শুনিলাম, মানিকপাটনা ডাকঘর বা সাতপাড়ার লবণ-আফিস এখনও বহুদূর। দুই প্রহরের পর আমরা গ্রাম সমূহ অতিক্রম করিয়া বালুকাময় প্রান্তরে পড়িলাম। সে দুর্গম পথে জল মেলে না, আহারের দ্রব্য কদাপি পাওয়া যায়। জলাভাবে স্নান হইল না, অনেক অনুসন্ধানের পর রাস্তা হইতে বহুদূর গমন করিয়া একটু কর্দ্দমময় সামান্য জলাশয় পাওয়া যাইল। আমাদের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য ছিল, তদ্দ্বারা এবং সেই কর্দ্দমময় জল দ্বারা আমরা সেদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। উত্তপ্ত বালুরাশির ভিতর দিয়া যাইতে যে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। কিন্তু এত অসহ্য কষ্টের ভিতরেও সুখ ছিল, কেননা এরূপ বিভীষিকাময় মরুভূমি সদৃশ প্রান্তর আমরা এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। কোথাও পর্ব্বতাকার বালুকার স্তূপ, কোথাও বালুকাস্তরে বায়ু-তাড়নে তরঙ্গায়িত শোভা, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, আর ক্রমেই আমরা জনপ্রাণীহীন রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সে বিজনে পাখী উড়ে না, গাভী চরেনা, মনুষ্য কদাপি দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যই অতিক্রম করিতে হইল। সন্ধ্যার সময় জনপ্রাণী ও গ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। দূর হইতে দুই-চারিটী বৃক্ষ দেখা গেল। সে দৃশ্যও অতি সুন্দর। কিন্তু কোথায় চলিয়াছি, কোথায় সে রাত্রি কাটাইব, এই দারুণ চিন্তায় প্রাণ আকুল হইল। এদিকে গাড়োয়ান বলিল, সাতপাড়ার রাস্তা সে ভাল জানে না, মানিকপাটনার পথ জানে। আমরা সাতপাড়া যাইব। সেখানে লবণের ইন-স্পেক্টর বাবু বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বাস করেন। তাঁহার নিকট আমাদের বন্ধু বিজয় বাবু একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, কিন্তু সাতপাড়া এখনও দূর। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, অল্পে অল্পে সমুদ্রের নির্ঘোষ সে বিজনতা ভেদ করিতে লাগিল, আমরা বুঝিলাম, আমরা সাতপাড়ার নিকটে আসিয়াছি। অনেক অনুসন্ধানের পর সাতপাড়ার বেণী বাবুর আফিসের পরিচয় পাওয়া গেল। একে একে সেই বিজনস্থানে কয়েকখানি গৃহ চক্ষুগোচর হইল, সে যেন মরুভূমির ওয়েসিস, অকূলের কূল, গভীর অরণ্যের আশ্রয়। গৃহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি না থাকেন? আরো ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি স্থান না দেন। এখানে আশ্রয় না পাইলে আর কোথায় যাইব? ভাবিয়া কূল পাইলাম না। এরূপ বিজন স্থানে কেহ কখনও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া থাকেন, আমাদের প্রাণের সে সময়ের আবেগ কতক বুঝিতে পারিবেন। ভাবিতে ভাবিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, বেণী বাবু তখন নিদ্রা যাইতেছেন। মনের উদ্বেগ আরো বাড়িল। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা? কেমনে জানিব। হঠাৎ সেইস্থানে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আমাদের পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর জানিলাম, তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত একজন বন্ধু। বিধাতা এই বিজন অরণ্যে আমাদের সেবার

জন্য সেই পরিচিত বন্ধুকে রাখিয়াছেন, পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেই বন্ধুর যত্ন ও আকিঞ্চন দেখিয়া অবাক্ হইলাম। গাড়ীর দ্রব্যাদিসহ আমরা সাদরে বেণীবাবুর বাঙ্গলায় আশ্রয় পাইলাম। বাঙ্গলাটী চিল্কার উপকূলে একটী উচ্চপাহাড়ের ন্যায় স্থানে নির্ম্মিত। তাহার পূর্ব্বদক্ষিণদিকে সমুদ্র, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশেই চিলকা হ্রদ, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, স্থানটী কতদূর মনোরমা। বাঙ্গলার ঠিক দক্ষিণদিক দিয়া একটী ছোট খাল সমুদ্র ও চিল্কাকে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। চিল্কা এবং সমুদ্রের মধ্যে একখণ্ড অপ্রশস্ত বালুকাময় ভূমিখণ্ড চিল্কাকে সাগর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সেই অতুল শোভাময় স্থানে এমন আশ্রয় পাইব, জীবনে কখনও ভাবি নাই। বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পর বেণীবাবু আগবিত হইলেন। বেণী বাবু যেন সে রাজ্যের রাজা। চিল্কাতে যত লবণের কারখানা আছে, ইনি তাহার কর্ত্তা। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, অতুল যত্ন, নিরহঙ্কার মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলাম। তিনি সেখানে যেন পিতৃহীনের পিতা, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা, বন্ধুহীনের বন্ধু। পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর ন্যায় সযত্নে আমাদিগকে তিনি গ্রহণ করিলেন। আলাপে বুঝিলাম, তিনি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নহেন, অনেক শিক্ষিত চাকুরে লোকের ন্যায় তিনি পৃথিবীর সংবাদ-জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দেখিলাম, তিনি সংবাদ রাখেন না, এমন ঘটনা নাই। "প্রচার" নামক বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা এবং অন্যান্য অনেক সংবাদ পত্র তাঁহার টেবিলে দেখিলাম। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, বাঙ্গলা ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন না হইয়া একান্ত অনুরাগী। রাত্রে তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল; দেশের বর্ত্তমান হীনাবস্থা স্মরণে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। মোট কথা, তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। অতুল শোভা, অল্প জ্যোৎস্নালোকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল, বেণী বাবুর বিজ্ঞতাপূর্ণ নানা বিষয়ক আলাপনে মানসিক তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল, এবং অবশেষে সুন্দর পরিপাটী সুখাদ্য রাজভোগের দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়া মহাসুখে রাজশয্যায় শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া ভাবিলাম, বালুকাশয্যার পরিবর্ত্তে এ কি! চক্ষের জলে সুস্নাত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সেদিন নীরবে বিধাতার চরণে অঞ্জলি দিয়া শয়ন করিলাম। তার পরদিন কি হইল, বারান্তরে লিপিবদ্ধ করিব।

মেঘ-দূত।*

জনক তনয়া-স্নান-পুণ্যতীরে,
নিবিড় নমেরু-কানন মাঝে,
রামগিরি নাম ভূধর-কন্দরে
পবিত্র আশ্রম যথা বিরাজে,—

---

* মহাকবি কালিদাসের প্রসিদ্ধ খণ্ডকাব্যের বঙ্গকবিতানুবাদ।

সেইখানে কান্তাবিরহ ব্যথায়
বর্ষ ভোগাশাপে, মলিন বেশে,
যাপিতেছে যক্ষ,—কর্ত্তব্যহেলায়
বোষিত প্রভুর আদেশ বশে। ১
কতিপয় মাস বঞ্চিয়া এ মতে,—
বিরহ বেদনে শীর্ণ-কায়,
কনকবলয় প্রকোষ্ঠ হইতে
খসিয়াছে রিক্ত করিয়া তায়—
জলদ পটল শিখরি শিখরে
হেরিলা, আষাঢ় প্রথম দিনে,
গজবাজি যেন আনন্দে বিহরে
বপ্রক্রীড়া করি সানুর সনে। ২
মদন সহায় মেঘ দরশনে,
ব্যাকুল পরাণ ধানত তরে,
বিষাদে সলিল-স্তম্ভিত নয়নে
চাহিল ক্ষণেক তাহার' পরে
জলদ উদয়ে, মিলিত প্রেমিকে
উপজে হৃদয় বিকৃত ব্যথা,
দূরে থাকি, প্রিয়া ধরিবারে বুকে
কত যে লালসা, কি তার কথা। ৩
বাঁচাইতে সতী দয়িতা জীবন,
পাঠায়ে আপন কুশল বাণী
জলধর-যোগে, করিল মনন,
কাতর পরাণী প্রিয়ারে জানি।
পর্ব্বতমল্লিকা যতনে তুলিল,
যতনেতে অর্ঘ্য রচিল তায়,
পুজিয়া সবিধি মেঘে সম্ভাষিল
সাদর-সম্মানে প্রীতি কথায়। ৪
ধূমজ্যোতিঃ বায়ু সলিলে গঠন
অচেতন মেঘ সাধে কেমনে ?
বার্ত্তাবহ কার্য্য, যাহে প্রয়োজন
সক্ষম নিপুণ জীবিত জনে,—
পাশরি যুকতি হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
জলধরে যক্ষ কহিল কথা ;—

বিচ্ছেদ উন্মাদে প্রেমিক সকাশে
সজীব নির্জ্জীব বিচার কোথা ? ৫
"ভুবন বিদিত আবর্ত্তপুষ্কর
তোমার জনম কুলেতে সেই,
ইচ্ছাতনু তুমি, ইন্দ্রসহচর,
মাগিতেছি ভিক্ষা কাতরে তেঁই ;
মহতের কাছে করিয়া প্রার্থনা,
অপূর্ণ লালসা, কি লাজ তাতে,
হইলেও যেন সফল-বাসনা
নাহি যাচি কভু অধম হাতে। ৬
"তাপিতশরণ তুমি, জলধর,
সেকারণে বলি বিনয়ে বাণী,—
লও মোর বার্ত্তা প্রিয়ার গোচর
যতাও আমার হৃদয়বাণী,
কর গো গমন অলকা ভবনে
উপবনে যার হরের বাস,
ললাটশশাঙ্ক বিমল কিরণে
যাহার প্রাসাদ ধরে সুহাস। ৭
"আরোহিলে তুমি আকাশের পথে,
প্রিয় আগমন আশায় কত,
সবাগে কুন্তল নয়ন হইতে,
হেরিবে তোমায় যুবতী শত,—
তব উপচয়ে, কেনা আসি মিশে
বিরহ বিধুরা বনিতা পাশ,
ব্যতীত সেজন, দগ্ধ বিধিবশে
আমার মত যে পরের দাস ? ৮
"সমীরণ ধীরে সুস্বনে বহিবে
অনুকূল পথে তোমার সনে,
গর্ব্বিত চাতক মধুরে গাহিবে
তব বামভাগে পুলক মনে।
বলাকা-দম্পতি উল্লাসে স্মরিয়া
তব আগমনে, মিলন-সুখে,
তুষিবে তোমায় আদর করিয়া
গাঁথি শ্বেতমালা তোমার বুকে। ৯

"ভ্রাতাবধূ তব এখনো জীবিতা,
ধবে আছে প্রাণ মিলন-আশে,
গণিতেছে দিন সাধ্বী পতিব্রতা,—
গিয়ে দেখ, ভাই, কি দুঃখে ভাসে।
কুসুম-পল্লব রমণী হৃদয়
বিরহ-তাড়নে পড়িত ঝরে,
আশাবৃন্ত যদি জড়ায়ে তাহায়
না রাখিত বাঁধি যতন করে। ১০

[ক্রমশঃ]

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বাঙ্গলার পাঠশালার বালকদিগের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া অনেক চিন্তাশীল কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা এই যে, বিজ্ঞান শাস্ত্র বড় দুরূহ, বড় কঠোর, সুতরাং পাঠশালার বালকদিগের পক্ষে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কথাটা আমরা মানিনা। বরং অন্য তরপক্ষে ইহাই বুঝি যে, যদি কোন শিক্ষা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়, তবে সে বিজ্ঞান শিক্ষা। কুসংস্কার-পরিশূন্য করিয়া মানসিক বৃত্তির পরিস্ফুরণ করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, একথা একালের পণ্ডিতাগ্রণী হক্স্লে ও স্পেনসর প্রভৃতি অকাট্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে যে বিজ্ঞান বালকেরা শিক্ষা করিবে, তাহা তেমনি সরল হওয়া চাই। যদি বাঙ্গলায় বিজ্ঞানের এই সরল ব্যাখ্যার অভাব দেখিয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এই শিক্ষাদানের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া থাকেন, তবে সেটা খুব চিন্তার কথাই বটে।

এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের যে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, পণ্ডিত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের প্রাকৃত ভূগোল তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু প্রাকৃত ভূগোল সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কোন সমালোচনা হইবে না বলিয়া ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিব না। স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের পদার্থ বিদ্যা—পাঠশালার উপযোগী প্রথম বিজ্ঞান গ্রন্থ। কিন্তু ঐ গ্রন্থ খানিতে অতি অল্প পরিমাণে বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহোদয়গণ অন্য কোন পুস্তক পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সুবিধার সময় বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, এবং সেইখানি পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত হয়। সেও প্রায় ১২।১৪ বৎসরের কথা। অক্ষয় বাবুর পদার্থবিদ্যা ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ; কিন্তু গুণের হিসাবে মহেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক ভাল। মহেন্দ্রবাবুর পদার্থ বিদ্যায় নানা বিষয়ের আলোচনা থাকিলেও গ্রন্থ খানি যে বড়ই অকর্ম্মণ্য, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১২৮৭ সালে এক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ঐ গ্রন্থখানির বিদ্রূপাত্মক তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল; কিন্তু শিক্ষা

বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়েরা অন্য পুস্তকের অভাবে সেইখানিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি কালি ঐ বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে। টেক্‌ষ্টবুক কমিটিও তাহার মধ্য হইতে একখানি বিশেষরূপে চাহিয়া লইয়া পাঠ্য তালিকায় অন্যতম পাঠ্য পুস্তক স্থির করেন। এখানি বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় প্রণীত সরল পদার্থ বিজ্ঞান। বোধ হয়, যোগেশ বাবুর গ্রন্থ প্রচারের পর প্রতি দ্বন্দ্বী গ্রন্থের উৎকর্ষ দেখিয়া ১৮৮৮ সালে মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পদার্থ বিদ্যার নূতন এক সংস্করণ করিয়াছেন, তাঁহার এই পঞ্চদশ সংস্করণের গ্রন্থই যোগেশ বাবুর সরল পদার্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতিযোগী পাঠ্য পুস্তক রূপে এবৎসর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এবারে নূতন পাঠ্য পুস্তকের যে নির্দ্ধারণ তালিকা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন বিশেষ গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই। কেবল যে বিষয়গুলি পড়িতে হইবে, তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পাঠশালার কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া বালকদিগের হস্তে দিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ে প্রচারিত বিজ্ঞান গ্রন্থগুলির সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থ যে অকর্ম্মণ্য, তাহা যদিও বঙ্গদর্শনে কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তথাচ এসময়ে একবার তাহার পুনঃ সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। প্রথমতঃ বঙ্গদর্শনের অনেক দিনের পূর্ব্বের সমালোচনার কথা অনেকেই জানেন না; দ্বিতীয়তঃ মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পঞ্চদশ সংস্করণে পুস্তক খানিকে "সংশোধিত এবং সংবর্দ্ধিত" আকারে প্রচার করিয়াছেন।

প্রথমতঃ মহেন্দ্র বাবুর পদার্থ বিদ্যার ভাষার বিষয় আলোচনা করা যাউক। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তিতে পদার্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"পদার্থ শব্দে পদের অর্থ। পদের অর্থ দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই পদার্থ বলা যাইতে পারে। দ্রব্য, গুণ, কার্য্য প্রভৃতি সকলই পদের অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে, সুতরাং ইহারা সকলেই পদার্থ।" মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকের টাইটেল্ পৃষ্ঠায় টুলো রকমের পাণ্ডিত্যের অভিমান করিয়াছেন, এই উদ্ধৃত অংশটুকু তাহার অনুরূপ বটে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য লিখিয়াছেন "যাহা উপলব্ধি হয়" এটা একটু অরণ্য রকমের বাঙ্গালা বটে; আমরাও জানি "যাহার উপলব্ধি হয়" অথবা যাহা উপলব্ধ হয়। আরও আছে। বিদ্যারণ্য মহাশয়—ঐ প্রথম পৃষ্ঠাতেই চেতন অচেতন পদার্থ বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন—"একমাত্র পরমাত্মাই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ"। বিদ্যারণ্য মহাশয় যে ধর্ম্মারণ্যও বটেন, একথা জানিয়া আমরা সুখী হইতে পারি; কিন্তু তাহাতে পদার্থতত্ত্ব শিক্ষার্থ কচিছেলেদের কি? ঐ প্রথম পৃষ্ঠাতেই আবার দেখুন, "জীবগণের আত্মা চৈতন্যময় বটে। কিন্তু উহারা জড়ময় দেহধারী, সুতরাং উহারা জড়চিৎ, এই উভয় আপন্ন"। ভো! ভো! ন্যায় কচকচি ঠাকুর! আপনাদের জ্বালায় শ্রাদ্ধের বাড়ীতে লুচি হজম হয় না, আবার ছেলেদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান হজমে বাধা দেন কেন? আসল কথা এই যে, যে গ্রন্থ এই প্রকার দুর্ব্বোধ্য জটিল ভাষায় লিখিত,

তাহা কোন ক্রমে বালকদিগের হস্তে অর্পিত হইতে পারে না। মহেন্দ্র বাবুর পদার্থ-বিদ্যার যে কোন পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়ুন, দেখিবেন, হয়, তাঁহার ভাষা দুর্ব্বোধ্য ও জটিল, না হয়, অলঙ্কারের অতি সমাবেশে দুষ্ট। বিজ্ঞানের গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া একেই লোকে কত আপত্তি উপস্থিত করে, তাহার উপর যদি আবার ভাষার ছটা করিয়া বিজ্ঞান লেখা যায়, তবে আদৌ তাহা কাহারও পড়িয়া বুঝিবার সাধ্য থাকে না। আরও কথা আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি প্রকাশ করিতে হইলে অতি সাবধানে ভাষা ব্যবহার করিতে হয়; নচেৎ এককথায় আর এক অর্থ বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য কোন ইংরাজপণ্ডিত কখনও বিজ্ঞানের গ্রন্থ সরল পরিস্ফুট ভাষায় ভিন্ন লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে মহেন্দ্র বাবু তাঁহাদের দুই এক ছত্র বাঙ্গালায় লিখিতে গিয়া, ভাষা সম্বন্ধে এতটা আদিমত্ব দেখাইতে গিয়াছেন কেন, বুঝিলাম না। দৃষ্টান্তস্থলে ১১৯ পৃষ্ঠা হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 'বায়ু না থাকিলে কি উষাকালীন পরম রমণীয় শোভা, কি প্রদোষকালীন জলদপটলের নিরুপম কান্তি, কিছুই নয়ন-গোচর হইত না। বায়ু না থাকিলে কাদম্বিনীর ললাটদেশ সৌদামিনী রূপ-সিঁথিতে সমুজ্জলিত হইত না'' ইত্যাদি। আরো দেখুন; ১৫৭ পৃষ্ঠায় আছে, "কি মানব কণ্ঠ-সমুত্থিত অর্থসংযুক্ত সুস্পষ্ট বাক্য, কি পশুপক্ষী কণ্ঠ-বিনিঃসৃত অর্থবিরহিত অব্যক্ত ধ্বনি, কি জীমুতরাজি-সম্ভূত গভীর বজ্রনির্ঘোষ, কি প্রকাণ্ড মহীরুহ ভগ্নকারী বেগবান্ প্রভঞ্জনের ভীষণ নিঃস্বন, কি বায়ুক্ষুভিত মহাসমুদ্রের করালতম কল্লোল কোলাহল'' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, এখানি কি পাঠশালার বালকদিগের জন্য বিজ্ঞানের বই, না নভেল, না বক্তৃতা, না জ্যাঠামি? তাঁহার যদি মনঘটাছান্ন "বিদগ্ধজননী'' বাঙ্গালা লিখিবার ইচ্ছা ছিল, তবে বালকদিগের বই না লিখিয়া অনায়াসে একখানা "উহু, মরি" "গেলাম গেলাম'' বা "শশিবন্ত'' নামের একখানি নভেল লিখিয়া সস্তামূল্যে বটতলায় ছাপাইলেই পারিতেন। আমাদের লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়, যে বাবু সূর্য্যকুমার অধিকারী মহাশয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান; বাবু যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সরল পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাল ভাল গ্রন্থ থাকিতে এই পদার্থবিদ্যা শিক্ষাবিভাগের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। এবারকার নিয়মানুসারে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন পুস্তক ব্যবহার করিতে পারেন; সুতরাং বোধ হয় আর কেহ ইচ্ছা করিয়া এই কদর্য্য পুস্তক বালকদিগের ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

যদিও এই এক ভাষার দোষেই পুস্তকখানি অগ্রাহ্য হওয়া উচিত, তবুও আমরা পুস্তকের অন্যান্য কয়েকটী দোষেরও উল্লেখ করিব।

বিজ্ঞানের গ্রন্থে শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। যে শব্দ ঠিক যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা অন্যকোন অর্থে ব্যবহার করিতে গেলেই দোষ স্পর্শে। কিন্তু অমরকোষবিৎ বিদ্যারণ্য মহাশয় তাঁহার শব্দ জ্ঞানের প্রাচুর্য্য দেখাইবার জন্য বিজ্ঞানের সমুদয় কঠোর নিয়ম পদদলিত করিয়াছেন। চুম্বক—অয়স্কান্ত, অয়স্কর্ষক; চুম্বকের কবচ, অয়স্কান্ত সংরক্ষক; মহাকর্ষণ—সংকর্ষণ

বিপ্রকর্ষণ, বিকর্ষণ, বলযুগ্ম-বলদ্বন্দ, প্রতিফলন, প্রতিক্ষেপণ, বিক্ষেপণ, পুরুষতাড়িৎ, ধনতড়িৎ, পরতড়িৎ (Positive electricity), ইত্যাদি ইত্যাদি। বালকেরা বিজ্ঞান শিখিবে, না একটা কথার জন্য রাশি রাশি অমরকোষ মুখস্থ করিবে? যিনি ভাষা। পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য প্রয়াসী, বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। বিদ্যা দেখাইতে গিয়া, স্থানে স্থানে আবার আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটাইয়াছেন। তিনি যেরূপ হওয়া উচিত তেমনি, বায়ু এবং বাতাসে প্রভেদ করিয়াছেন, অথচ স্থানে স্থানে উভয় শব্দই একার্থে ব্যবহার করিয়া গোল পাকাইয়াছেন। যথা, সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, "সচল বায়ুকেই বাতাস (wind) বলি", কিন্তু আবার অন্যত্র ১২৮ পৃষ্ঠায় বাতাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০০ বলিয়া লিখিয়াছেন। একস্থানে, "গতির হারকে বেগ বলে", অন্যত্র "তাহার পরদ্বয় বেগপ্রাপ্ত হইয়া চালিত হয়", আবার অন্যত্র "সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগপ্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়।" একস্থানে (atom) অণু, অন্যস্থানে পরমাণু, আবার একস্থানে (molicule) পরমাণু অন্যত্র অণু। এমন একটি দুইটি শব্দ নয়, অনেক স্থলেই "গোশব্দে নানা অর্থ" ঘটাইয়াছেন। এরূপ দোষ বিজ্ঞানের গ্রন্থে সম্পূর্ণ অমার্জ্জনীয়।

এপর্য্যন্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, সেগুলি তাঁহার অন্যান্য দোষের সহিত তুলনায় যৎসামান্যই বলিতে হইবে। তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকে বিজ্ঞানশাস্ত্র তাঁহার যতটুকু জানাছিল, তাহা বালকদিগের উপযোগী হউক আর নাই হউক, লিখিতে ছাড়েন নাই। সুতরাং অনেক বিষয়ের একত্র ঘেঁসাঘেঁসিতে কোনটীই ভাল ফুটিতে পারে নাই। দৃষ্টান্তস্থলে একটির উল্লেখ করি, তিনি নিমজ্জিত ও ভাসমান দ্রব্যের সাম্যাবস্থার নিয়মটি যেরূপে লিখিয়াছেন, তাহাতে সেটি একেবারেই বুঝাইতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার পদ্ধতিটা পর্য্যন্ত দূষনীয়। সকল স্থানেই, প্রথম একটা সূত্র আওড়াইয়াছেন, তাহার পর তাহার ভাষ্য করিতে গিয়াছেন। এপদ্ধতিতে বিদ্যারণ্যের মধ্যে শেয়ালকাঁটা ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ জন্মিবার আশা করা যায় না। ইহাতে কেবল বালকদিগের মস্তিষ্ক অযথা পীড়িত হয়, এইমাত্র। বিজ্ঞানে, প্রথম দৃষ্টান্ত ও ঘটনার সমাবেশ করা চাই, তার পর সিদ্ধান্তে স্থূল কথাটি লিপিবদ্ধ করা উচিত। সহজ কথা Inductive প্রণালীই বিজ্ঞানের পক্ষে একমাত্র উপযোগী। আমরা দেখিতেছি যে, কেবলমাত্র যোগেশ বাবুর সরলপদার্থ বিজ্ঞানে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।

মহেন্দ্র বাবুর পুস্তকে আরও নানা প্রকারের ত্রুটী আছে, কিন্তু সেগুলি বলিবার আমাদের স্থানও নাই, সময়ও নাই। কেবল মাত্র তাঁহার গ্রন্থের রাশি রাশি ভুলের মধ্যে, গোটাকতক তুলিয়া দেখাইয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। মহেন্দ্রবাবুর হাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এত গুরুতর অপলাপ ঘটিয়াছে যে, একজন বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে সাহস করিয়া এত অজ্ঞতা দেখাইতে পারেন, বিশ্বাস হয় না।

তিনি লিখিয়াছেন যে, জলীয় বাষ্পের

অপ্রত্যক্ষ গূঢ় তাপের পরিমাণ প্রায় ১৮০ × ৫.৪ = ৯৭২' ফা। এখানে উষ্ণতার অংশকে তাপ পরিমাণের একক করা হইয়াছে। এটী খুব নূতন আবিষ্কার নয় কি? ১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে, "বাষ্পনিঃসরণ কালে কেবল (জলাদির) উপরিস্থ পরমাণু সকল বাষ্পাকার ধারণ করে, "জলের পরমাণু" (atom) আর সোনার পাথরের বাটি, একই কথা। বিদগ্ধজননীর সম্পাদক নিউটন উপাধি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। আবিষ্কারের উপর আর এক আবিষ্কার দেখুন, ঐ পৃষ্ঠার আর এক স্থানে আছে, "বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইথর নামক এক প্রকার অতি তরল দ্রব দ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাষণ করিলে এরূপ প্রবল বেগে বাষ্পনিঃসরণ হইতে থাকে যে, অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে"। এখানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বিশেষ গোল করিয়াছেন, দেখিতেছি। এরূপ গোলযোগ এ পুস্তকে রাশি রাশি। মহেন্দ্র বাবুর আবিষ্কারের আর গোটা কতক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই এ সমালোচনা শেষ করিতে চাই। ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্রের আবরণ পাত্র মধ্যে অতিশয় উগ্র গন্ধকদ্রাবক পূরিত কোন পাত্রের উপর একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রশস্ত মুখসম্পন্ন পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া আবরণ পাত্রের অন্তর্গত বায়ু নিষ্কাষণ করিলে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে বায়ু উঠিতে উঠিতে নিম্নস্থ দ্রাবক দ্বারা পরিশোষিত হয়, ইহাতে প্রবল বেগে বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে। জল হইতে বাষ্প না উঠিয়া যাঁহার প্রভাবে বায়ু উঠিয়া জল বায়ুতে পরিণত হয়, তিনি বায়ুগ্রস্ত বটেন।

আর প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, টোল এবং কলেজের মিশ্রণে কি এক অভূতপূর্ব্ব বালক-মস্তিষ্ক-ভক্ষণকারিণী পদার্থবিচার সৃষ্ট হইয়াছে।

ইহার পুস্তক ছাড়িয়া যোগেশ বাবুর কিম্বা সূর্য্য বাবুর পুস্তক বিচার করিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, সে গুলি কতদূর উপযোগী। সর্ব্বাংশে তুলনা করিতে গেলে বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সরল পদার্থবিজ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ত্রিধারা।—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য ১৲। একথা কেহ শুনে নাই, শুনিবার কেহ ছিলনা, তখন আকাশ ও ধরণী নীরব, বিহঙ্গ বা মানব জন্মে নাই, গাহিবে কে? তখন লতাপল্লব হয় নাই, পাষাণে সেহালা জড়ায় নাই। সেই দিন অতি প্রাচীন দিনে, স্বর্গ মর্ত্য পাতালের মধ্য ক্ষেত্রে, বিশাল ব্যাপিনী ধরণী, তারকা-খচিত নীলাম্বর, আঁধার-প্লাবিত পাতাল মধ্যক্ষেত্রে সহসা উচ্ছ্বাস উঠিল, অনন্ত বিদীর্ণ হইল, সপ্তর্ষি চমকিত হইল, বাণী-স্ফুরিতা তারকাগণ অনিমেষে চাহিয়া রহিল। অনন্ত বিদীর্ণ করিয়া এক অতুল উৎস নির্গত হইয়া শ্বেত, নীল, শ্যাম ধারায় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল

বিত্র ও প্লাবিত করিল। বেদগানে জগত শুভদিনের মঙ্গল ঘোষণা করিয়াছিল। ষেই নাম ত্রিধারা। পবিত্র নামে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ত্রিপাদে বিশ্ব পরিপূরিত, নীর আর স্থান নাই। ত্রিপথ ও ত্রিপাদে ভিন্ন কি?

আলোকে ক্ষুদ্রতার পরিচয় হয়, আঁধারে দ্রতা লুকাইয়া যায়। বহ্ম মুহূর্ত্তে গায়ত্রীর ন্ম। কুরুক্ষেত্রের সমরকোলাহলে, ধরণী-মধ্যে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে ভগবদগীতার অভ্যুদয়। নীল অনন্তে বিষাদের গোধূলী ছায়ায় ত্রিধারার উৎপত্তি। বিদ্যুৎর অশোক ছায়ায় শান্ততপোবনে বাল্মিকী শিষ্যের নকট রামায়ণ রচনা করিতেন, সুরধুনীর পবিত্র সলিলে স্নানপূত হইয়া কোষেয় পরিধান করিয়া বীণা হস্তে বাল্মিকী শুভ্র কণ শুভ্রবেশ শান্ত অশোক তলে যে দিন রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, ভারতের সে ক দিন ছিল? শোকশান্ত হৃদয়ে বিনা-দের গোধূলী ছায়ায় চন্দ্রনাথ আরম্ভ করি লেন দুইটী ধার, চক্ষু দিয়াও একটী মুখ পবিত্র করিয়া বাহির হইল। ত্রিধারার রচনা এইরূপ।

"বাছা! এখন কোথায় আছ? ঠিক জানিনা। যেখানেই থাক, আশীর্ব্বাদ করি এবার দীর্ঘ জীবী হইও"। ভৈরবরাগে গায়ত্রী আরম্ভ হইল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীসমা" কোথায় ক্রৌঞ্চ মিথুন? কোথায় প্রাণপুত্তলি? হৃদয় স্তম্ভিত হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, নয়নে ধারা বহিল, আমিও কাঁদিয়া ডাকি-লাম "বাছা! এখন কোথায় আছ, ঠিক জানিনা" সপ্তর্ষিমণ্ডলে ত্রিধারার উৎপত্তি গীত হইবে। এমন দেব মন্দিরের আবৃত আলোকে ক্ষুদ্রতা ধরিবার সামর্থ্য সমালোচকের নাই। শান্ত পবিত্র হৃদয়ে এখানে প্রবেশ করিতে হয়।

২। মানসী।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ২৲। সৌন্দর্য্য-অনুভাবকতা এবং অনুভাবনা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে কেহ কবি হইতে পারে না। এই দুটী থাকিলেই যে কবি হওয়া যায়, সে কথা বলি না। কিন্তু এ দুটী প্রধানতঃ আবশ্যক, তাহাই বলা হইল।

যেখানে আমার চক্ষে কিছুই সুন্দর দেখায় না, কবি সেখানে সৌন্দর্য্য দেখেন, এবং আমাকে দেখাইয়া দেন। ইঁহাকে সাক্ষী করিয়া মরুভূমে জল দিলে, আঁধারে আলো দেখি, দিনে জ্যোৎস্না ফুটে, বোবায় বলে। সৌন্দর্য্য অনুভাবকতা শক্তি বহু দর্শন, তীক্ষ্ণ দর্শন বা ইন্দ্রিয়-প্রখরতার ফল নহে, এ শক্তি স্বভাব-সিদ্ধ। সাধনায়ও লাভ করা যায়, কিন্তু সে শক্তি উচ্চ অঙ্গের নহে।

বর্ণনা শক্তি সাধনা সিদ্ধ। টেনিস বা ক্রিকেট খেলা যেমন অঙ্গের ক্রিয়া, মনাষ্টিক, বক্তৃতা করা তেমনি জিহ্বার ক্রিয়া, মনাষ্টিক, লিখিবার ক্ষমতা তেমনি অঙ্গুলীর ক্রিয়া, মনাষ্টিক, চেষ্টা করিলে সকলেই শিখিতে পারে। এই জন্য লিখিবার গুণে অনেক অকবি কবি নামে কিয়দ্দিনের জন্য লোকসমাজে পরি-চিত হয়। সৌন্দর্য্য-অনুভাবকতা শক্তি, অর্থাৎ কবি-কল্পনা-সত্ত্বে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অভাবে অনেকের নাম কেহ জানিতে পারে নাই। কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি একা-ধারে দুর্লভ। যাঁহার আছে, তিনিই প্রকৃত কবি।

কাব্য কেবল পদ্য বা গদ্যময় প্রবন্ধ নহে। চিত্র, বাদ্য, ভাস্করাদি কারুকার্য্য, সুললিত কাব্য। কিন্তু চিত্রকর ও ভাস্করাচার্য্যের

অপেক্ষা কবির ক্ষমতা কিছু উচ্চাঙ্গের। বর্ণ, যন্ত্র বা প্রস্তরাদি বহিঃ সাধনাও অন্যের সহায়। বায়ুময় বাক্য সহায়ে কবি জগতের রাজা। যন্ত্র বিনা গান, বর্ণ বিনা চিত্র করিবার ক্ষমতা তাঁহার। এ জন্য কবিকে দেবতা শ্রেণীতে গণ্য করা হইয়াছে।

কবির রুচি অনিন্দনীয়। নাগরিকতা তাঁহার লক্ষণ। দেহ পরিচ্ছন্ন, বেশ পরিচ্ছন্ন, ব্যবহার পরিচ্ছন্ন, ভাব পরিচ্ছন্ন, ভাষা পরিচ্ছন্ন। স্থূলতা, অসঙ্গতা, অনুপযোগিতা গ্রাম্যতার লক্ষণ। গ্রাম্যের প্রকৃতি, সংযমনশূন্য, ভাষা স্থূল, ভাব স্থূল, ব্যবহার স্থূল। পার্ব্বতীয় নদীর মত কবি কল্পনা উচ্ছ্বাসময় নহে। ধীর স্থির মন্দগতি মনমোহনশ্যামের বাঁশীর মত মিষ্ট, অনুচ্চ, অনধীর, বসন্তের বায়ু। তাই বলিয়া সে শক্তি অক্ষম নহে; ইচ্ছা করিলে জীমূত-মন্দ্র পরাজয়ে প্রবীণ, শূলাস্ত্র তীক্ষ্ণ, টঙ্কারে জগত আতঙ্কে কম্পিত করে। যাহার ক্ষমতা আছে, সে বিনীত, শূন্য কুম্ভ শব্দায়মান। এজন্য মধুরতা কবিকল্পনার স্বাভাবিক লক্ষণ। ইচ্ছা করিলে কবি হাস্যাত্মক, শোকাত্মক বা বীর্য্যাত্মক কাব্য রচনা করিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতি-বিশেষত্ব নাগরিক বা কবির লক্ষণ নহে।

অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথ সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি উচ্চাঙ্গের এবং রুচি পরিচ্ছন্ন। এখনও তিনি এমন কোন কাব্য রচনা করেন নাই, যাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার বয়স অল্প। এখন তিনি বৃন্দাবনের বনে বনে বাঁশী বাজাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার কবিতাগুলি ক্ষণকালের জন্য মনোমুগ্ধ করে, অথচ প্রকৃতির প্রতিশোধে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যে, দী[illegible] কবিতা লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার আ[illegible] নহে। একটু প্রবীণতা হইলে উচ্চ[illegible] স্থায়ী কাব্য তাঁহার নিকট আমরা আ[illegible] করি। রবিচ্ছায়া ও ভানুসিংহের পদাবলী তাঁহার গীতিকাব্য রচনা করিবার অসী[ম] ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে কবিতা গ্রন্থখা[নি] রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বালকত্বের কিছু আভাস পাও[য়া] গিয়াছিল। ফিডিয়াস যে কল্পনায় সম্পূ[র্ণ] সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সাহস করিয়াছিলেন উলঙ্গিনী রমণী বা যুবতীর স্তন চিত্র ক[রি]বার শক্তি কয় জনের আছে? চুরি ক[রি]য়া চাওয়ার মধুরতা রবীন্দ্রনাথ জানেন। অথ[চ] যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আতঙ্কে দেবদূ[ত] পক্ষপুটে চক্ষু আবরণ করেন, সাহসে রবীন্দ্রনাথ তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন দেখিয়া আমাদের মনে শক্রদমনের সিংহশিশু-দন্ত দর্শনের চেষ্টা মনে পড়িয়াছিল; বুঝিয়া ছিলাম, রবীন্দ্রনাথ শিশু হইলেও বীরশিশ[ু] বটে।

মানসীতে সেরূপ বালকত্বের অভা[ব] পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু অন্য লক্ষণে বো[ধ] হয় রবীন্দ্রনাথ এখনও পূর্ণ-প্রবীণতা লা[ভ] করিতে পারেন নাই। মানসীর অধিকাং[শ] কবিতা সরস, উজ্জ্বল, মনোহর। কিন্তু কয়েক[টি]তে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইবার সম্ভবনা নাই। এগুলি মুদ্রিত না করিলে ভাল হইত। মানসীতে কোন নূতন শক্তি প্রকাশ পায় নাই। কোন কোন কবিতায় অন্য কবির ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনায় এত মৌলিকতা আছে যে, এ রূপের

তাহার কোন আবশ্যকতা ছিল না। এবং ন কবিকে যখন তিনি অতিক্রম করিতে রেন নাই, তখন এরূপ স্থলে বিবিধ দোষ-র্ণ করিয়াছে।

এইরূপ কয়েকটা সামান্য দোষ উপেক্ষা রিলে মানসীকে মুক্তমালা বলিয়া পরিচয় তে আমাদের সঙ্কোচ হয় না। প্রণয়ের সক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আনন্দ কুর্দ্দন, বাদের ছায়া প্রতিফলিত করিতে তিনি রদর্শী, স্বভাবের শোভা তাঁহার চিত্র-লকে ঝলমল করে, ব্যঙ্গের তীব্রতায় মর্ম্ম-ভেদ হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর আদরের । মানসী যে ভাবুক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ রিবে, আমাদের সন্দেহ নাই।

স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলে রসভঙ্গ হয়। মগ্র গ্রন্থ না পড়িলে কবির বহুধা কল্পনার রিচয় পাওয়া যাইবে না। সুতরাং কোন নই উদ্ধৃত করিলাম না।

৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—বিতাবলী মূল্য ।৵৹, স্ত্রী জাতি মূল্য ৵৹, রতভিক্ষা মূল্য ৵৹, দেশানুরাগ মূল্য ।৵৹, রত-সঙ্গীত মূল্য ।৹ আনা। এ সমস্ত-লিই পুরাতন জিনিস নূতন ছাঁচে ঢালা। হেম বাবুর কবিতার নূতন করিয়া সমা-লোচনা করা বাহুল্য। সকলগুলি পুস্তকই চ্চাঙ্গের কবিত্বে পূর্ণ, তথাচ পাঠককে বিশেষ করিয়া অনুরোধ, "ভারত সঙ্গীত" এবং "স্ত্রীজাতি" বারবার পাঠ করুন। "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে" ইহার ন্যায় উদ্দীপনা ও আবেগময়ী কবিতা বঙ্গভাষায় আর একটিও নাই। লুপ্ত-গৌরব পরপদ-দলিত ভারতবাসীর দুর্ব্বল প্রাণে এই কবিতা বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত করে। নিত্য২ পাঠ করিলেও ইহার নূতনত্ব বা সরসত্ব দূর হয় না। স্ত্রীজাতি নামক পুস্তক-খানি তাঁহার উদার হৃদয়ের আবেগের ভাষার প্রতিচ্ছায়া।

৮। জাতীয় সম্মিলনী—শ্রীসানুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৬৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এখানিও ক্ষুদ্র সঙ্গীত পুস্তক। কলিকাতায় বিগত জাতীয় সমিতি অধিবেশনের বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। দেশীয়দিগের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, প্রজার প্রার্থিত বিষয় এবং পার্লিয়ামেণ্টের প্রসঙ্গ ইত্যাদি জটিল রাজনৈতিক কথা লইয়া কবিতা লেখা অতিশয় কঠিন। তাহাতে গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তিরও বিলক্ষণ অভাব আছে। এ অবস্থায় পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিলে গ্রন্থকার সম্ভবতঃ সফলকাম হইতেন।

৯। প্রবন্ধ-পাঠ।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ, প্রণীত। এই পুস্তকে নৈতিক ও ঐতি-হাসিক এবং জীবন-বৃত্ত বিষয়ক ১৯টি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া 'প্রবন্ধ-পাঠ' লিখিত হইল।" আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, গ্রন্থকারের এই সাধু উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা ভাব-ময়ী ও শ্রুতিমধুর, প্রবন্ধগুলি সুরুচিসঙ্গত এবং শিক্ষাপ্রদ; এবং বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং লিপি-চাতুর্য্য পূর্ণ।

১০। দেবীপূজা।—কোঁচবিহার ইউ-নিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। এই পুস্তকে কোঁচ-বিহার রাজ্যের রাজকীয় দুর্গোৎসবের বিবরণ এবং দেবীপূজার পৌরাণিক ও

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে। আধ্যাত্মিক দুর্গামূর্ত্তি পৃথিবীর নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় সাধকের হৃদয়ে বিশ্বজননী-রূপে সম্পূজিত হইতেছে; বঙ্গদেশের মৃণ্ময়ী দেবীর রাজত্ব বিনাশ হইয়া আসিতেছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার লেখক ধর্মচিন্তা ও লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

১১। মীরাবাই।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার প্রকাশিত, বাজসাহী প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৷৵০ আনা। এখানি ঐতিহাসিক পদ্য গ্রন্থ। মীরাবাইর পবিত্র জীবন লিখিলেই যে গ্রন্থ সুখপাঠ্য ও ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা ভুল। এরূপ পুস্তক বঙ্গযন্ত্রালয় হইতে প্রসূত না হওয়াই প্রার্থনীয়।

১২। পাঠকুসুম।—শ্রীবিহারীলাল গুহ রায় প্রণীত। ৬৪ নং কলেজষ্ট্রীট, দাস গুপ্ত এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৶০ আনা। এখানি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী পুস্তক। এ পুস্তকে বালক বালিকাদিগের প্রীতিকর কয়েকখানি চিত্র এবং পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ আছে। কবিতাগুলি প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখকের প্রকৃত কবিত্ব শক্তি আছে। গদ্য প্রবন্ধগুলিও মন্দ হয় নাই।

১৩। বিষাদ-সঙ্গীত।—শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। অনুরাগের স্তর ভেদ করিয়া কবির মনশ্চক্ষু বিষাদের অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে আকাঙ্ক্ষা নাই, আশা নাই, আলোক নাই, কবি সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া নৈশ সংগীততান ধরিয়াছেন। কবির নৈপুণ্য অসাধারণ।

১৪ পরিণয় সংস্কার।—৫৫ নং কলেজষ্ট্রীটস্থ শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিবাহ সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লইয়া এ পুস্তক রচিত হয় নাই। কতকগুলি অনাবশ্যকীয় বিষয়ে গ্রন্থ পূর্ণ। সুতরাং আমরা এ প্রকার পুস্তক প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিলাম না।

১৫। গীত-পঞ্চ।—শ্রীচন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ঢাকা আরমানীটোলা শ্রীলছমন বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৶০ আনা। বাবু চন্দ্রনাথ রায় ঢাকার একজন বিখ্যাত গায়ক। সংগৃহীত [illegible] গুলিতে দেশহিতৈষণা ও [illegible] যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। [illegible] সুললিত হইয়াছে।

১৬। চিন্তানল।—[illegible] ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ২১১ নং কর্ণওয়ালিস [illegible] কে, সি, দত্ত দ্বারা প্রকাশিত, [illegible] আনা। এখানি আসামী ভাষার [illegible] কবিতা। আসামের ভাষা আমাদের [illegible] কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারিয়া [illegible] গুলি ভালই হইয়াছে। আসামী [illegible] গণের নিকট এ পুস্তক খুব আদৃত হইবে।

১৭। সতীর পতিভক্তি [illegible] সাবিত্রী চরিত।—শ্রীম[illegible] প্রণীত। ৬/১ নং পার্ব্বতীচরণ [illegible] লেন বি, বি, দে দ্বারা প্রকাশিত। [illegible] পুস্তকের ছাপা ও বাঁধান উভয়ই পরিপাটী বিষয়টীও ভাল।

১৮। অভিলাষ কুসুম।—শ্রীবিনয় চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। এখানি কবিতা পুস্তক। ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকের স্থানে২ কবিত্ব শক্তির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন।

এ বৎসরের অজ্ঞাত পুস্তক আগামী মাসে সমালোচিত হইবে। এ মাসে স্থানাভাব।